# গল্পের রাজা লম্বুদা

গৌতম রায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন, ১৩৬৯

মুদ্রক : শ্রীসন্তোষ কুমার ধর
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

# শিকারী লম্বুদা

আজ আমাদের ঘরোয়া আড্ডার একটা স্মরণীয় দিন।

এই মধুর আড্ডার পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একালের সেরা কয়েকজন গল্পবাজকে। তাঁদের সুমধুর বাক্যচ্ছটায় আজকের এই প্রীতি-সম্মেলন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয় এই খবর রটা মাত্র সারা শহর ভেঙ্গে পড়েছে এখানে। যথারীতি পুলিশ পোস্টিং হয়েছে দাঙ্গা হাঙ্গামার আশঙ্কায়।

ইতিমধ্যে যাঁরা এসে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ব্রজমোহন কারফর্মা ওরফে ব্রজদা, ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা ও অ্যান্টনি চৌধুরী ওরফে টেনিদার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই এখন খ্যাতির শীর্ষে বিরাজমান।

আশা করা যায় বাকী অতিথিরাও খুব শীগগির এসে পড়বেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে চমকপ্রদ কিছু উপহার দেবেন। শ্রোতারা তাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁদের জন্য।

এই অনুষ্ঠানের অন্যান্য প্রস্তুতিও প্রায় সম্পূর্ণ।

একমাত্র এই ঐতিহাসিক আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা, ওরফে দর্জিপাড়াখ্যাত দত্ত কুলোদ্ভূত শ্রীশ্রীলম্বমান দত্ত ওরফে আমাদের চিরপ্রিয় লম্বুদার এখনও কোনও খবর নেই। তিনি নাকি এখন ইংলন্ডে অবস্থান করছেন।

ইংলন্ডের যুবরাজ চার্লস তাঁর বিয়ের বাসরে 'রবীন ট্যাগোরের' গান গাওয়ানোর জন্য, এক বিশেষ বিমানে করে নাকি লম্বুদাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীত যে এত শ্রুতিমধুর সে-বিষয়ে সদ্যপরিণীতা চার্লস-পত্নীর সম্যক কোন ধারণাই ছিল না। তাঁর বিবাহ বাসরে লম্বুদার সুললিত কণ্ঠে এই গান শুনে তিনি এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে তাঁকে প্রায় গৃহবন্দী করে রেখেছেন। তার শত অনুরোধ সত্ত্বেও সেখান থেকে তিনি ছাড়া পাননি। চার্লস পত্নীর একান্ত বাসনা লম্বুদার কাছ থেকে তিনি কয়েকখানি জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখে নিয়ে তবেই তাঁকে মুক্তি দেবেন।

এটাই এখন বাতাসের মুখের খবর। সত্যি-মিথ্যে বলা যাচ্ছে না।

তবে এইসঙ্গে এও শোনা যাচ্ছে, লম্বুদা নাকি মিসেস চার্লসকে কথা দিয়েছেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত তাকে শেখাবেন। তবে এ-যাত্রা নয়। কারণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার সময় তিনি নাকি গীতবিতান নিয়ে যেতেই ভুলে গিয়েছেন। এই বইটা নিয়ে যাওয়ার জন্যও অন্ততঃ তাঁর একবার ভারতে ফিরে আসা প্রয়োজন এবং সম্ভবত আসছেনও।

আমরা সেই খবরের ভিত্তিতেই ধরে নিয়েছি এই অবকাশে লম্বুদা আমাদের এই অনুষ্ঠানে যেমন করে হোক পৌঁছবেনই।

শুধু তাই নয় এই খবরের ভিত্তিতেই তাঁকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ীও দাঁড় করিয়ে

রাখা হয়েছে দমদম বিমান বন্দরে। যাতে তিনি এরোপ্লেন থেকে নামা মাত্রই, তুলে নিয়ে আসা হয় সোজা এখানে। শিব বিহীন শিবপুজো সে যে কল্পনারও অতীত।

ইতিমধ্যে বাকী অতিথিরাও একে একে এসে হাজির হলেও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চোখ এখন আকাশের দিকে। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ আকাশের কোথাও ঘড়-ঘড় শব্দ হলেই সকলের দৃষ্টি ঘুরে যাচ্ছে খোলা জানালার দিকে। এবং সকলে মিলে হৈ হৈ করে উঠছে তাদের প্রত্যাশা পূরণের কামনায়।

কেউ কেউ আবার বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছে জানালার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ভুল ধরা পড়লে, হতাশ হয়েই ফিরে আসছে তারা স্ব-স্ব নির্দিষ্ট আসনে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

এইরকম একটা অস্বস্তিকর সময়ের মধ্য দিয়ে যখন ঘড়ির কাঁটা দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে, হঠাৎ ব্রজদা মুখর হলেন। তাঁর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক খেলল।

একটা ট্রিপল্ পানের খিলি মুখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তোমাদের লম্বুদা সত্যিই বিলেত গিয়েছেন তো, না—কি?

এমন একটা কঠিন এবং নীরস প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য আমরা কর্মকর্তারা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু এক্ষেত্রে নীরব থাকা সমীচীন নয় মনে হতে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনার এ প্রশ্নের অর্থটি অনুগ্রহ করে কি আমাদের বলবেন?

ব্রজদা বললেন, ভেরী সিমপ্‌ল। ইংলণ্ডের রাজপরিবারে বড় বড় অনুষ্ঠানের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, ওদের মেনিবেড়ালের বিয়েতেও আমার নিমন্ত্রণ থাকে।

অতএব বুঝতেই পারছ যুবরাজ চার্লসের বিয়েতেও যে নিমন্ত্রণ থাকবে সে-কথা প্রায় চন্দ্র-সূর্যের মতোই সন্দেহাতীত।

তাই বলছিলাম কি বিবাহ বাসরে আমিও তো উপস্থিত ছিলাম, কই শ্রীমান লম্বমানকে তো চোখে পড়ল—

কপাটের আড়ালে এতক্ষণ একজোড়া বিলেতী ডিপ ব্লু কেট্‌স্-এর আবির্ভাব কারুরই চোখে পড়ে নি। তিনি মুখ বাড়াতেই হতাশ ভক্তবৃন্দের চোখে খুশীর ঝিলিক খেলল। সদর্পে লম্বুদা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। এবং উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের মুখের ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

তাঁর চেহারায় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন দেখা না গেলেও তাঁর পোশাক-আসাক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সচরাচর তিনি এ ধরনের পোষাক পরেন না।

গায়ে লাল-কালো ডোরাকাটা গেঞ্জি মধ্যিখানে বড় বড় ইংরাজি হরফে লেখা— Love me to love you. কোমর থেকে অ্যাংলো মার্কা একটা জিনস দু পা বেয়ে নেমেছে।

জিনসটা প্রায় ঢিলে পা-জামার মতোই ঝলঝল করছে। তার পাঁশুটে বর্ণ চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই যে সেটা কোন্ শতাব্দীর। স্বল্প পরিচিত উপস্থিত জ্ঞানী ও গুণীজনের উদ্দেশ্যে প্রথম তিনি নতমস্তকে অভিবাদন জানালেন। তারপর ব্রজদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কী যেন বলছিলেন হঠাৎ কানে এল—

ব্রজদার মন্তব্যটা যে প্রবেশোদ্যত লম্বুদার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে সেবিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রইল না। অন্ততঃ তাঁর পাল্টা প্রশ্ন শুনে সেই কথাই মনে হল।

ব্রজদা দমবার পাত্র নন। পানটা গালবন্দী করে বললেন, কই হে চার্লসের বিবাহ বাসরে তোমাকে তো দেখলাম না। অথচ শুনলাম তুমি নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে রাজপ্রাসাদে ক্যানটার করে এসেছ!

প্রশ্নটা শোনামাত্রই লম্বুদার চোখ দুটো আকস্মিক চকচক করে উঠল। প্রশ্নটা মোটামুটি কতজনকে আগ্রহী করে তুলেছে দেখার জন্য একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

গেঞ্জির চেনটা টেনে খুলতে খুলতে লম্বুদা বললেন, এক্সকিউজ মি। আমাকে দেখতে পান নি তাহলে। হুঁ, পাবেনই বা কি করে? সেও তো ভাগ্যের ব্যাপার।

আপনি তো চার্লসের বিয়েতে-পাওয়া উপহার পাহারা দিচ্ছিলেন। তা ওই পর্বত প্রমাণ উপহারের আড়ালে বসে কি আশেপাশে কোথায় কে কি করছে জানা সম্ভব!

আর ওই কারণেই আপনি আমাকে চাক্ষুষ দেখতে পান নি। তবে আমার গান তো আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছিল। কী বলেন?

গলা শুনেও চিনতে পারলেন না, স্ট্রেঞ্জ, আপনি তো দেখছি পৃথিবীর নবম আশ্চর্য!

লম্বুদা কথাগুলো এক নিমেষেই উগরে দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। ব্রজদা বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, দ্যাটস রাইট।

* * *

জলযোগ দিয়েই সম্মেলন শুরু হল।

প্রস্তাবটা স্বয়ং লম্বুদার। তাঁর মতে পেটে খিদে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া জমে না। যত পেট ভরা থাকে বক্তৃতার ততো ঝাঁজ বাড়ে। তাই খাওয়াটা শেষের চেয়ে শুরুতেই সেরে নেওয়া ভালো। পরম নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

মোটামুটি একটা মেনু স্থির করাই ছিল। লম্বুদা তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খস্ খস্ করে ও. কে. লিখে দিতেই ট্রে ভর্তি চিকেন কাটলেট আর গরম কফি এসে হাজির হল টেবিলে। কাটলেটের গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। স্বেচ্ছাসেবকেরা মোটামুটি প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিল। ইশারা পাওয়ামাত্র একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না।

স্যালাড সহ গরম চিকেন কাটলেটের প্লেট ধরিয়ে দিল উপস্থিত অতিথি বৃন্দের হাতে হাতে। কাটলেট মাথাপিছু বরাদ্দ একখানা করে। তাই কারুর কিছু বলার নেই। তবু বাড়তি পড়ে থাকে কি না সকলেই নজর রাখল সেদিকে। চিকেন কাটলেট ফাউয়ের ওপর সকলেরই লোভ।

ক্রমশ গরম কাটলেটের গন্ধে ম ম করে উঠল সম্মেলনকক্ষ।

কেউ বড় কামড় বসাল। কেউ হাত দিয়ে ভেঙ্গে খেল। আবার কেউ পাখীর মতো ঠুকরে ঠুকরে খেতে লাগল।

মাথা গুণেই কাটলেট এসেছিল। তাই অঙ্কের মতোই মিলে গেল ভাগ-বাটরার ব্যাপারটা। বাড়তি কিছুই হল না।

বিশিষ্ট অতিথিরা অবশ্য সকলেই দু'খানা করে পেলেন। অর্থাৎ তাঁরা যে অসাধারণ এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হল সংখ্যার মধ্যে দিয়ে।

কাটলেটের সঙ্গে দু'টি করে মনোহরণ সন্দেশও দেওয়া হল। এটা লম্বুদাই এনেছিলেন। তবে বিলেত থেকে নয়। কারণ বাক্সের ওপর কলকাতা লেখা ছিল বড় বড় অক্ষরে।

*　　　*　　　*

লম্বুদা অবশ্য খাওয়ার ব্যাপারে চিরকালই খুব সিরিয়াস। চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে তিনি পকেট থেকে নিকেল-চটা দু'খানা ছুরি আর কাঁটা-চামচ বার করে তাঁর প্লেটে রাখলেন। মৃদু হেসে বললেন, মেড-ইন শেফিল্ড!

লম্বুদার মন্তব্য শোনামাত্র সকলের চোখ গিয়ে পড়ল ছুরি আর কাঁটাচামচের ওপর। অনেকে জায়গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল বস্তুটি দেখার জন্য।

লম্বুদা সেটা লক্ষ করেই মুচকি হাসলেন।

সে দুটো প্লেট থেকে তুলে নিয়ে সকলের সুবিধার্থে কিঞ্চিৎ উঁচুতে তুলে ধরে বললেন, চার্লসের শ্বশুরবাড়ী থেকে ফুলশয্যের তত্ত্ব পাঠিয়েছিল যুবরাজের ডিনার খাওয়ার জন্য। রাজরাজড়ার ব্যাপার, বুঝতেই পারছ এর কোয়ালিটি!

কিন্তু চার্লস আমার ব্যাগে পুরে দিয়ে বললেন, এটা বিবাহস্মৃতি, নিয়ে যান। আপনি এত কষ্ট করে এসেছেন। এটাই আমার ভাগ্য।

আমাদের একটা কিছু দেওয়াতো উচিত আপনাকে। তাই এই মধুর স্মৃতি-বিজড়িত উপহারটি তুলে দিচ্ছি আপনার হাতে।

লম্বুদা আবার হাসলেন। এবং কাঁটা-চামচ দিয়ে একটি কাটলেটের বুক বিদ্ধ করলেন। যদিও দৃষ্টি ছিল তার শ্রোতাবৃন্দের দিকে। নিকেল চটা ছুরি আর কাঁটা-চামচের ছিরি দেখে ইতিমধ্যেই একটা গুঞ্জন উঠেছিল সম্মেলনকক্ষে। লম্বুদা নীরব হতে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অতিথিবৃন্দ কাটলেট উদরস্থ করে কফিতে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান শুরু হল। সরোজকে ইশারা করা হল অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণা করার জন্য।

সরোজ এমনিই খুবই স্মার্ট। তার ওপর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করার জন্য কথাবার্তাতেও বেশ পাকা। সম্প্রতি ও আমাদের ক্লাবের অ্যাসি: সেক্রেটারী হয়েছে। তাছাড়াও ওর মিটিং পরিচালনায় একটা দক্ষতা আছে।

সরোজ গিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে সকলকে নীরব হবার আবেদন জানাল।

মোটামুটি তার অনুরোধ রক্ষা হতে, সে বলল, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও ক্লাবের ভাইবোনেরা, আমাদের সিলভার জুবিলি উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, ইতিপূর্বে কখনও কোথাও এধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে বলে অন্ততঃ আমার জানা নেই।

সাধারণতঃ এই ধরনের অনুষ্ঠানে গান-বাজনা আর বক্তৃতাই রীতিবদ্ধ থাকে। যার মধ্যে নতুন কোনও বৈচিত্র থাকে না। এইজন্য আমরা কিঞ্চিৎ নতুন প্রয়াস নিয়েছি আড্ডার এই স্মরণীয় দিনটিকে প্রাণবন্ত করতে। অর্থাৎ বাঘ শিকারের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা শোনাবেন একালের বিখ্যাত বাক্যবিশারদেরা। একত্রে এত গুণীজনের মুখ থেকে শিকার কাহিনী শোনার মুহূর্তে আশা করি আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাব আমরা। শোনা কালীন কোনওরকম হৈচৈ করবেন না। সরোজ মাইক থেকে মুখ তুলে শ্রোতাদের দিকে তাকাল। বাঘ শিকারের নামে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের মধ্যে চিত্ত চাঞ্চল্য লক্ষিত হল। কয়েকজন সভ্য আবার হাত তুলে সমর্থন জানাল সরোজের প্রস্তাবকে।

*　　　*　　　*

লম্বুদা এতক্ষণ কুড়মুড় করে মুরগীর হাড় চিবোচ্ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করে তিনি মুরগীর ঠ্যাংটা হাতে ধরেই সাধু সাধু বলে চীৎকার করে উঠলেন। লম্বুদার উদ্দেশ্য সাধিত হল। চারদিক থেকেই 'সাধুবাদ' ভেসে আসতে লাগল।

এত তাড়াতাড়ি যে প্রস্তাবটা সর্বজনীক স্বীকৃতি পাবে সরোজ ভাবতেই পারে নি। ভেবেছিল কেউ না কেউ ফুটকি কাটবেই। কিন্তু সেটা না হতে স্বভাবতঃই একটা খুশীর বন্যা বয়ে গেল সম্মেলনকক্ষে।

এবার অনুষ্ঠান-সূচীটা তুলে দেওয়া হল লম্বুদার হাতে। তিনি ইতিপূর্বে এটা দেখার অবকাশ পান নি। আর পাবেনই বা কি করে!

লম্বুদা মুখটা ছুঁচলো করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সেটার ওপর। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, যাক্ তোমরা বানান ভুল কর নি দেখে বাঁচলাম।

আমি আবার ওটা একেবারেই সহ্য করতে পারি না। সমগ্র ছাত্র জীবনে আমি

একবার মাত্র দেড়খানা বানান ভুল করেছিলাম। মনে পড়লে হাসি পায়।

অবশ্য এ গৌরবের জন্য আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রচুর।

টেনিদা মুচকি হেসে বললেন, ওই দেড়খানা ভুল কি জানতে পারি? জেনে রাখলে আর ভবিষ্যতে হবেনা এই আর কি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়। আমার যদি ভুল করার অধিকার থাকে, আপনাদের জানার অধিকারও থাকবে বৈকি। আর সেটাইতো স্বাভাবিক।

লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে তর্জনীটা ঠোঁটে স্পর্শ করলেন।

সভাকক্ষ নীরব। দেড়খানা ভুল জানার ব্যাপারটা সকলের মনেই কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সকলেরই দৃষ্টি লম্বুদার মুখের দিকে।

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ...সেকেন্ড অতিক্রান্ত লম্বুদা তখনও নীরব। তর্জনী ঠোঁট, কপাল ছেড়ে মাথা স্পর্শ করেছে।

'এ-সে-ছে' বলে হঠাৎই তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর আচমকা চীৎকার শুনে অল্পবিস্তর সকলেই চমকে উঠল। কেউ কেউ আবার সোজা হয়ে বসল।

তবে কেউই বিরক্ত হলেন না। লম্বুদা-কৃত ভুল সেতো প্রায় ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সামিল।

তিনি বললেন, আমি যখন ক্লাশ ওয়ানে পড়তাম, আমাকে একবার এক স্কুল ইনস্‌পেকটার স্কুল পরিদর্শনে এসে বেছে বেছে পঞ্চাশটা বাংলা বানান ধরেছিল। ঊনপঞ্চাশটা পেরেছিলাম। একটা পারি নি। সেটা হল দ্বীপী। অর্থাৎ যার মানে চিতাবাঘ।

আর ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেওয়ার সময়, টেস্টে বাঁশ না লিখে বাশ লেখায় আধ নম্বর কাটা যায়।

এই দেড়খানা ভুল ছাড়া আর কখনও ভুল করেছি বলে মনে পড়ে না। আর বানান ভুল করলে কি আর পরীক্ষায় গড়ে পঁচানব্বই নম্বর টানতে পারতাম। একটা মৃদু হাসির রোল উঠল সভাকক্ষে। সেই আচমকা হাসি থামিয়ে লম্বুদা আবার সরব হলেন। বললেন পাস্টইজ পাস্ট। এখন যে সব বাক্যবিশারদরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা সকলকেই তাঁদের জীবনের সেরা বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতাটি শোনাবেন আপনাদের।

প্রথমে আমি শ্রীব্রজমোহন কারফর্মামশাইকে আহ্বান জানাচ্ছি তাঁর জীবনের সেরা অভিজ্ঞতাটি বলার জন্য। আশা করি সকলেই ধৈর্য ধরে শুনবেন এবং অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালানোর ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল সভাকক্ষ।

*  *  *

বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা। মাথাজোড়া চকচকে টাক। তবে গোঁফে চুলের কোনও ঘাটতি নেই। সেটা বেশ মসৃণ এবং পুষ্টও।

টাকের পরেই চোখ যেখানে এসে আছড়ে পড়ে সেটা হল ভুঁড়ি। ভুঁড়ির ওজন ভুঁড়ি বাদে দেহের ওজনের সমান হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। পরনে ধুতি। হাতে একটা ছড়ি। আর ছড়িটা যে সখের নয়, কাজের—তার ত্রিভঙ্গমুরারি আকৃতি দেখলে বোঝা যায়।

অনেক চাপই এপর্যন্ত ছড়িকে সহ্য করতে হয়েছে।

নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল গুঞ্জন উঠল সভাকক্ষে। দু'চোখ ভরে সকলেই ব্রজবুলিখ্যাত ব্রজদাকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চায়।

তিনি অবশ্য তাঁর এই জনপ্রিয়তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বেশ নির্বিকার চিত্তেই পকেট থেকে নস্যর কৌটা বার করে চোখ কুঁচকে দু'টিপ নস্য নিলেন।

অর্ধেক নস্য নাকের গহ্বরে ঢুকে গেল। আর অর্ধেক ঝর্ ঝর্ করে জামার ওপর ঝরে পড়ল।

তিনি এক মিনিট চোখ বুজিয়ে রইলেন। এখনই বিস্ফোরণ ঘটবে।

মঞ্চে অভিনয় দেখার মতোই সকলেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হতে এবার সকলেরই অল্পবিস্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

তিনি যে কান খাড়া রেখেছিলেন, এই নির্বিকার থাকার মুহূর্তেই হঠাৎ সরব হওয়া থেকে তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

মুখটা ঈষৎ ছুঁচের মতো করে বললেন, আমার ঠাকুর্দা প্রখ্যাত শিকারী স্বর্গীয় মুকুন্দ কারফর্মা ওরফে মুকু কারফর্মার নাম আশা করি আপনাদের অজানা নয়।

ইংরেজ আমলে শিকারী বলে নাম কেনা খুব একটা সহজ কথা ছিল না। গৌরবজনক যে কোনও কাজ ইংরেজরা বরাবরই নিজেরা করার পক্ষপাতী ছিল। সেক্ষেত্রে তাদের টপকে নামী শিকারী নাম কেনা কিরূপ কঠিন আশা করি আপনারা সকলেই তা জানেন।

ব্রজদা হঠাৎ থেমে রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়লেন একবার। যথারীতি সেটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, এই সময় একদিন দুপুরে আমি গুলতিটা নিয়ে শালবনে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একটা শালগাছের মগডালে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা ঘুঘু ডেকে উঠল।

ঘুঘুর ডাকে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এই ঘুঘু পাখী শিকারের সখ আমার অনেক দিনের। কিন্তু ক্রিকেটের ওই ব্যাটে-বলে হওয়ার মতোই, ইতিপূর্বে ঘুঘু আর গুলতি

কখনও একসঙ্গে পাই নি। অর্থাৎ কিনা গুলতি থাকে তো ঘুঘু আসে না, ঘুঘু আসে তো গুলতি থাকে না।

আকস্মিক মনের সেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছা সম্পূর্ণ হবার আভাস পেতেই আমি খুশীতে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। সে চাঞ্চল্য আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলল।

এরকম সুযোগ যে ভবিষ্যতে আসতে পারে এ ছিল স্বপ্নাতীত।

কিন্তু সুযোগ চিরকালই ক্ষণস্থায়ী। সুযোগ এলে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করাই শাস্ত্রের নিয়ম।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাই শাস্ত্রবাক্যই মানলাম।

ঘুঘুর চোখে ফাঁকি দিয়ে ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলাম।

ঘুঘু সেটা টের না পেয়ে সমানেই ডেকে যেতে লাগল। আমিও তাই চাইছিলাম। ঝোপের ভেতর থেকেই তার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলতি তাক্ করলাম। এক-দুই-তি-ন!

কেল্লা ফতে। গুলতি ছুঁড়তেই ডালপালার ভেতর দিয়ে গুলি গিয়ে সোজা ঘুঘু বাবাজীর গলায় লাগল।

অর্থাৎ যেখান থেকে তার ঘু-উ-উ ঘু-উ-উ শব্দ তৈরি হচ্ছিল।

ডাক বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্ত গুনছি—

আমি সাগ্রহে তাকিয়ে আছি ওপর দিকে। ওর বডিটা তো চাই!

এডাল ওডাল ধাক্কা খেতে খেতে অবশেষে ঘুঘুটা পড়ল সরাসরি আমার হাতেই।

ঠাকুর্দা তখন কাছে দাঁড়িয়ে একটা পেয়ারা গাছের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলেন। ঘুঘুটা হঠাৎ সরাসরি আমার হাতে পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন।

কৃতিত্বটা লক্ষ্য করেই তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, যাক্ এতদিনে একটা যোগ্য উত্তরাধিকারী পেলাম। একমাত্র ঘুঘু শিকারীরাই ঘুঘু মারত পারে।

* * *

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে।

ঘুঘু দিয়ে শিকার বৌনি করে এমনই শিকারের রস পেয়ে গেলাম, বাঘ-সিংঘী তো আমার কাছে প্রায় আরশোলা টিকটিকি হয়ে দাঁড়াল।

শিকারের রেকর্ড যখন প্রায় সেঞ্চুরি ছুঁই ছুঁই তৎকালীন বড়লাটের মেজশালা বিলি মর্টন বিলেত থেকে জামাইবাবুর কাছে এল বেড়াতে। শালাবাবুর দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য একটাই। বেছে বেছে ক'টা তাগড়াই দেখে সুন্দরবনের নরখাদক রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করা। এমন তেজী বাঘ না মারতে পারলে নাকি হাতের সুখ হয় না।

ইংরেজরা শিকারীর গৌরব হাতছাড়া করতে চায়না এক্ষেত্রে কিন্তু সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিল। খাস বড়লাটের শালা বলে কথা। পান থেকে চুন খসারও উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তাহলে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! কে আর সখ করে সে দায়িত্ব নিতে চায়।

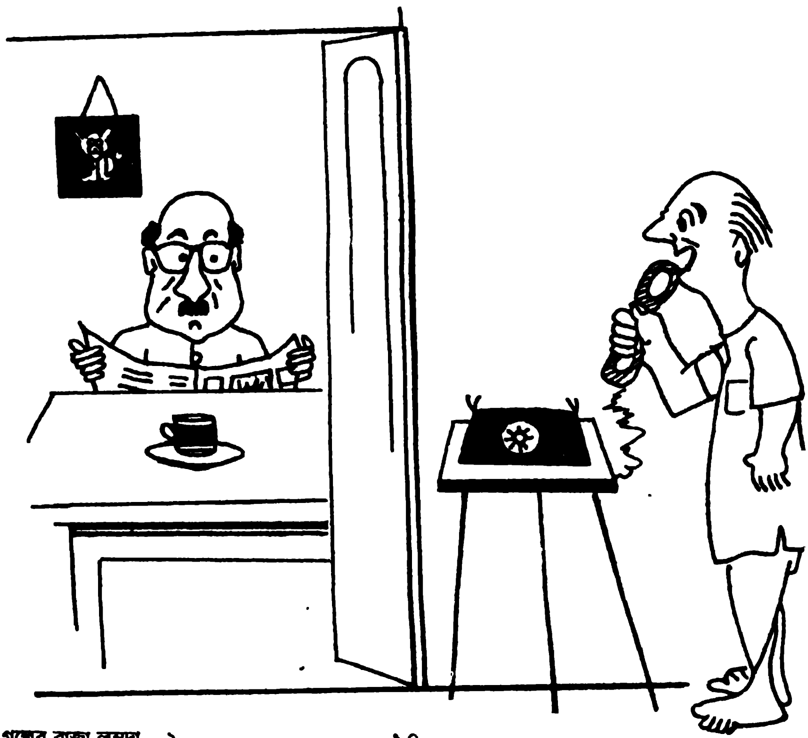
অতএব পরের কাঁধে ভর করেই যদি কার্যোদ্ধার হয়, এই আর কি!

সবে খবরের কাগজখানা খুলে চুরি-ডাকাতির খবর খুঁজছি হঠাৎ ফোনটা ক্রিং-ড়িং ক্রি-ড়িং করে বেজে উঠল। এ সময়ে সাধারণতঃ ফোন আসেনা।

চাকরটাকে বললাম, দেখতো কে আবার সাত সকালে পিড়িং পিড়িং করছে? মনে হচ্ছে কোনও জরুরী ফোন।

বাইরের কারুর ফোন ধরতে বললে, চাকরটা খুবই খুশী হয়। পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে অবাধে কথা বলার এমন সুবর্ণ সুযোগ সে আর কোথায় পাবে। আমার কাছে আসার পর থেকে সে অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছে। তাই আমার মুখ থেকে নির্দেশ খসতে না খসতেই সে হাজির হল সোজা টেলিফোন রুমে। এবং সশব্দে ফোনটা তুলে নিল।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে উঠল বাবু লাট!



এ ডাকে অন্য কেউ ঘাবড়ালেও আমি ঘাবড়াই না। বড়লাট-এর ফোন এলেই সাধারণতঃ সে আমায় এই ভাবে সম্বোধন করে। অর্থাৎ বাবু লাট সাহেবের ফোন এসেছে এটাই বলতে চায় আর কি!

টেলিফোন রুমে হাজির হয়ে, রিসিভার কানে তুললাম। হু-উ যা ভেবেছি তাই। স্বয়ং বড়লাটেরই কণ্ঠস্বর।

আমি বললাম, গুড মর্নিং স্যার, বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? সাতসকালেই যখন আমাকে স্মরণ করেছেন নিশ্চয়ই—

বড়লাট হা হা করে হেসে উঠে বললেন, জানি তুমি অনেক কিছুই করতে পার, তবে আপাততঃ একটাই কাজ করতে হবে। এবং সে কাজের জন্য আমি তোমাকে যোগ্য পুরস্কার দেব—

আমি বললাম, থাক্ থাক্, সে কথা পরে হবে। আগে বলুন, কাজটা কি? আপনার কাজ যখন প্রয়োজন হলে প্রাণের বিনিময়েও আমি করতে প্রস্তুত। আপনি তো জানেনই নতুন কি আর বলব—

তিনি আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন, নো নো স্যাকরিফাইসের প্রয়োজন নেই। আর আমিই বা তা চাইব কেন। বরং বলব লং লিভ মি: দ্যাট। যা হোক আমার শ্যালক এসেছে বিলেত থেকে সুন্দরবনের রয়েল বেংগল টাইগার শিকারের ইচ্ছা নিয়ে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি দেখেছে ও কিন্তু তেজ দেখেনি।

এই বাঘ শিকারের সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা আমি অনেক করে বুঝিয়েছি ওকে কিন্তু ও কর্ণপাত করছে না। বলছে, জামাইবাবু মরি মরব। বীরেরা এক বারই মরে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিদেনপক্ষে একটা আমার চাই-ই চাই।

এখন ওকে আমি একা শিকারে যেতে ছেড়ে দিতে পাচ্ছি না। আবার ওকে আগলে নিয়ে যাবার মতো বিশ্বাসযোগ্য লোকও হাতের কাছে পাচ্ছি না।

শেষমেস তোমার নামই মনে পড়ল তুমি যদি ওকে কোম্পানী দাও এই আর কি। ইংরিজীতে যাকে বলে 'গাইড'।

অবশ্য এজন্য তুমি মোটা পারিশ্রমিক পাবে। চেক সই করা থাকবে। তুমি যেমন খুশী টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিও।

স্বয়ং ভারতের বড়লাট বলে কথা। ক'জনের ভাগ্যে আর এমন সুযোগ আসে। পারিশ্রমিকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম!

বললাম, আপনার শ্যালক বলে কথা। না বলার প্রশ্নই ওঠে না। ধরে নিতে পারেন নাইন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্টই রাজী।

মাত্র পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট 'নো'।

বড়লাট আবার হো-হো করে হেসে বললেন, আন্ডারস্ট্যান্ড। আর বলতে হবে

না। কেউ হাঁ করলে আমি কথা বুঝতে পারি।

*    *    *    *

ইংল্যান্ডের রাজপরিবারভুক্ত বিলির হাবভাব এবং আচার-আচরণ সহজেই অনুমেয়। টকটকে ফর্সা দুধে আলতা গায়ের রঙ।

লম্বা চওড়া তাগড়াই চেহারা। প্রায় বেয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। আর ইয়া ভারী গোঁফ।

তবে সাহেবদের যে দোষ, অমন পৌরুষদীপ্ত চেহারা হলে কি হবে মাথা জুড়ে প্রকাণ্ড চকচকে টাক। যে জন্য তার বয়েস দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। চেহারা যাই হোক এদিকে টাকার কুমীর। এ পকেটে টাকা ও পকেটে টাকা।

পকেট থেকে একটা কিছু বার করতে গেলেই অমনি একরাশ টাকা মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু কুড়োয়, কিছু তাচিছল্যের সঙ্গেই ফেলে রেখে চলে যায়।

যেন হাতের ময়লা। কুড়িয়ে ফেরৎ দিলে অবশ্য থ্যাঙ্ক ইউ বলে।

হবি বলতে তার একটিই। দেশ-বিদেশের পাহাড় আর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা আর লড়াকু জীবজন্তু নাগালে পেলেই শিকার করা। তাতেই তার আনন্দ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ তার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। শেষমেস এখন এই ভারতে কৃপাদৃষ্টি পড়েছে। জামাইবাবুর দৌলতে যদি সখটা মিটিয়ে নেওয়া যায় এই আরকি।

যথারীতি লাটভবনে বিলির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন স্বয়ং বড়লাট। বললেন, বিলি মনে রেখ আজ তুমি পৃথিবীর অন্যতম সৌভাগ্যবান।

আঙুরের রসের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে গল্প করতে করতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিলির সঙ্গে আমার আলাপ জমে উঠল। কারণ সে ছিল আমার মতোই আড্ডা বাজ। আর শিকার পাগল। বিলিও যেমন শিকার করতে পেলে আর কিছু চায় না আমার অবস্থাও তথৈবচ। প্রতি সপ্তাহে একটা কিছু শিকার না করলে আমার রাতে সুনিদ্রা হয় না। তবে ও আর-এক কাঠি। শিকার না করলে নাকি ওর খিদেই পায় না।

তাইজন্য প্রতিদিনই ওর একটা না একটা কিছু শিকার করা চাইই চা-ই।

ব্রজদা মুচকি হাসতে লাগলেন।

টেনিদা খুবই আগ্রহ ভরে শুনছিলেন। ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে তাঁকে উৎসাহিত করলেন এবং সেলাই মেশিন চালানোর মত করে দু পা নাচাতে লাগলেন।

ব্রজদা সঙ্গে সঙ্গেই গলাটা ঝেড়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা পাসিং সো সিগারেটের

প্যাকেট বের করে ধূমপানে তৎপব হয়ে উঠলেন। এবং বেশ গর্বিত মুখেই প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা ফিস্‌ফিসানির ঝড বয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ব্রিটিশ আমলে পাসিং সো সিগারেটের নাম এককালে খুবই ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি হঠাৎ এটি পেলেন কোত্থেকে?

সকলেই যখন পরম কৌতূহলবশত পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করছে হঠাৎ শোভন দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ব্রজদা ছোট মুখে বড় কথা হলেও, এই পাসিং সো সিগারেট আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন তা জানতে ইচ্ছে করছে। কারণ আমরা যত দূর জানি পাসিং সো সিগারেট আর পাওয়া যায় না বাজারে আজকাল।

ব্রজদা মুখের দিকে তাকালেন বটে, কিন্তু নীরবই রইলেন। তারপর হঠাৎ 'হু হু ম্‌' বলে হাসলেন। এবং তার রেশ মুখে ছড়িয়ে রাখলেন।

ব্রজদার এই হাসি যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আমরা আবার এক ঝলক মুচকি হেসে বললেন, রাইট ইউ আর মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। এখন অনেক নতুন নতুন সিগারেট বার করেছে কোম্পানি। কিন্তু আমি যে ওই সব সিগারেট খাই না সেটা তাদের বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স ভালো করেই জানে। আর সেই কারণেই আমার জন্য কয়েক শো প্যাকেট ওরা স্পেশ্যালি তৈরি করে এরোপ্লেনে পাঠিয়ে দেয়।

ব্রজদা বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মুহুর্মুহ সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করতে লাগলেন। যদিও চোখ তুলে তিনি তাকালেন না।

সঙ্গে সঙ্গে তার এই জবাবের প্রতিক্রিয়া সংক্রামিত হলো উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে। কোনও ব্যক্তিবিশেষের জন্য কোনও সিগারেট প্রস্তুতির ঘটনা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পর থেকে কখনও ঘটেছে বলে শুনিনি। তবে যদি যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে ঘটে থাকে তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

দু'একজন কানে কানে ফিসফিস করল। কারণ মিটিং চলাকালীন কোনও মন্তব্য নিষিদ্ধ ছিল।

ব্রজদা সেটা দেখেও যেন দেখলেন না। তিনি প্যাকেট থেকে আর একটি সিগারেট বার করে, যথারীতি সেটা পকেটেই রেখে দিলেন।

পর পর পাঁচটি বোম্বাই টানে ব্রজদা সিগারেটের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন এবং সিগারেটের টুকরোটা টেবিলের তলায় ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে চেপে ধরলেন। তাঁর জুতোর তলা থেকে এক ঝলক চাপা ধোঁওয়া ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে লাগল।

অতঃপর আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ কোথায় যেন থেমেছিলাম—প্লিজ হেলপ্‌ মি। আফটার অল আমি তোমাদের থেকে সিনিয়ার তো।

বিপ্লব আমার কানের কাছে মুখটা বাড়িয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, স্রেফ ঢপ!

কোথায় থেমেছিলেন সবই মনে আছে। এই ফাঁকে গল্পের খোরাক সংগ্রহ করে নিচ্ছেন।

কানাকানি করতে দেখে ব্রজদা ভ্রূ কুঁচকে একবার আড়চোখে তাকালেন বটে, তবে বিপ্লবের মন্তব্যটা তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে কি না ঠিক বোঝা গেল না। কারণ কোনও বিশেষ অভিব্যক্তি তার মুখে ধরা পড়ছিল না।

তিনি আর বিলম্ব না করে বললেন, রাজকীয় শিকার যখন বুঝতেই পারছ। ট্রাকে করে শিকারের যা যা সাজ-সরঞ্জাম সবই হাজির হল বাড়ীতে তাতে করে সুন্দরবনে তো দূরের কথা, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে শিকার-অভিযান চালালেও কম পড়ত না। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো হেসেই অস্থির। বললাম, বিলি তুমি করছ কি। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি?

তুমি কি আমাদের এই সুন্দরবন থেকে বাঘের অস্তিত্ব একেবারে মুছে দিতে চাও?

বিলি আমার প্রশ্ন শুনে একটু অপ্রস্তুতই হল। একজন চ্যাম্পিয়ান ইংরাজ শিকারী বলে কথা। দুই গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, নেভার। ধরে নিতে পার আমি নবীশ। তাক্ করলে পুবে—যায় পশ্চিমে—। অন্ততঃ আমার রেকর্ডস বুক সেইরকমই বলে।

তবে সত্যি কথা বলতে কি জান শিকার টিকারে মনের মতো একজন সঙ্গী না পেলে শিকার করতে গিয়ে সুখ নেই। সেখানে তো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।

বললাম, বন্ধু, সে তো বুঝলাম, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারই যদি না হল শিকারে কি আনন্দ পাবে? অস্ত্রশস্ত্র, সেপাই-বরকন্দাজ নিয়ে গেলে আর তোমার কৃতিত্ব কি থাকবে। সে তো দুগ্ধপোষ্য শিশুও পারে।

সে আমার যুক্তি শুনে খুশী হয়েই বললে, অল্ রাইট। চল তাহলে আমরাই বুদ্ধি দিয়ে বাজীমাৎ করে আসি।

বিলির এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন অনুসরণকারীদের কাছে কিছুটা স্বস্তির কারণ হল। কারণ হিংস্র জীবজন্তুদের মুখোমুখি হবার দায়িত্ব সাধারণতঃ তাদের ঘাড়েই এসে পড়ে। টাকার বিনিময়ে সেই দায়িত্ব পালনে তারা বাধ্য। সে জন্য তাদের প্রাণনাশও কোন অলৌকিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়।

*  *  *

এখন আর সুন্দরবনে যাওয়ার কোনও অসুবিধাই নেই। ট্রেন, লঞ্চ, নৌকা ইত্যাদি নানারকম যানবাহনের মাধ্যমে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিব্যি সুন্দরবনের গভীরে পৌঁছানো যায়। শুধু তাই নয় দেখেশুনে ফিরেও আসে অনেকে।

কিন্তু সে সময়ে পথঘাট এত সুগম ছিল না। সাধারণ লোককে অনেক কাঠখড়

কাক, বক, কুমীর দেখেই যদি গুলী ছোঁড়, তাহলে তো একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারতে কমপক্ষে একজাহাজ গুলী লাগবে! এত গুলী একসঙ্গে পাবে কোথা। এনেছ তো মোটে দশ গণ্ডা–

আকস্মিক আমার কাছ থেকে বাধা পেয়ে বিলি বেশ একটু অখুশীই হল। যতোই হোক্ আমাদের প্রভুতো বটেই। গুলীর অভাবে বাঘ মারা যাবে না, এর চেয়ে লজ্জাকর বিষয় আর কিইবা থাকতে পারে। তবে হারবার পাত্র নয়। নিজের জিদ বজায় রাখার জন্য সে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করা মাত্রই এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল আকাশে ভয় পেয়ে।

বিলি বন্দুকটা হাতে নাচাতে নাচাতে বললে, দেখলাম বন্দুকের নলটা বুজে আছে কিনা।।

কালেভদ্রে ব্যবহার করি তো। বুজে না যাওয়াটাই অস্বাভাবিক।

যথারীতি লঞ্চ এগুচ্ছে নদীর পর নদী পার হয়ে যাচ্ছি। আমরা কেউই নামছি না। তবে বাঘের আড্ডাটা খুঁজে বার করার ধান্দাটা ঠিকই আছে মনে মনে। মাতলায় পড়ার মুহূর্তে লঞ্চ এবার অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে এগুচ্ছে। রাত্রিভোর হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই জলেই থাকতে হবে।

তারপর সকালের আলো ফুটলে হাওয়া বুঝে ডাঙ্গায় ওঠা হবে।

রাতের প্রথম প্রহরটা হৈ হল্লা আর গপ্পগুজবের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালোই কাটল। শেষ প্রহরে চোখ ঘুমে ভারী হয়ে এল। তখন আর না শুয়ে পারা যাচ্ছিল না।

বিলি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, কি করা যায় বলতো ব্রাদার? একটা স্লিপ মারব নাকি আর তো পারা যাচ্ছে না –

আমি হাসলাম। আপত্তি কি। তবে দু'জনে গলা ধরাধরি করে ঘুমানো বোধহয় ঠিক হবে না। বন বলে কথা। আমার মনে হয় পালা করে ঘুমানোই বোধহয় ভালো। এবং তাতে রিস্কও কম।

প্রথম প্রহরে ও ঘুমালো, আম জাগলাম। পরের প্রহরে আমি ঘুমালাম ও জাগল। ফলে ঘুমের আবেশ থেকে দু'জনেই মুক্ত।

কিন্তু ওর মধ্যেই বিলি একটা অঘটন ঘটাল। জলেতে একটা দীর্ঘ কাঠের গুঁড়ি ভাসছিল। সেটা তার লক্ষ্যে না পড়াতে, লঞ্চটা নিয়ে গিয়ে সোজা ভেড়াল তার গায়েতে। ফল তার মোটেই ভাল হল না। একটা কর্কশ শব্দে আমার মধুর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আর একটু হলেই লঞ্চটা উল্টে যাচ্ছিল আর কি।

টলমল করতে করতে লঞ্চ যদিবা বাঁচল পড়লাম আর এক বিপদে। ভুলক্রমে যাকে কাঠের গুঁড়ি বলে মনে হয়েছিল, আদৌও সেটা কাঠের গুঁড়িই নয়। একটা

তেজী জ্যান্ত কুমীর। রীতিমত তাগড়াই চেহারা।

জলে দিব্যি গা ভাসিয়ে সে এতক্ষণ বিশ্রাম করছিল। আকস্মিক লঞ্চের ধাক্কা খেয়ে তার চেতনা ফিরে আসে এবং আত্মরক্ষার তাগিদেই সে লঞ্চটিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল।

বেগতিক বুঝেই আমি শেষপর্যন্ত স্টিয়ারিঙে হাত রাখলাম। বিলি অবশ্য এতে খুশী না হলেও, চালনার গুরুভার আপাততঃ আমার ওপরেই ছেড়ে দিল।

দু'হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরলাম। একটা বিপদজনক মুহূর্ত তো বটেই।

কুমীরটা ধাক্কা খেয়েছিল বলেই হয়তো রাগে সে আমাদের একটু বেকায়দায় ফেলতে চাইল। সড় সড় করে এগিয়ে এসে লঞ্চের গায়ে এমন একটা লেজের ঝাপটা মারল, আর একটু হলেই আমাদের পাতালপুরীতে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে যেতে হচ্ছিল আরকি।

হুঁঃ, কার হাতে স্টিয়ারিং বাছাধন তো জানত না। একরকম জলের তলা থেকেই টেনে তুললাম লঞ্চকে। অবশ্য হাতের তালুতে দু'ফোঁটা রক্ত জমে গিয়েছিল বলে ব্রজদা হাসলেন। তারপর আমাদের মুখের সামনে হাতটা মেলে ধরে বললেন, এখনও ব্ল্যাকস্পটটা আছে হাতেতে।

স্বভাবতঃই অনেকে কৌতূহলী হয়ে পড়ল ওটা দেখার জন্য। তবে স্পট বলে তিনি যেটা দেখাতে চাইলেন সেটা কিসের স্পট সেটাও গবেষণার বিষয়।।

ব্রজদা আবার মুখর হলেন।

দেখতে দেখতে সকালের আলো ফুটল। সাড়া পেয়ে গানের জলসা বসল গাছের ডালে ডালে।

কতরকম যে পাখী আর কতই না বিচিত্র তাদের ডাক।

মোটামুটি একটু আলো ফুটতে আমরা একটা নুয়ে পড়া গাছের গুড়ির গায়ে লঞ্চ ভেড়ালাম।

আশেপাশে গাছের ভীড় কম থাকার দরুন ভেতরটা অল্পবিস্তর ফাঁকাই ছিল।

স্পট সিলেকশন দেখে কিন্তু বিলি মোটেই খুশী হল না। আমতা আমতা করে বললে এখানে নামলে বটে কিন্তু আমার মন বলছে বাঘ-ফাগ তো দূরের কথা, টিকটিকি-গিরগিটিও এখানে মিলবে কিনা সন্দেহ।

অন্ততঃ আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাই বলে।

তার চিন্তার গভীরতা ইতিমধ্যেই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। তাই অযথা তর্ক না জুড়ে আমি নীরবই থাকার চেষ্টা করলাম। অর্থাৎ ফলেন পরিচিয়তে সেই কথাই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম তাকে।

গাছের ডাল নাগালে থাকাতে, লঞ্চ থেকে পাড়ে নামতে আমাদের কোনও অসুবিধা হল না। খুব সহজেই আমরা নেমে পড়লাম।

তবে নামার ব্যাপারে বিলি নানাভাবেই তার অনাগ্রহ প্রকাশ করে ফেলছিল। কারণ হিসাবে যে কথা সে বারবার বলছিল তা হল, সাঁতারের অ, আ, ক, খ-ও তার জানা নেই। জলে পড়ে গিয়ে অযথা ডুবে মরতে সে রাজী নয়। তার চেয়ে বরং লঞ্চ থেকেই শিকারের চেষ্টা চালানো ভাল। যাকে গুলী করা হোক না কেন সে কোনক্রমেই আক্রমণ শানাতে পারবে না। বা শানালেও সান্নিধ্যে পৌছতে পারবে না। ওর যুক্তি শুনে আমি নীরবই রইলাম। অতই যদি ভয় শিকার করতে আসার কি প্রয়োজন ছিল!

ঘরে বসে ললিপপ চুষলেই তো চলত।

কিন্তু বিলি বোধহয় মনে মনে তা জানলেও অন্যভাবে প্রকাশ করতে চাইল নিজেকে।

শেষ পর্যন্ত ও নামল আমার পিছু পিছু এবং আমাকে আড়াল করে এগুতে লাগল।

গাছটা যেখানে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে তার পাশেই একটা কাঁটা গাছের ঝোপ। আর ঝোপের মাথায় ভন্ ভন্ করছে এক ঝাঁক মাছি।

বিলির কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললাম, সী দেয়ার—

বিলি যেন চমকে উঠল এবং ঘুরে ঘুরে চারপাশে তাকাতে লাগল। ও ভেবেছিল রয়েল বেঙ্গল টাইগার বোধহয় আমাদের গন্ধ পেয়েই হাজির হবে।

চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললে, আই ডোন্ড ফাইন্ড এনি টাইগার।

আমি বুঝে নিলাম ব্যাপারটা। বললাম, না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওই ঝোপের মাথায় লক্ষ্য কর। আমার সন্দেহ হচ্ছে ওখানে কিছু আছে।

বিলি তাকাল। বাঘের বদলে একদল মাছিকে ঝোপের মাথায় ভন্ ভন্ করে দেখে একটু আশ্বস্তই হল।

একগাল হেসে বললে, ও দ্যাটস্ ফ্লাই। এক রাউন্ড গুলী চালাব নাকি?

ওর প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। আর বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করাও উচিত নয়।

তাই ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম সেখানে। ডালপালা সরাতেই দেখলাম একটা হরিণ অর্ধভক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।

তবে তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঘটনাটা ঘটার সময় আধঘণ্টাও ছাড়ায়নি।

বিলি ঝুঁকে পড়ে খুব মনযোগ সহকারে হরিণটা নিরীক্ষণ করতে শুরু করল। তারপর হঠাৎই পেছন ফিরে লঞ্চের দিকে পা বাড়াল।

আমি ওর হাত টেনে ধরতেই ও একটু বিরক্ত হয়ে বললে, আর এক মুহূর্ত এখানে

থাকা নিরাপদ নয়। বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

বাঘ সম্ভবত এখুনি আবার আসবে। চল আমরা লঞ্চে ফিরে যাই।

বুঝলাম বিলির সাহসের দৌড়। কোথায় বাঘ তার ঠিক নেই ও এখনিই পালাবার জন্য ব্যস্ত। বাঘের সামনা-সামনি পড়লে ও কী না করত!

ওর ডাকে সাড়া না দিতে স্বভাবিকভাবে ও বিস্মিতই হল। আমি ইশারায় বাঘের আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে সুমুখের দিকে এগুতে লাগলাম। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও আমাকে অনুসরণ করল। এতে ও হয়তো খুশী হল না। খুশী হবার কথাও নয়। বিড় বিড় করে ইংরিজীতে কিসব বলতে লাগল আমাকে।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। সেখান থেকে কয়েক পা এগুতেই যে নরম মাটি পড়ল তার ওপর স্পষ্ট বাঘের পায়ের ছাপ!

ও নিজের ভীরুতা গোপন করার জন্য হঠাৎ খুব উৎসাহ প্রকাশ করল এবং বাঘের সেই পায়ের ছাপের ওপর ঝুঁকে পড়ল। যেন এসব ছাপ তার খুবই পরিচিত।

আমি ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বললাম, বুঝেছি। অযথা আর গবেষণা চালিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। চল আমরা এই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোই।

আমি আগে আগে চলতে লাগলাম। ও আমার পেছনে। আমি হঠাৎ কোথাও থেমে পড়লে ও আমাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে না। আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। যেন আমিই তার হত্যাকর্তা বিধাতা।

বাঘের পায়ের ছাপ ধরে এগুনোর ফলে ও প্রায় ধরেই নিয়েছে, বাঘের সঙ্গে আমরা মুখোমুখি হচ্ছিই। নয় সামনে আর নয় পেছনে। যে কারণে ও বন্দুকটা নিয়ে নানাভাবেই লোফালুফি করছে। শূন্যে নিশানা করছে কতকটা সেই বক্সিং-এর স্যাডো-ফাইটের অনুকরণে।

মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাতেই সেই দৃশ্য আমার চোখে পড়ছে। তবে বলার কিছুই নেই। আচরণটা পুরোপুরিই রাজকীয়! আমরা দু'জনে চলেছি।

সওয়া শো গজের মতো এগিয়েছি হঠাৎ বিলি থমকে দাঁড়াল। বলল, আর বেশী এগুনো ঠিক নয়। অপরিচিত জায়গা। পথভ্রম হতে পারে।

তার চেয়ে বরং চল কোনও উঁচু জায়গা দেখে, সেখান থেকে অনুসন্ধান চালানো যাক।

তাতে কার্যসিদ্ধিও যেমন হবে, তেমনই বিপদের ঝুঁকিও থাকবে না।

বিলিকে নার্ভাস হতে দেখে আমি আর না হেসে পারলাম না। বললাম, ছিঃ, ছিঃ জানতাম ইংরাজ লড়াকু জাত। তুমি তো দেখছি সেই জাতের মুখে চুনকালি মাখিয়ে তবে ছাড়বে।

আমি একা হলে হেঁটেই যেতাম। তবে তোমার পথ প্রদর্শক হয়ে যখন এসেছি,

তোমার ইচ্ছা পূরণ করাই আমার কর্তব্য। আর সেই জন্যই আমি থামছি আপাততঃ। এ ছাড়া আর অন্য কোনও কারণ নয় কিন্তু।

এখন কোথায় মাচা বাঁধা হবে সেটা নির্বাচনের দায়িত্ব তোমারই। তুমি এখন দেখ সেটা কোথায় করা যায়।

বিলি চারপাশে তাকিয়ে চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ পশ্চিম দিক বরাবর একটা খেজুর গাছ দেখিয়ে বললে, গাছের পোজিসনটা ভালোই। পাশেই সুন্দরীর ঝোপ। ওখানেই মাচা বাধা শ্রেয়। গাছটা উঁচুও আছে কাঁটাও আছে। বাঘ মারতে গেলে এখন আমাদের এই রকমই একটা আশ্রয় দরকার।

আমি বললাম, গাছটার হাইটটা তো বেশী নয়। চিতাবাঘ তো আবার গাছেও চড়ে শুনেছি।

শুনে বিলি বেশ একটু চিন্তায় পড়ে গেল। তাইতো! তাহলে এই গাছে মাচা বেঁধেই বা লাভ কি? ওকে ঘাবড়ে যেতে দেখে, ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, ব্রাদার নার্ভাস হবার কোনও কারণ নেই। কোন্ বাঘের পায়ের ছাপ কি রকম আমার মুখস্থ। এই দেখ ছবি। পকেট থেকে একটা বই বার করে ওর হাতে দিলাম।

পাতায় পাতায় রকমারি বাঘের পায়ের ছাপ! আর সঙ্গে তার ছবিসহ পরিচিতি।

আমি গাছে উঠে একরকম হাত ধরেই টেনে তুললাম বিলিকে ওপরে। একবার সে তো প্রায় হাত ফসকেই গাছ থেকে পড়ছিল আর কি।

ভাগ্যজোরে একটা ডাল ধরে ফেলে সে যাত্রা বেঁচে গেল। তবে অকৃতজ্ঞ নয়। সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাল আমাকে।

গাছের মাথায় উঠে দু'জনেই বেশ গুছিয়ে বসেছি। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দূরে একটা খাল জাতীয় জলাশয় দেখা যাচ্ছে। ওরও চোখ পড়েছে।

জলের ওপর সূর্যরশ্মি ছটায় রূপোর পাতের মতোই চক্‌চক্ করছে খালের জলটা। খালের মাঝ বরাবর মিশমিশে কালো রঙের দু'টি প্রাণী নড়াচড়া করলেও দূরত্বের গুণে ঠিক মত চিনতে পারা যাচ্ছে না তাদের আকৃতিটা।

তবে মেষ জাতীয় কিছু হবে বলেই অনুমান হচ্ছে আমাদের।

বিলির হঠাৎ কি হল বন্দুকটা তুলে তাক করতে লাগল তাদের প্রতি। স্বগতোক্তি করল 'একটা বৌনি করা একান্তই দরকার। বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হবার আগে টিপটা একটু ঝেলে নেওয়া উচিত।

*　　　*　　　*　　　*

সে যে সত্যি সিরিয়াস আগে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম এটা বিলেতি জোক মাত্র।

বন্দুকের নলটা চেপে ধরে বললাম, কর কি কর কি। এলে বাঘ মারতে আর মারতে যাচ্ছ কিনা বেড়াল। এমন মনোভাব তো তোমার কাছে প্রত্যাশিত নয়।

জান এতে আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে। তাছানা এখবর লোকে শুনে বা বলবে কি? দুজন সেরা শিকারীর পক্ষে—

কথাটা ও ঠেলতে পারল না। আমার চেয়েও যে ওর মানসম্মানের প্রশ্ন অনেক বেশী। রাজার জাত বলে কথা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্দুকটা ভাঁজ করে ও সবে রাখতে যাবে হঠাৎ সেই ঝোপের মধ্যে থেকে এক বাঘিনীর গর্জন ভেসে এল। সেই গর্জনে খান খান হয়ে গেল নিস্তব্ধতা!

তাড়াতাড়ি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বিলি বলল উই আর লাকি এনাফ, আগেভাগে গাছে উঠে পড়ে ভালোই করেছি কি বল। ধর যদি আমরা গাছে না উঠতাম ওর মুখোমুখি হতে হতো আমাদের। যাহোক, বাছাধন এখন যেখানেই থাক, আমাদের দেখে পালাতে যাতে না পারে সেদিকে এখন আমাদের নজর রাখতে হবে। নাগালের মধ্যে পেয়ে যেন হাতছাড়া না হয়।

বরং এই অবসরে আমি ঘুরে ঘুরে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে যাই। একটা না একটা বাঘের গায়ে লাগবেই। কত আর আত্মগোপন করবে নিজেকে।

বাঘ না দেখে ও বিলির এলোপাতাড়ি গুলি চালানোর প্রস্তাবে আমি তো একেবারে থ; বলে কিরে বাবা, সাহেব বলে কি মাথা কিনেছে নাকি।

অবশ্য পরেই মনে হল বড়লাটের শ্যালক বলেই একথা তার পক্ষে বলা সম্ভব। ফেল কড়ি মাখো তেলের তো ব্যাপার নেই। জামাইবাবু আছে যখন একটা বাঘ শিকার করতে গিয়ে দু'লক্ষ গুলী খরচ হলেও জামাইবাবু দিয়ে দেবে। অতএব চা-লা-ও!

আমার এই অলস ভাবনার অবসরেই হঠাৎ ট্রিগার টিপে বসল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে বন কাঁপিয়ে দু...উ...উ...ম্ শব্দটি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গভীর জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

গুলী ছুঁড়েই বিলি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাছের ওপর। ভাবসাব এমন যেন গুলী-খেকো বাঘ দৌড়ে এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে—এতক্ষণ গুলী ছোঁড়েননি কেন? আমি তো তখন থেকে গুলী খাবার জন্য অপেক্ষা করছি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ 'ধু-প' করে একটা শব্দ হল। বিলি সে শব্দ শোনা মাত্রই আমার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বললে, দোস্ত মার দিয়া—

আমি ওর কাণ্ড দেখে আর না হেসে পারলাম না। ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিঁয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, মিস্-ফায়ার।

মৃদু চাপ দিল। গুলী ছুটল বাঘের দিকে। কিন্তু কোথায় বাঘ আর কোথা দিয়ে গুলী গেল!

মিস্-ফায়ার হতে আমার মুখের দিকে আড়চোখে একবার তাকাল সে। যেন গুলী ছুঁড়ে বন্দুক টেস্ট করেছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে আবার গুলী ছোঁড়ার জন্য তৈরী হল সে। তার গোঁফ জোড়া নেচে ওঠার সাথে সাথে আবার গুলী—'গু-ডু-ম্। এবার লাগল গিয়ে সোজা একটা বেল গাছে। ঝপ্ ঝপ্ করে ক'টা বেল খসে পড়ল মাটিতে।

গাছ থেকে আকস্মিক বেল খসতে দেখে বাঘটা ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এক মুহূর্তের জন্য এবং এদিক সেদিক তাকাতে লাগল।

বিলি এবারেও ব্যর্থ হতে কিঞ্চিৎ মরিয়া হয়ে উঠল এবং রেগে মেগে পর পর এলোমেলো গুলী ছুঁড়তে লাগল।

অবিরাম গুলী বর্ষণের শব্দে এবারে বাঘের চোখ পড়ে গেল সরাসরি আমাদের গাছের ওপর। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সে দেখতেও পেয়ে গেল আমাদের। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই একটা বন কাঁপানো গর্জন করে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের গাছ বরাবর। এদিকে বাঘকে এগিয়ে আসতে দেখে বিলি নার্ভাস। দু'শো গুলী মধ্যে তখন পাঁচটি পড়ে আছে মাত্র। পাঁচটা গুলী সম্বল করে বিলির হাত কাঁপছে থর্ থর্ করে। এই পাঁ-চ-টা গুলী যদি মিস্ হয়, তখন?

দুর্ভাবনায় বিলির মুখ শুকিয়ে আমসি। বার বার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সে। একটা কিছু বলতে চায় সে কিন্তু লজ্জায় পাচ্ছে না। ওদিকে সময়ও খুব বেশী নেই। বাঘটা আসতে আসতে হঠাৎ লতাপাতায় পা'টা জড়িয়ে যাওয়াতে যেটুকু বিলম্ব—। বিলির হাত কাঁপছে। দেখে শুনে আমি মুচকি হাসলাম। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, এনি হে-ল-প ফ্রম মি?

একটা ঢোক গিলে ও বলল, সিওর'! অন্তে পর অবশিষ্ট পাঁচটি গুলী সহ বন্দুকটা তুলে দিল আমার হাতে। কাচুমাচু মুখে সে আমার কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে এসে বললে, টোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি। আমি আর রিসক্ নিতে রাজী নই।

কাইন্ডলি সেভ্ মি ফ্রম দিস্ ডেনজার।

কথাগুলো উচ্চারণ করার সাথে সাথে বিলির চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করতে লাগল।

ব্রজদা পর পর সিগারেটে বেশ কয়েকটা টান মারলেন এবং মুহুর্মুহু ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

এমন উষ্ণ মুহূর্তে তাঁর নীরব হওয়াটা অনেকেরই পছন্দ হল না। 'চালান-চালান' বলে চারপাশ থেকে মৃদু গুঞ্জন উঠল।

ব্রজদা এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন তিনি কঠিন বধিরতা রোগে আকস্মিক আক্রান্ত হয়েছেন। প্রজাপতি ঘোঁফের ডানায় হাসি ছড়িয়ে তিনি সিগারেটটি সদ্ব্যবহারে পুরোপুরি মনোনিবেশ করলেন।

আগুন যখন তাঁর হাতের আঙ্গুল ছুঁই ছুঁই হঠাৎ তাঁর সেই হাসির রেশ মিলিয়ে গেল প্রজাপতির ডানার আড়ালে।

শ্রোতারাও খুশী হল। নাকের ডগায় বাঘ দাঁড় করিয়ে কার আর বসে ঝিমুতে ভাল লাগে!

*　　　　*　　　　*　　　　*

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর পুনরায় মুখর হলেন : খুবই রিস্কের ব্যাপার। টারগেট মিস্ করলেই ম্যাসাকার। হয়তো বা বাঘের পেটেই অবশিষ্ট জীবনটা কাটাতে হবে।

বন্দুকে যথারীতি গুলী লোড করে নিলাম। আমার উদ্বেগহীন প্রস্তুতি দেখে বিলি একটু খুশীই হল এবং আমার পিঠ চাপড়ে বিড় বিড় করে সাফল্য কামনা করল।

ওয়ান-টু থ্রি-দুম : গুলী ছুটল বাঘ লক্ষ্য করে।

বাঘ তখন আমাদের কাছ থেকে বড়জোর পঁচিশ হাত দূরে। হঠাৎ 'হা আ-আ-লু' গর্জন করে উঠল। সে গর্জন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

আবার একটা গুলী দুম!

'লু-ম' বলে বাঘ বিড় বিড় করে উঠল। তারপরেই সে নীরব। ওদিকে বিলির উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বললে, একি? গুলী খেল অথচ বাঘ মরল না—কী ব্যাপার!

আমি হাসলাম। ইচ্ছে করেই মারলাম না! মেরে ফেলায় আবার কোনও কৃতিত্ব আছে নাকি! মারার চেয়ে বাঁচিয়ে রাখাতেই বেশী লাভ।

বিলি আমার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়েই বললে, সব গুলীই তো ফুরিয়ে ফেললে ব্রাদার। এখন যদি বাঘ আবার এগুতে শুরু করে—

হঠাৎ আহত বাঘটা আবার ডেকে উঠল। তবে 'হালুম'-এর পরিবর্তে 'হা-মু-ম' বেরুল মুখ দিয়ে।

বিলি বললে, এ কী কাণ্ড! বাঘ 'হামুম' ডাকছে কেন?

আমি বললাম, গাছ থেকে নেমে গিয়ে ওর চোয়ালটা ফাঁক করে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে। এখন আর বাঘকে কোনও ভয়ের কারণ নেই। বিড়াল মাসীর সঙ্গে প্রায় মিলে গিয়েছে।

শুনে বিলির চোখ তো ছানাবড়া। বাঘ দেখেই তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

আর বলে কি না মুখের মধ্যে হাত দিয়ে দেখতে!

বিলি কিন্তু অনড়। বললে, কে বাবা বাঘের কাছে যাবে! দরকার নেই আমার বাঘ শিকারে।

বিলির দুরবস্থা দেখে আমিই নামবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। সেটাও আবার তার ভাল লাগল না। বললে, না না, তুমি বাঘের পেটে গেলে আমিই বা একা ফিরে যাব কি করে! তোমার নামার দরকার নেই।

ওকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে শেষ পর্যন্ত আমিই নামলাম গাছ থেকে। যদিও বিলির সেটা একেবারেই মনঃপূত হল না।

বাঘটা কিন্তু তখন আর দাঁড়িয়ে নেই। নীল ডাউনের ভঙ্গীতে মাটিতে বসে লেজ নাড়ছে আর 'হামুম' 'হামুম' করে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে চলেছে।

আমাকে কাছে এগিয়ে যেতে দেখে সে রেগে গ-র্-র্-র্ করতে লাগল বটে, কিন্তু সেটা ফ-র্-র্-র্ শোনাতে লাগল।

আমি তো ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছি ব্যাপারটা। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমার অনুমানটা ঠিকই হল। বাঘের সামনেই তার ওপর নীচের দু'পাটি দাঁত খুলে মাটিতে পড়ে আছে। দাঁতের কিয়দাংশ গুলীর আঘাতে বিধ্বস্ত। বাঘ গর্জনের মধ্যেই সেটা সকরুণ দৃষ্টিতে বার বার দেখছে আর জিব দিয়ে দু'পাটি দন্তহীণ মাড়ি চাটছে।

আমি নির্ভয়ে আরও কাছে এগিয়ে যেতেই বাঘটা আমায় কামড়াবার জন্য প্রকাণ্ড হাঁ করল। জিভটা তার হাঁয়ের মধ্যে নুড়-নুড় করে নড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার গালে বিরাশি শিক্কার এক চাপড় মারলাম। আচমকা চড় খেয়ে বাঘটা প্রথমে গর্জন করে উঠল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের দুর্বলতার কথা স্মরণ করে আবার 'হা-মু-ম' বলে গর্জন করে উঠল।

আমি তখন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। নীল ডাউন রত রয়েল বেঙ্গল টাইগারটার কান পাকড়ে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলাম বিলির কাছে। বললাম গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে যাও বিলেত মুল্লুকে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। দন্তবিহীন বাঘ আর বেড়ালে আদৌ আর কোনও তফাৎ নেই। তবে দাঁতের পাটিটা সঙ্গে রেখে দাও। প্রমাণ হিসাবে।

বিলি দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই হাত বাড়িয়ে বাঘটার মাথা স্পর্শ করার চেষ্টা করল।

বাঘটা তার থাবাটা একবার তুলল বটে কিন্তু তার বেশী আর এগুলো না।

এতে বিলির সাহস আরও বেড়ে গেল। আমার কথামতোই সে হাতটা ঢুকিয়ে দিল তার মুখের মধ্যে।

দাঁত না থাকার যে জ্বালা! বাঘ চক্ চক্ করে চুষতে লাগল বিলির হাতখানা

বিলি না হেসে থাকতে পারল না। বললে, ইস্! কি দারুণ শুড়শুড়ি লাগছে।

ব্রজদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, বিলি খুশী মনেই বাঘটাকে নিয়ে বিলেত চলে গেল তবে—

হঠাৎ থেমে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলেন।

'তবে' না বললে হয়তো বা একটা মৃদু করতালি পড়ত কিন্তু ওই এক শব্দ সেই করতালির ওপর স্থগিতাদেশ জারী করল।

ননীর আর তর সইল না। বললে, ব্রজদা, অনুগ্রহ করে শেষরক্ষা করুন। আমাদের ধৈর্য এখন প্রায় শূন্য ডিগ্রী ছুঁই ছুঁই। আর অধিক বিলম্বে মাইনাসে নেমে যেতে পারে।

ব্রজদা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম বিলেতে পৌঁছে কিন্তু বিলি বাঘটাকে ফোকলা রাখেনি।

দু'পাটি নকল দাঁত তৈরি করে পরিয়ে দিয়েছিল তাকে। লোকের সামনে বার করার সময় পরিয়ে দিত অন্যসময় খোলাই পড়ে থাকত– পাছে পড়ে ভেঙ্গে যায়!

ব্রজদা ইতিমধ্যে সিগারেটের শেষাংশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটা প্রচণ্ড সুখটান দিলেন।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, গুরু দে-ব!

আরও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ঘরের মধ্যে। বিশ্বজিৎ বসেছিল ব্রজদার খুব কাছেতে। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

এতক্ষণ যে বরফ-নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল ঘরের মধ্যে হঠাৎ তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

লম্বুদা চুরুটটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে টেবিলে দু'বার ঘুষি মেরে বললেন, অর্ডার-অর্ডার! এতক্ষণ তোমাদের গল্প শোনালেন প্রখ্যাত গল্পকার ব্রজমোহন কারফর্মা।

এবার তোমাদের সামনে আসছেন তোমাদেরই অন্যতম প্রিয় গল্পকার অ্যান্টনি চৌধুরী ওরফে টেনিদা। এই সম্মেলনের তরফ থেকে আমি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁর জীবনের সেরা শিকার কাহিনীটি তোমাদের উপহার দেবার জন্য।

লম্বুদার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল করধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল সম্মেলনকক্ষ। তাঁকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়নি যাদের তারা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠল।

টেনিদা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করলেন এবং শ্রোতাবৃন্দকে ধৈর্য ধরে তাঁর গল্প শোনার জন্য আবেদন জানালেন। সবাই নীরব হতে টেনিদা বললেন, আচ্ছা, তোমরা কি ভূতের পাহাড়ের নাম শুনেছ?

হিমালয়ের সংলগ্ন নয় গিরিগোবর্ধনের নাম তোমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু এই পাহাড়টার খোঁজখবর সম্ভবতঃ তোমরা রাখ না। আমি বোধহয় ঠিকই বলছি। তোমরা কি বল?

টেনিদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

ভু-তে-র পা-হা-ড়! সমবেত গুঞ্জনে ক্লাবকক্ষ গম্ গম্ করে উঠল। এমন নাম যতদূর স্মরণে পড়ে তারা কেউই শোনেনি।

অনেকে কৌতূহলবশতঃ সভাপতি লম্বুদার মুখের দিকে তাকালেন। তিনি কিন্তু নীরব নিথর। জানলা দিয়ে বাইরে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজী নন।

টেনিদা চট করে হাওয়া ঘুরিয়ে নিলেন। একগাল হেসে বললেন, দ্যাটস্ নো ম্যাটার। তোমরা জানলে খুশী হতাম এই আরকি। এটাই আমার প্রত্যাশিত। তবে না জানলে করার কিছুই নেই। কারণ এটাতো ভারতে নেই। আছে মালয় উপদ্বীপে। মালয় উপদ্বীপ সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই তারা নাও জানতে পারে। এই ভূতের পাহাড়ের গায়ে বাঘেদের তাবৎ আস্তানা। বাঘেরা এখানে গুহার মধ্যে বাস করে আর মাঝে মাঝে মহল্লায় ঢুকে, মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খায়। এমন চুপিসারে কাজটি সারে কাকপক্ষী টের পায় না।

আকস্মিক যখন তারা হানা দেয়, মানুষের পক্ষে তখন ভয়ে কাঁপা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। ভাগ্য খারাপ হলে বাঘ ধরা পড়ে, নচেৎ পগারপার আর কি!

কেউ কেউ এই ভূতের পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে ব্যাঘ্র নিধন করার কথাও যে না ভেবেছেন তা নয় কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতার কারণ একটাই। মালয়বাসীদের বিশ্বাস যদি কেউ এই ভূতের পাহাড় অতিক্রম করে হয় তাকে বাঘে খাবে, আর নয়তো সে নিজেই বাঘ হয়ে যাবে।

যে কারণে স্থানীয় লোকেরা ভয়ে ভূতের পাহাড়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনে না—তাদের আশঙ্কা, নাম উচ্চারণেতেও নাকি বাঘ আসে।

এহেন ভূতের পাহাড়ের অধিবাসী এক ব্যাঘ্র দম্পতী হঠাৎ স্থানীয় অধিবাসীদের মনের শান্তি কেড়ে নিল। তারা প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে লোকালয়ে হানা দিতে লাগল এবং নির্বিচারে গরু-ভেড়া ছাগল-মানুষ ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল।

মালয় সরকার দেশীয় শিকারীদের এব্যাপারে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু কার আবেদন কে শোনে!

ভূতের পাহাড় বাসিন্দা ব্যাঘ্র-দম্পতীকে মারতে যাবার মত মনোবল কারুর ছিল

না। যে কারণে সরকারের নির্দেশ বা অনুরোধ কেউই কানে তুলল না।

এদিকে রোজই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগল। বিজ্ঞাপনের বয়ানটা মোটামুটি এই রকম—

'উৎপাতকারী এক ব্যাঘ্র দম্পতীকে কাবু করতে দক্ষ শিকারী চাই।

পুরস্কার দশ হাজার নগদ ও একটি মোটর গাড়ী। এছাড়াও কিছু লোভনীয় পুরস্কার। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা মানে বুঝতেই পারছ কি এলাহি ব্যাপার। দেড় হাজার টাকায় তখন দু'খানা জাহাজ কেনা যেত।

কে আর ছাড়ে এমন সুবর্ণ সুযোগ। ভারতীয় কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে চক্ করে একটা 'পিসি' ছেড়ে দিলাম।

টেনিদা হঠাৎ থেমে পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে দু'টিপ নস্যি তুলে পরম নিশ্চিন্তে নাকের কোটরে ঠেসতে লাগলেন।

তাঁর এই নস্যি ঠাসার ভঙ্গী দেখে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

কেবলমাত্র সর্দিতে নাক বন্ধ হলেই সকলকে যে অস্বস্তি ভোগ করতে হয় অল্পবিস্তর সকলেরই সে অভিজ্ঞতা আছে। সে জায়গায় নস্যিতে পথ অবরোধ ঘটলে কি না ঘটতে পারে সহজেই অনুমেয়।

টেনিদা নস্যিটা নাকে ঢুকিয়ে কয়েকমুহূর্ত জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন শ্রোতাদের দিকে। সে দৃষ্টির ভাষা বোঝাই দায়।

একটা কিছু তিনি করতে চান কিন্তু সেটা যে কি কেউই আঁচ করে উঠতে পারছে না।

হঠাৎ হাতের তালুটা নাকের ডগায় চেপে ধরে তিনি 'গঁ-গঁ-গঁ-গঁ' করে একটা বিকট শব্দ করলেন। সেই শব্দ শুনে অনেকেই ভীত হয়ে পড়ল।

ব্যাস মাল খালাস। দু'নাক খালি করে নস্যি উঠে গিয়ে জমা পড়ে গেল মধুভাণ্ডে। টেনিদার মুখে এবার খুশীর ঝিলিক খেলল।

রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বললেন, স্যরি ফর ইনটারাপসন হ্যাঁ কোথায় যেন এসে থেমেছি?

স্বপন মুচকি হেসে বলল, 'পিসি' ছেড়ে।

টেনিদা হাসলেন। শুধু ছাড়িনি। লিখলাম দশহাজারে হবে না। মেক ইট ডবল অর্থাৎ বিশ হাজার দিতে হবে। প্রতি বাঘ পিছু দশ হাজার। তাছাড়াও আমার একজন অ্যাসিস্টেন্টের যাতায়াত খরচ।

স্বপন আবার সরব হল। বললে, আপনি করবেন শিকার। তা অ্যাসিস্টেন্ট গিয়ে কি করবে?

প্রশ্ন শুনে টেনিদা একটু বিস্মিতই হলেন। তবে সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। তার মুখের দিকে আড়চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক ঝলক হেসে বললেন, শিকার সম্বন্ধে তোমাদের আদৌ কোন ধারণা নেই মনে হচ্ছে। কোনদিন যদি বন্দুক ছুঁতে একথা বলতে না—

এলেবেলে শিকারীরাই বন্দুক কাঁধে নিয়ে শিকারে যায়। কিন্তু ক্লাস ওয়ান শিকারীদের সহকারীরাই সেটা বয়। তাঁদের কাঁধ এত সস্তা নয়।

এমন কি শিকার সাজিয়ে পর্যন্ত দেয় তারা। শিকারী কেবল মূহূর্ত বুঝে ট্রিগার টেপে। কৃতিত্বটা শিকারীই নেয়। আর মৃতদেহটা সহকারীর কাঁধে চাপে।

টেনিদা মুচকি হাসলেন।

স্বপন একটু বোকা বনে বসে পড়তে তিনি আবার মুখর হলেন। বললেন, ভেবেছিলাম এত বায়নাক্কার শুনে হয়তো ওরা সাড়াশব্দ করবে না। কিন্তু তিনরাত পেরোল না। মালয় থেকে ফ্যাক্স এসে হাজির।

'এক' জন কেন, একশ' জন সহকারী আনতে পার। টাকার জন্য দ্বিধা বোধের প্রয়োজন নেই। অ্যাট এনি কস্ট আমরা ব্যাঘ্র নিধন করতে চাই।

গ্রিন সিগন্যাল পৌঁছতে ফেলু আমায় ধরে বসল। ছেলেবেলা থেকেই ওর খুব অ্যাডভেঞ্চারের সখ। সরকারী পয়সায় এমন সুযোগটা সে সদ্ব্যবহার করতে চায়। এমন কি এ কথাও, সে আমাকে বললে।

এই সুযোগ তাকে দিলে সে আমায় যে কোনওরকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। অর্থাৎ কোনও ব্যাপারেই সে পিছপা হবে না।

ফেলু কে ভালভাবেই চিনি। সে যথার্থ সহকারী হবার সবরকম যোগ্যতাই রাখে। যেমন তার সাহস তেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। দুটো গুণই তার ফিফটি ফিফটি।।

তাই তার অনুরোধটা সহজে ঠেলতে পারলাম না।

দমদম এয়ারপোর্টে আমার ঘনিষ্ঠ শিকারী বন্ধুরা সকলেই আমাকে সী-অফ করতে এল। তাদের ভীড় ঠেকাতে পুলিশ তো প্রায় হিমসিম খাবার যোগাড়। সকলের মুখেই এক কথা—অ্যান্টনী বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিস। দেখিস বুক ফুলিয়ে বাঘ মারতে গিয়ে যেন নিজেই বাঘের পেটে চলে যাসনি।

আমি তাদের অনুরোধের কোনও জবাব দিইনি। দেবারই বা কি আছে। আমার এক মাইল রেঞ্জের মধ্যে কোন বাঘ ঢুকে পড়লে, তাকে দু'চারটে গুলী না খাইয়ে আমি অতীতে কখনও ছাড়িনি। আমার শিকারের রেকর্ড-বুক অন্ততঃ সেই কথা বলে।

যথাসময়ে প্লেন ছাড়ল। মালয় এয়ার ওয়েজের এক ঢাউস এয়ারবাস এসেছিল ামাদের নিতে। ওদের ধারণা ছিল আমি অন্ততঃ জনা পঞ্চাশ সহকারী নিয়ে যাব। কজন দেখে যেন কিছুটা ঘাবড়েই গেল। জোড়া বাঘ বলে কথা, তাও আবার বিদেশ ভূঁয়ে! সেখানে এত সাহস দেখানো রীতিমত বুকের পা-টা থাকা চাই।

যাহোক একরকম রাজকীয় আদরেই আমরা তো মালয় পৌঁছালাম। সেখানে নেমে তা হতভম্ব!

রানওয়ের আশেপাশে সূচাগ্র মেদিনীও আমাদের চোখে পড়ল না। খালি মাথা ার মাথা—মনে হবে সারা এয়ারপোর্টটাই বুঝি মানুষের মাথা দিয়ে তৈরি হয়েছে। াদা কালো চুল দুই-ই আছে।

তারা বেশ সংযত হয়েই আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল। হঠাৎ অটোগ্রাফের হুজুক ঠতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জনতার মধ্যে। কয়েক হাজার হাত এগিয়ে এল আমার খের সামনে।

এদিকে অটোগ্রাফ দিতে দিতে তো আমার কলমের কালি শেষ। ভাবলাম যাক াঁচে গেলাম এ যাত্রা। না আমার অনুমান ঠিক নয়। অত্যুৎসাহী একজন ভক্ত দোকান কে এক বোতল কালি কিনে এনে হাজির। বললে, আপনি চালিয়ে যান। ফুরোলেই বেন। কলম ভর্তি করে দেব।

এবারে আর কিছু বলার নেই। অটোগ্রাফ দিচ্ছি তো দিচ্ছিই, দিচ্ছি তো দিচ্ছিই। হঠাৎ টেনিদা থেমে গেলেন। ডানহাতের তর্জনীটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন জতে লাগলেন।

বিশু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল, কি হল আবার আপনার আঙ্গুলে?

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দেখছি অটোগ্রাফ দিতে দিতে আঙ্গুলে কালশিটের দাগটা পড়েছিল সেটা মিলিয়ে গিয়েছে কিনা। অনেকদিন লক্ষ্য পড়েনি।

অটোগ্রাফ দেওয়ার সঙ্গে কালশিটে পড়ার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে অনেকেরই থায় ঢুকল না। অটোগ্রাফটা কোনও তো ভারী বস্তু নয়।

বিশুও তাই নাছোড়বান্দা। বললে, ওটাও বোধ হয় আপনার ওই কালির দাগ। বান দিয়ে ধুলেই মুছে যাবে।

কা-লি! টেনিদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সেদিন ওই কয়েক হাজার টোগ্রাফ দেওয়ারই পরিণাম এটা। ক্রমাগত কলমের চাপে রক্ত জমে কালশিটে ড় গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও তুলতে পারিনি। প্লাস্টিক সার্জারি করার ইচ্ছা ছে।

তাঁর বক্তব্য শেষ হতে, অনেকেই ঝুঁকে পড়ল দাগটা দেখার জন্য। এমনকি ব আঙ্গুল ধরে টানাটানি পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল শ্রোতাদের মধ্যে।

হঠাৎ তিনি 'বাপস্ রে' বলে চীৎকার করে উঠে সাময়িকভাবে নিজেকে মুক্ত করলেন। সাথে সাথেই কালশিটে প্রসঙ্গ চাপা পড়ল।

আমাদের মালয়ের স্টেট-গেস্ট হোটেলেই তোলা হল। ফরেস্ট অফিসার মিঃ লং বঙের সঙ্গে টেবিলেই আলোচনা শুরু হয়ে গেল ব্যাঘ্র নিধন প্রসঙ্গ নিয়ে।

মিঃ লং বঙ একজোড়া বাঘের ছবি আমাদের চোখের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, এই সেই মহারথীদ্বয়—যাদের সঙ্গে আপনাদের শক্তির লড়াই। শত্রুকে আগে ভালো করে চিনে নিন। শিকারে সুবিধা হবে।

এই বাঘিনীটাই সাধারণতঃ আক্রমণ করে থাকে আর বাঘটা তাকে প্রোটেকসন দেয়। অর্থাৎ পিছনটা আগলায়।

তবে চট্ করে আপনারা এদের বাগে আনতে পারবেন বলে মনে হয় না। এরা শুধু হিংস্র নয়, এরা গুলীও হজম করার ক্ষমতা রাখে। মিঃ লং বঙ বেশ চিন্তিত হয়েই কথাগুলো বললেন। যা শুনে আমার হাসি পেল। আবার হাসতে গিয়েও বিপদে পড়লাম।

ফেলু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, দাদা! হাসছেন, কী ব্যাপার? এটা কি হাসার কথা হল! ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, কেউ আমায় ভয় দেখালেই হাসি পেয়ে যায়। ওটাই আমার রোগ।

যাহোক, মোটামুটি খোঁজখবর যা নেবার সবই নিয়ে নিলাম। সরকারী গাড়ী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সেই গাড়ী চড়েই আমরা সেই বিখ্যাত ভূতের পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

গাড়ীর ড্রাইভার আমাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার আগেই নানারকম ধানাইপানাই শুরু করল। একবার বললে, ওর বাবা অসুস্থ, এখুনি বাড়ী যাওয়া দরকার। না গেলে বাবাকে আর দেখা হবে না।

একবার বললে, চোখের মধ্যে দপ্ দপ্ করছে, ভালো করে পথঘাট দেখতে পাচ্ছি না। যে কোনও সময় কলিসন ঘটতে পারে।

একবার বললে, গাড়ীতে তেল পুরতে ভুলে গিয়েছি। মাঝপথে যদি তেল ফুরিয়ে যায় কপাল চাবড়াতে হবে।

অর্থাৎ সে যে আমাদের নিয়ে আর এগুতে চায় না সেটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল আমাকে।

ব্যাপারটা মোটামুটি আঁচ করেই আমি তাকে অব্যাহতি দিলাম। সে আমাদের ওই পাহাড়ের কাছাকাছি নামিয়ে দিয়েই গাড়ী নিয়ে নিমেষের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল।

ফেলু বললে, দাদা! ওকে ছেড়ে দিলেন! কিন্তু জায়গাটাতো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাছাড়া গাড়ী ড্রাইভিঙেরও ব্যাপার আছে।

আমি বললাম, অ্যাসিস্টেন্টহয়ে এসেছ ভুলে যেও না। প্রবলেম শব্দের অর্থ আজও আমার কাছে অজানা রয়ে গি-য়ে-ছে!

ফেলু শুনে একবার ঢোক গিলল মাত্র।

ভূতের পাহাড়ের অস্তিত্ব সুমুখেই উজ্জ্বল। তবে পাহাড়ের পথটা দুর্গম বলেই মনে হচ্ছে। দু'ধারে বিস্তৃত ঘন জঙ্গল।

দু'জনে রওনা হলাম। কিছুপথ এগোতেই সামনে ডোরিয়ান গাছের ঝোপ-জঙ্গল চোখে পড়ল।

ডোরিয়ান ফল খেতে খুবই সস্বাদু। তার মিষ্টি গন্ধও ভুর ভুর করছে চারপাশে।

তারপর কিছু এগুতেই সামনে একটা গাছ পড়ল। বন্দুকের নলের খোঁচা মেরে কটা ডোরিয়ানও পাড়লাম। এই ডোরিয়ান ফল জীবজন্তুর কাছে খুব লোভনীয়। তাই প্রয়োজনের তাগিদে কিছু পুরে ফেললাম ঝুলিতে।

ক্রমশ: ঝোপ-ঝাড় ঘন হতে শুরু করল। আকাশে সূর্য উজ্জ্বল কিরণ দিলেও গাছের ছায়ায় চারপাশে আঁধার ঘনিয়ে এল।

তবে সেটা কিছু পথ। ক্রমশ: সে ঝোপ-ঝাড় ফেলে আমরা এক বালুকাময় উদ্যানে গিয়ে হাজির হলাম।

বিস্তীর্ণ এই বালুকাময় উদ্যান দেখে ফেলু জুতোটা পা থেকে খুলে ফেলল এবং লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। এত বালি একসাথে বোধ হয় ফেলু জীবনে কখনও দেখেনি।

আমি ওর হাত টেনে ধরলাম। বললাম, করকি—করকি, এ যে সব চোরাবালি।

পা পড়ে গেলে গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে, কিংবা সবটাই।

আমাদের নির্দেশানুসারে ফেলু আর এগোয়নি। এখানেই এসে থেমে গেল।

আরও কিছু পথ এগুতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। একটা বড়সড় কুমীর নদীর জলে নিশ্চলভাবে হাঁ করে পড়ে আছে।

বালি ছেড়ে এবার ফেলু কুমীর নিয়ে পড়ল। বললে, দাদা! দেখুন তো কুমীরটা জীবিত, না মৃত।

আমি তার প্রশ্ন শুনে হা-হা করে হেসে উঠলাম।

ফেলু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কী ব্যাপার, হাসছেন যে বড়?

আমি বললাম, কুমীরেরা বড় অভিনেতা। মশা ধরার ধান্দায় তারা ওইরকম হাঁ করেই পড়ে থাকে।

খোলা জিবে যখন মশারা দলবদ্ধভাবে ভোজ করতে বসে ঠিক সেই মুহূর্তে কুমীর মুখ বন্ধ করে মশার দলটাকে পেটে চালান করে দেয়।

ফেলু সঙ্গে সঙ্গে বায়নাকুলারটা চোখে লাগিয়ে সত্যতা যাচাইয়ে তৎপর হয়ে উঠল।

কুমীর ফেলে আবার আমরা এগুতে শুরু করলাম। বাঘ হাতী গণ্ডার প্রভৃতি নানারকম জীবজন্তুর পায়ের ছাপ আমাদের চোখে পড়তে লাগল।

ফেলুকে বললাম, মাচা বাধার উপযোগী একটা গাছ খোঁজ। রাত হবার আগেই আমাদের সে ব্যবস্থা সেরে ফেলতে হবে।

ফেলু যে এসব কাজে খুব পাকা শীগগিরই তা প্রমাণ করল মাচা বাধারউপযোগী একটা গাছ নির্বাচন করে। গাছটার ডালপালাগুলো এমনভাবে সাজানো যে তারওপর হাত-পা বিছিয়ে শোয়াও চলতে পারে আবার আত্মগোপন করে বসে ফায়ারিংও করা যায়।

আর কথা নয় এখন প্রস্তুতি। আগে ফেলুকে গাছে তুলে দিলাম। তারপর একে একে শিকারের সাজসরঞ্জাম ছুঁড়ে ছুঁড়ে তার হাতে তুলে দিতে লাগলাম।

এই গাছ থেকে ভূতের পাহাড় বেশী দূরে নয়। সেখানে বাচ্চা হরিণ চরলে তাও স্পষ্ট দেখা যায়।

বাঘের গুহাগুলোও মোটামুটি দৃশ্যমান। এখন তার ওপরেই তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে আমাদের।

এই গাছের মাথায় দু'দিন দু'রাত কাটল। অন্যান্য জীবজন্তু অল্প বিস্তর সবই চোখে পড়ছে কিন্তু যার দর্শন লাভে বসে থাকা তার আর পাত্তা নেই।

ফেলুর এবার একটু ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বললে, দাদা! বাঘের তো ব-ও চোখে পড়ছে না! কতদিন আর কতক্ষণ মশার কামড় খেয়ে গাছে চড়ে বসে থাকবেন?

আমি ঘাড় নাড়লাম। উঁ হুঁ ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। বাঘ বাবাজী যদি স্বেচ্ছায় না আসেন তাহলে ঘাড় ধরে তাকে টেনে আনতে জানি আমি। শুধু হাতে আমরা ফিরে যাব না মনে রেখো।

ঘাড় ধরে বলাতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হল ফেলু। সে আমতা আমতা করে বললে, বাঘ কি মেনি বেড়াল যে ঘাড় ধরে তাকে ধরে নিয়ে আসবেন?

আমি হা-হা করে হাসলাম। কিড্ ব্যাগ থেকে একটা তারের জাল বার করে বললাম, ফাঁদ।

চল পেতে রেখে আসি। দেখি মাণিকেরা কেমন ধরা না দেয়।

ফাঁদ পাতার প্রস্তাবে ফেলুর উৎসাহ হঠাৎ বেড়ে গেল। গুলী না ছুঁড়েই যদি কার্যোদ্ধার হয়ে যায় মন্দ কি। সে সোৎসাহেই এগিয়ে এল আমাকে সাহায্য করার জন্য।

চারপাশে যে ছোট ছোট গাছ ছিল তারই ডালপালায় ওই জালটা জড়িয়ে দিল। আমি এবার সেই ডোরিয়ান ফল কটা জালের আশে পাশে ছড়িয়ে দিলাম।

মুহূর্তে সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

কাছাকাছি যে সব জীবজন্তু ছিল তারাও সেই গন্ধ পেয়ে উঁকি ঝুকি মারতে শুরু করল আশে পাশে।

তক্কে তক্কেই রইলাম। একটা নধর হরিণ শিশু লাফাতে লাফাতে ওই জালে আটক পড়তেই আমি পিছন থেকে তার পা দু'টো টেনে ধরলাম।

আচমকা ধরা পড়াতে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার বিপদের কথা বুঝতে পেরে প্রাণপণ ডাকতে শুরু করে দিল।

ওই ডাকেই কাজ হল। সে চীৎকার ভূতের পাহাড়ের কৃপায় প্রয়োজনীয় কর্ণকুহরে প্রবেশ করল।

রাত বাড়ছে। ধীরে ধীরে আকাশ জুড়ে চাঁদ উঠেছে।

আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এদিকে সন্ধ্যের আমেজ কেটে যতোই রাত গভীর হচ্ছে হরিণের ডাকও স্তিমিত হয়ে পড়লেও মাঝে মাঝেই আবার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

আমি বন্দুক নিয়ে তৈরী। বাইনাকুলার ঘুরছে বন্ বন্ করে চারদিকে।

ফেলুর হঠাৎ কি হল, বাইনাকুলারটা হঠাৎ চাঁদের দিকে ঘুরিয়ে বললে, দাদা দেখুন চাঁদের গায়ে আগ্নেয়গিরিটা কীরকম কাঁপছে। বোধহয় এখুনি বিস্ফোরণ হবে।

এটা নিছক ফেলুর ছেলেমানুষী জেনেও হঠাৎ কী মনে হল, বায়নাকুলারে চোখ রাখলাম। বেশ যখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি ঠিক সেই সুযোগেই —টেনিদা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন।

শ্রোতারা কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারল না। কি হল চীৎকারে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

টেনিদা আড়চোখে তাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুচকি হেসে আবার মুখর হলেন।

আমাদের চাঁদ দেখার অবকাশে ধূর্ত সেই বাঘটা পা টিপে টিপে হাজির হয়েছে ফাঁদে আটকানো হরিণটার কাছে এবং কালক্ষেপ না করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে হরিণের ঘাড়ের ওপর।

অস্পষ্ট চাঁদের আলো হলেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম সবকিছু।

ফেলু বললে, দাদা শেষ পর্যন্ত বাজিমাৎ করলেন। বাঘ তো এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

ইতিমধ্যে বাঘটা হরিণের মুণ্ডচ্ছেদ পর্বটা সেরে ফেলেছে। এবং ভোজন পর্বের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ফেলুর আর অপেক্ষা সইল না। পা টিপে টিপে এগুতে লাগল ফাঁদের খুট ধরে টান দেবার জন্য এবং দিলও। ফলে বাঘ প্রায় বন্দী হয়ে পড়ল। তবে সে কিছুই টের পায়নি।

ইতিমধ্যে বাঘটা আরও কিছুটা উদরস্থও করে ফেলেছে। এবং থেকে থেকেই হুঙ্কার ছাড়ছে।

আর তার ফলেই ঘটল এক অঘটন। বাঘটার ওই হুঙ্কার শুনে হঠাৎ বাঘিনীটা কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে।

বাঘের বিপদ দেখে সে কিন্তু মোটেই খুশী হল না। থাবা মেরে সে তাকে জাল-মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

এত সহজে বাঘটাকে কব্জা করা যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। স্বভাবতঃই এই সাথে বাঘিনীটাকেও কিভাবে ফাঁদে ফেলা যায় সেই চিন্তাই আমার মাথায় পাক খেতে লাগল।

এদিকে জালে যেভাবে বাঘটা জড়িয়ে পড়েছে, তার মধ্যে বাঘিনীটাকে এখন পোরা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। তাকে ধরতে না পারলে সে কাজ করা সম্ভব নয়।

ফেলু আমতা আমতা করে বললে, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি কিন্তু যদি ফেলিওর হই হরিণের মাংসের বদলে আমাকেই বাঘিনীর পেটে গিয়ে বসবাস করতে হবে। সেটা কি সম্ভব?

টেনিদা হঠাৎ একফালি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, কিন্তু তোমরা তো জানই ভয় বলে কোনও জিনিস পৃথিবীতে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এটা সবটাই কাল্পনিক ব্যাপার।

ফেলুকে তাই বললাম, তোর গাছ থেকে নেমে বাঘ ধরতে যাবার প্রয়োজন নেই। আমিই নামছি। তুই শুধু নামার পর বন্দুকটা হাতে তুলে দিবি। তারপর যা করার আমিই করব।

তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব দুটোকে একইসাথে বন্দী করে নিয়ে যেতে। ফেলু আমতা আমতা করে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। আমি অবশ্য তার হাঁ করা দেখেই বুঝেছিলাম সে কি বলতে চায়।

গাছ বেয়ে আমাকে নামতে দেখেই জালবন্দী বাঘটা 'হালুম' বলে গর্জন করে উঠল। দেখাদেখি বাঘিনীটাও।

আমি মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই হাত বাড়ালাম ফেলুর হাত থেকে বন্দুকটা নেওয়ার জন্য। কারণ বাঘিনীটা ইতিমধ্যেই ধুলোয় থাবা আঁচড়াতে শুরু করেছিল। বাঘিনীর

হাবেভাবে ফেলু এতোই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে বন্দুকটা আমার হাতে দিতে গিয়ে ফেলে দিল মাটিতে।

ঘটাল আর এক অঘটন। নীচেই একটা পাথরের ঠোকায় বন্দুকের নলের মুখ ঈষৎ বেঁকে গেল। টার্গেট অনুযায়ী গুলী যাবার পথও রইল না।

সামনে ছাড়া বাঘ। বন্দুক বিকল। ভাব সে কি অসহায় অবস্থা!

ফেলু তো প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ ছলছল করছে। এদিকে বন্দুক মাটিতে পড়ার শব্দে বাঘিনী সচকিত হয়ে উঠল এবং আমার দিকে কটকট করে তাকাতে লাগল। বাঘকে বন্দী করার রাগে তার চোখদুটো তখন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। সম্ভবতঃ সে আমাদের অসহায় অবস্থাটা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছে।

আমি সাধারণতঃ ঘনঘন ধূমপান করি। দারুণ টেনসনে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটা বার্মা চুরুট বার করে ধরালাম। সামনে সুবর্ণ সুযোগ!

এমন জোড়া বাঘ মারার সুযোগ যদি হারাই ভবিষ্যতে তা আর মিলবে কিনা সন্দেহ।

বাঘিনীটা এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। এবার সে এক পা এক পা করে এগুচ্ছে। অন্ততঃ তার ভাঁটার মত চোখ দুটো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে সেই রকমই মনে হচ্ছে।

খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই! বাঘাযতীনের কথা মনে পড়ল। চোদ্দ বছর বয়সে খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়েছিল কিন্তু অত শক্তিতো নেই আমার গায়ে।

ফেলু কিন্তু আমার এই দুঃসাহসকে মানতে পারল না। বললে, করছেন কি? দরকার নেই বীরত্ব দেখিয়ে। গাছে উঠে পড়ুন। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

তাছাড়া আপনাকে খেলে কি আর আমাকে ছেড়ে দেবে? প্রয়োজন বোধে গাছে চড়েও খেয়ে যাবে।

ফেলুর কথাগুলো আমার কানে আসছিল ঠিকই। কিন্তু আমি অত ঘাবড়াবার পাত্র নই। এ যাবৎ আমার আটানব্বইটা বাঘ শিকারের রেকর্ড আছে। এ দু'টো যোগ হলে সেঞ্চুরি হবে।

সেঞ্চুরি কি অত সহজে ছাড়া যায়?—টেনিদা মুচকি হাসলেন।

এতক্ষণ অনেকেই ফিসফাস করছিল। কিন্তু সেঞ্চুরির কথা শুনে সকলেই নীরব। বাঘামারায় সেঞ্চুরি, সেকি যে সে ব্যাপার।

বাঘিনীটা ক্রমশঃ বড় বড় পা ফেলেই এগুচ্ছে।

আমি ধরতে চাই ওকে, ও ধরতে চায় আমাকে। দেখা যাক্ পরীক্ষায় কে জেতে!

চুরুটে জোর টান দিতেই হঠাৎ বাঘিনীটা থমকে দাঁড়াল।

তবে কি?

বাঘিনী আর এগুলো না বটে, তবে থাবা মেরে মাটি তুলতে লাগল।

অর্থাৎ সে যে আর না এগিয়ে আমার ঘাড়ে লাফ মারতে চায় সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। অনেক বাঘ ঘেঁটেছি বলেই ওদের চরিত্র জানি।

আমিও তৈরী। এস্পার—ওস্পার একটা কিছু ঘটবেই! মুহূর্ত গুনছি এক-দুই-তিন-চার......

ফেলু ধরা গলায় বললে, দাদা এখনও গরীবের কথা শুনুন। জীবন নিয়ে এমন ছেলেখেলা করবেন না। পরে এজন্য পস্তাতে হবে।

ফেলুর কথা শুনে আমি মুচকি হাসলাম মাত্র। সে দেখতে পেল না।

বাঘিনীটা হঠাৎ বন কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠল। বুঝলাম, এটা হল ফাইন্যাল বেল। আমি চুরুটটা শক্ত করে চেপে ধরলাম!

আর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘিনী আমাকে লক্ষ্য করে মারল লাফ। আমি তো তৈরীই ছিলাম—শুধু টুক করে ফেলে দিলাম।

আবার চীৎকার—কিন্তু সে চীৎকার ভোলার নয়। হাঁ করেই লুটিয়ে পড়ল বাঘিনী আমার পায়ের তলায়।

টেনিদা দুটি আঙ্গুল একত্র করে ধরে রইলেন মুখের সুমুখে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বাঘিনী তো কাবু হল কিন্তু ফেলুকে সামলানো দায়।

সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না বাঘিনী এখন বেড়ালে পরিণত হয়েছে। কিছুতেই গাছ থেকে নামবে না। শেষকালে ওর লেজ ধরে যখন বন্ বন্ করে ঘোরাতে শুরু করলাম তখনই ফেলু গাছ থেকে নেমে এল এবং সাষ্টাঙ্গে আমায় প্রণাম করে পদধূলি মাথায় ছোঁয়াল।

স্বপন হঠাৎ বলে উঠল, তা তো বুঝলাম কিন্তু অমন তেজী বাঘিনীটা কেনই বা বেড়াল হল সেটা তো বললেন না!

টেনিদা হাসলেন। বললেন—বাঘিনীটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়া মাত্রই জ্বলন্ত চুরুটটা তার হাঁয়ের মধ্যে ফেলে দিলাম! সে সুখাদ্য ভেবেই সেটা গিলে ফেলল। ব্যাস তাতেই কাজ। চুরুটের আগুন তাড়াতাড়ি নেভেনা। ধিকি ধিকি জ্বলে। তার ফলেই তার পেটের মধ্যে জ্বলুনী শুরু হল। এবং তার পশ্চাৎদেশ দিয়ে রিঙ পাকানো ধোঁয়া বেরুতে লাগল। অসহায় বাঘিনী স্পষ্টই বুঝতে পারল মৃত্যু অবধারিত।

স্বভাবতঃই একটা গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল সম্মেসনকক্ষ।

টেনিদা আবার মুখর হলেন। বাঘিনীকে আমার পা চাটতে দেখে বাঘটা ক্রমশঃ ঘাবড়ে গেল। জাল মুক্ত করে সেও পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে বাঘিনীর পাশে

দাঁড়াল এবং আমার আর একটি পা চাটতে শুরু করল। বাঘিনী ততোক্ষণে রীতিমত কাবু। তার নাড়িভুঁড়ি বোধহয় অর্ধেক পুড়ে গিয়েছে। ফেলু সবই লক্ষ্য করছিল তাড়াতাড়ি নেমে এসে বাঘিনীর কান ধরল। আর আমি বাঘের কানটা ধরে টানতে টানতে রওনা দিলাম বনবিভাগেরর সদর দপ্তরের উদ্দেশে।

যে বাঘিনী সারা মালয় উপদ্বীপ কাঁপিয়ে তুলেছিল, তাদের কান ধরে টেনে আনতে দেখে হাজারে হাজারে মানুষ এসে ভীড় করতে শুরু করল পথের দুই ধারে। বাড়ীর বারান্ডা, ছাদ, জানলা ইত্যাদি থেকে মালার পর মালা এসে পড়তে লাগল, আমাদের দু'জনের গলায়। শেষ পর্যন্ত ফুলের আড়াল থেকে চোখ বার করে পথ হাঁটাই দায় হয়ে উঠল।

টেনিদা এক মুহূর্ত থামলেন। সরকার ঘোষিত পুরস্কার তো পেলামই, তাছাড়াও ঝুড়ি ঝুড়ি পুরস্কার। মাদুর কার্পেট থেকে শুরু করে মটর গাড়ী পর্যন্ত। তিন তিনখানা বোয়িং লেগেছিল সেগুলো স্বদেশের মাটিতে বয়ে আনতে--বলে টেনিদা হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন। আর সেই হাসির ফাঁকেই বললেন বাঘ শিকার করতে গিয়ে বাঘের কান ধরে টেনে নিয়ে আসা জেনে রাখো বিশ্বের শিকারের ইতিহাসে এই প্রথম এবং সম্ভবত এই শেষ।

বিস্ময়ের রেশ মুছতে না মুছতেই কুনাল সরব হল। বললে, আপনার জামার বোতাম চারটে কি ওই পুরস্কারেরই অংশবিশেষ?

টেনিদা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বললেন, কী দেখে বুঝলে?

কুনাল তৈরীই ছিল। বললে, বোতামগুলো বাঁশের তৈরী বলে মনে হচ্ছে। এখানে কোথাও এই রকমের বোতাম চোখে পড়ে না।

রাইট ইউ আর। টেনিদা দুহাত সমানে কচলাতে কচলাতে বললেন, তাহলে আমার মালয় যাওয়া কোনও অলীক ঘটনা নয়, এ থেকে এটাই কি প্রমাণিত হল না!

'হয়েছে-হয়েছে' ধ্বনিতে সম্মেলনকক্ষ মুখর হয়ে উঠল।

লম্বুদা টেবিল চাপড়ে 'অর্ডার অর্ডার' বলে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এত হৈহুল্লোড়! স্বভাবতঃই তার রেশ সহজে যাবার নয়।

লম্বুদা বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর সম্মেলনকক্ষ নীরব হতে, তিনি মুখর হলেন। বললেন, আজকের এই শিকার কাহিনীর আসরে তোমাদের প্রিয় টেনিদা বাঘ শিকারের গল্প শোনালেন।

এজন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এবার তোমাদের সামনে আসছেন দি গ্রেট ঘনাদা। ঘনাদার পরিচয় আশা করি তোমাদের জানানোর প্রয়োজন নেই।

সভার তরফ থেকে আমি তাঁর জীবনের স্মরণীয় শিকার কাহিনীটি তোমাদের শোনানোর জন্য তাঁকে আহ্বান করছি।

ঘনাদা প্রথম সারিতেই বসেছিলেন। তাঁর নাম বলা মাত্রই তিনি দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশে হাত তুললেন।

ঘনাদাকে দেখার কৌতূহলে রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেল শ্রোতাদের মধ্যে। তাঁকে স্বচক্ষে দেখার এমন সৌভাগ্য থেকে কেউই নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইল না।

অবশ্য ঘনাদা দাঁড়িয়ে উঠতেই মোটামুটি সে উত্তেজনা নিরসন হল।

তিনি চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের গপ্পের সম্মেলন সম্ভবতঃ এই প্রথম। আর কোথাও হয়েছে বলে তো জানা নেই।

আর এই সম্মেলনে আমাকে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ, শুধু আমার কাছেই নয়, সারা পশ্চিম বাংলা তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরব!

যাহোক কথা বাড়িয়ে আমি অযথা সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নই। শুরু করে দিই কি বলেন।

তিনি জামার হাতা ফোল্ড করতে করতে বললেন, সে অনেকদিন আগেকার কথা। একদিন বন্ধুবাবন্ধবেরা মিলে ঠিক করলাম—দক্ষিণ ভারতটা দেখা দরকার। দর্শনীয় শিল্পকলা নাকি সব দক্ষিণ ভারতেই আছে।

প্রথমে স্থির হল ট্রেনেই যাওয়া হবে। যেমন সকলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত পালটে গেল। ট্রেনে গেলে ইচ্ছেমত ঘোরাফেরা করা যায় না। সেটা বাসেই তাবৎ সুবিধে।

বাস রিজার্ভ করে গেলে সুবিধে অনেক। ইচ্ছেমত দর্শনীয় স্থানগুলোও দেখা যাবে। তাছাড়া মাঝপথে খাওয়া-থাকার সুবিধে আছে।

তখন গাড়ীঘোড়ার এত ব্যাপক প্রচলন ছিল না। যারা গাড়ী ভাড়া খাটাতো, এ খবর তাদের কানে পৌঁছোবার মাত্রই ছুটে আসত যাত্রী ধরার জন্য। এবং দর কষাকষির মাধ্যমেই ভাড়াটা স্থির হত। খেয়াল খুশীমত ভাড়া চাওয়ার সুযোগ ছিল না।

আমাদের এই ভ্রমণ সংক্রান্ত খবর যথারীতি তাদের কানে পৌঁছতেই এক টুরিস্ট বাসের মালিক এসে ধরে বসল তার বাসটি ভাড়া নেয়ার জন্য। ভদ্রলোক সবে গাড়ী কিনেছে। ঝকঝকে নতুন বাস। পথে বিগড়োবার সম্ভাবনা খুবই কম।

গাড়ীর নম্বরটা এখনও আমার স্মরণে আছে। সম্ভবতঃ ডব্লুউ বি ২৪৯। তোমরা ইচ্ছে করলে কার রেজিস্টার অফিসে খোঁজ করেও দেখে নিতে পার। তবে মালিকের নাম জিজ্ঞাসা কর না। স্মরণে নেই।

ঘনাদা মুচকি হাসলেন। এক মুহূর্ত নীরব থেকে, হঠাৎ আবার সরব হলেন।

যথারীতি দিন গড়িয়ে এল। আমরা ত্রিশজন বন্ধুবান্ধব মিলে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরোলাম। তখনকার দিনে এ ধরনের বিলাস-ভ্রমণ রীতিমত হৈচৈ ব্যাপার! রাস্তায় ভীড় জমে গেল আমাদের দেখতে। হ্যাঁ, প্রসঙ্গত আমি যে কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি, তখন আমি বিষ্ণুদার আখরায় একটু আধটু ব্যায়াম চর্চা করি। প্রশস্তিকাও দু'একটি জুটেছে কপালে।

আমার ইস্পাতের মত শরীরের গঠনের জন্য তখন আমি মি: স্টীলম্যান নামেই জনসাধরণের কাছে পরিচিত।

প্রায়ই এখানে সেখানে মঞ্চে উঠে দৈহিক তাগদ দেখাতে হয়। আঙ্গুলের টোকা মেরে নারকেল ভাঙ্গি, হাতের তালুতে চাপ দিয়ে সরষের তেল বার করি। ঘুঁষি মেরে দেওয়ালে পেরেক পুঁতি। আস্ত সুপারী দাঁতে ভাঙ্গি। এমন কত কি!

যাহোক, যাত্রা শুরু হল রাতের অন্ধকারে। আমাদের বাস হু হু করে ছুটে চলেছে জি-টি রোড ধরে।

আমাদের এই ভ্রমণপর্ব খুশিমুখর করে তোলার জন্য, আমরা বাসের মধ্যেই সতরঞ্চি পেতে একটা গানের জলসা বসালাম।

সেখানে গান গাইবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কেউ বাংলা, কেউ হিন্দী, কেউ আবার ইংরেজী। আর তার সঙ্গে মোবাইল ডিসকো ড্যান্স।

সে এক হৈ হৈ কাণ্ড! কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা খুব উপভোগ্য হয়ে উঠল। পথের মধ্যে অনেক পথচারী আমাদের এই চলমান জলসা দেখে চমকে উঠল। আমাদের কোন কিছুই গ্রাহ্যে নেই। আমরা দুর্বার গতিতেই এগিয়ে চলেছি।

ঘনাদা একটু থেমে বোধ হয় দম সঞ্চয় করলেন। তারপর যথারীতি গলা ঝেড়ে বললেন, খড়গপুরের কাছাকাছি পৌছেচি, হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

উফ্! ঘনাদা চুপ করে গেলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল। এই মুহূর্তে তাঁর নীরবতা কারুরই মনঃপূত নয় সেটা জানানো হল তাঁকে।

ঘনাদা নিজেও বোধহয় সেটা অনুভব করলেন। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কোনও রকম আবেদন আসার আগেই তিনি বললেন, আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম কাছাকাছি একটা জলসা হচ্ছিল।

কিন্তু যে সমস্ত নামীদামী শিল্পীদের সেখানে অংশগ্রহণের কথা ছিল তারা অনির্দিষ্ট কারণে হাজির হতে না পারায় তুমুল হট্টগোল হচ্ছিল প্যান্ডেলের মধ্যে। শ্রোতারা টিকিটের দাম ফেরত চাইছিল উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে।

ইত্যবসরে চলমান বাসের ভিতরে আমাদের গান শুনে, ওরা বায়না ধরে বসল, আমাদের মঞ্চে বসান হবে। ওরা আমাদেরই গান শ্রোতাদের শোনাবে।

এই প্রস্তাব নিতে উদ্যোক্তাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাদের পাকড়াও করার জন্য জীপ নিয়ে অনুসরণ করল।

রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একটা জীপ গাড়ীকে আমাদের ফলো করতে দেখে প্রথমে আমাদের ডাকাতই মনে হয়েছিল। কারণ ডাকাত ছাড়া আর কারাই বা এতরাতে আমাদের পেছন নিতে যাবে?

তাই আমরাও দ্রুতবেগে বাস চালাতে লাগলাম।

কিন্তু রাস্তা ক্রসিং-এ রেড সিগন্যাল দেখে যেই আমরা থেমে পড়লাম, ও এসে থেমে গেল আমাদের গাড়ীর পাশে।

কর্মকর্তারা সদলবলে নেমে এল জীপ থেকে। তাদের হাতে বজরাই গো ফুলের মালা।

ডাকাতের হাতে ফুলের মালা দেখে আমরা তো হতবাক্। এমন ঘটনা গ কখন পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

ওরা আমাদের ঘাবড়ে যেতে দেখে বললে, ডোন্ট মাইন্ড আমরা ডাকাত ফ্রেন্ড। আমাদের জলসায় আপনারা একবারটি চলুন। ফাংশনে আর্টিস্টরা কথা দি আসেন নি। শ্রোতারা তো আমাদের পিঠের চামড়া তুলে নিতে চাইছে। এক আপনারাই এখন আমাদের ভরসা। বলব আপনারাই বোম্বে থেকে এসেছেন। আ কিছু উচ্চবাচ্য করার আগে ওরা হঠাৎ ঝপ্ ঝপ্ করে আমাদের গলায় মালা ঝু দিল!

কি কাণ্ড, আমরা সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউই শুরু করি। আমি বল কী আর হবে। ওরা যখন এত করেই ধরেছে চল ওদের পিঠের চামড়া বাঁ দিয়ে আসি। তবে বোম্বের আর্টিস্ট সাজায় আমাদেরও যথেষ্ট ঝুঁকি রইল।

ভবিষ্যত পরিণতির কথা চিন্তা করলেও হ্যাঁ বা না কেউ কিছু বলল ন

বাসের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হল।

অনুষ্ঠানে পৌছতে বিশেষ সময় লাগল না।

বাস গিয়ে প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়াতেই সে কি হৈ চৈ। উদ্যোক্তারা মাইক্রো দখল করে ঘোষণা করলে, আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পূর্ব নির্ধা শিল্পীর পরিবর্তে আর একদল বিখ্যাত শিল্পীকে আপনাদের সামনে হাজির ক এদের জনপ্রিয়তা এখন আকাশ ছুঁই ছুঁই।

আশা করি এঁরা আপনাদের মনের ক্ষোভ মেটাতে সমর্থ হবেন।

ঘোষক তো তাঁর কাজ সারলেন, কিন্তু—

না অহেতুক ভয় পেয়ে লাভ নেই। আমরা সদলবলে গিয়ে মঞ্চদখল কর শুরু করলাম রুনা লায়লার 'সাধের লাউ বানাইলা' দিয়ে।

তারপর পর পর সাতখানা হিট সঙ উইথ ডিসকো ডান্স।

বাজীমাৎ। দশ মিনিট ননস্টপ হাততালি পড়ল। হাততালির শব্দে কানে প্রায় তালা লাগার যোগাড়, হঠাৎ উদ্যোক্তারা ছুটে এসে বললে, শ্রোতারা আপনা নাচ গান শুনে মুগ্ধ।

বাকী রাতটুকু তারা আপনাদেরই নাচ গান উপভোগ করতে চায়। কাই

আপনারা চলে যাবেন না। চালিয়ে যান—

কি সব্বনেশে কথা। দিন এবং সময়ানুসারে হোটেল ঘর বুক করা হয়েছে। এখন না পৌঁছান মানেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করা। পরে যে আবার সেখানে জায়গা পাবই এমন কি গ্যারান্টি আছে!

আমাদের চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল। আমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার অছিলায় বেরিয়ে, বাসে চড়ে দে হাওয়া—

আমরা কিছুপথে এগোবার পরেই লক্ষ্য করলাম সার্চলাইট জ্বালিয়ে একটা গাড়ী হু হু করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

আমাদের বুকের মধ্যে গুরু গুর করে উঠল। তবে কি—

ড্রাইভারকে বললাম, টপ স্পীড দাও।

দিলও সে। কিন্তু অনুসরণকারীরাও নাছোড়বান্দা।

প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত আমাদের হার মানতে হল। ওরা এগিয়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ালো আমাদের। টর্চ জ্বলে উঠল পর পর।

পু-লি-স!

কনস্টেবলটি গাড়ী থেকে নেমে, আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, আমরা খবর পেয়েছি আপনারা ডাকাতি করে পালাচ্ছেন। আপনাদের গাড়ী সার্চ করব।

ডা-কা-তি! বলে কি! আমাদের তো প্রায় এভারেস্টের চুড়ো থেকে গনিয়ে মাটিতে পড়ার যোগাড়।

ইতিমধ্যে পুলিস তাদের তদারকি কাজ শুরু করে দিয়েছে।

বৃথাই হল তাদের চেষ্টা। কিছু খাদ্যদ্রব্য আর শিকারের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই বেরুল না।

শেষমেষ তারা হতাশই হল।

নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে তাদের কিছু আলাপ হল। হঠাৎ একজন বললে, গাড়ীর নম্বরটা ঠিকমত দেখেছিস তো?

নম্বর জানার পর কিন্তু তাদের মৌখিক অভিব্যক্তিই পালটিয়ে গেল। যে নম্বরের গাড়ীর সন্ধানে তারা হানা দিয়েছে, সেই নম্বরের গাড়ী এটা নয়।

নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে, সঙ্গে সঙ্গে তারা করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল আমাদের কাছে।

আমরা খুশীই হলাম। কিন্তু তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য নয়—আমরা আর কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়লাম না বলেই।

ওরা আর কালবিলম্ব না করেই, গাড়ীতে চেপে সরে পড়ল।

ঘড়িতে তখন রাত দুটো।

দুশ্চিন্তা কাটার সঙ্গে সঙ্গে এবার চোখ জুড়ে ঘুম এল। আমরা চোখ বুজিয়ে বসে রইলাম।

*　　　　*　　　　*　　　　*

যথারীতি বাস চলেছে। আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী নামছি উঠছি কোথাও দু-এক রাত কাটাচ্ছিও।

এইভাবেই আমরা হায়দ্রাবাদের কাছাকাছি পৌঁছেচি। সেখানে একটা হোটেলও আমাদের ঠিক করা ছিল যে কারণে থাকা খাওয়ার কোনই অসুবিধা হল না।

খেয়ে দেয়ে হোটেলে বসে আমরা গুলতানি করছি। শুনলাম হোটেল থেকে নর্মদার দূরত্ব বেশী নয়।

শুনে তো রক্ত নেচে উঠল। ভাবলাম চাঁদনি রাতে একটু নদীর ধারে বেড়ালে মন্দ হয় না।

আমার সদিচ্ছার কথা ম্যানেজারের কাছে প্রকাশ করতেই তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, না—না মশাই, নদীর ধার ঝোপঝাড় ভর্তি। কিছু একটা ঘটে গেলে তখন আর আফসোসের অন্ত থাকবে না। তাওপর পুলিসের ঝামেলা।

ম্যানেজারের নিষেধ শুনে কেমন যেন জিদ চেপে গেল। বললাম, বিপদ ছাড়া জীবন আবার জীবন নাকি? সে তো মাঠে ময়দানে স্ট্যাচুর সামিল। আমার মন টেনেছে যখন আমি যাবই।

গেলামও—বলে ঘনাদা চুপ করে রইলেন।

কতক্ষণ যে এই নীরবতা চলবে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। অল্পবিস্তর সবারই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

তবে তাঁকে বিশ্রাম দেবার প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারল না। যে কারণে অধৈর্য হওয়া সত্ত্বেও মুখে কিছু প্রকাশ না করে সবাই উসখুস করতে শুরু করল।

মিনিটের কাঁটা মাত্র পাঁচ পাক ঘুরতেই ঘনাদা সরব হলেন। বললেন নানা অজুহাতে বেশীর ভাগ সঙ্গীই কেটে পড়ল। দু'জন রাজী হল বটে কিন্তু পুরো পথ নয়।

আমার তাতে কোনই আপত্তি ছিল না। না গেলে যখন ক্ষতি নেই, গেলে ডবল লাভ ছাড়া আর কি।

তাছাড়া কিছুটা পথের নিঃসঙ্গতাও তো ঘুচবে।

শেষ পর্যন্ত তিনজন বেরুল আমার সঙ্গে। দু'ধারে অজস্র নারকেল গাছের বুক চিরে একটা সর্পিল পথ চলে গিয়েছে নদী বরাবর।

শহরেই আমরা মানুষ। নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে চাঁদ দেখতে কার না ার ভালো লাগবে।

পথে দু'চার কলি গানও হল। মুডের ব্যাপার কখনও কখনও না চাইতেও আসে।

অনতিদূরেই দেখা যাচ্ছিল সাদা কাপড়ের মতো বহে যাওয়া নদীটাকে।

ওরা তিনজনে এগিয়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম পেছনে।

হঠাৎ পেঁচা জাতীয় কোনও এক পক্ষীর কুৎসিত ডাক কানে আসতেই ওরা মকে দাঁড়িয়ে বলল, নো মোর। লেট আস গো ব্যাক।

ওদেরর আটকাবার যে চেষ্টা না করলাম তা নয়। কিন্তু ওরা আমার কথায় র্ণপাত করল না। ফিরে আসায় ওরা বদ্ধপরিকর।

ছেড়ে দিলাম। এত ভীতু লোক সঙ্গে থাকার চেয়ে না থাকাটাই মঙ্গলজনক। কেবল বলে দিলাম ফিরতে যদি কোনও কারণে বিলম্ব হয় ভাবিস না।

ভালো লাগলে কিছুক্ষণ সেখানে থেকেও যেতে পারি।

ওরা ঘাড় নেড়ে সরে পড়ল।

আমি একাই এগুতে লাগলাম। এতক্ষণ ওরা সঙ্গে থাকাতে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এখন একটা হয়ে চোখ ভরে সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা ফঁস্‌ফঁস্ শব্দ শুনে, সামনে তাকাতেই চক্ষু চড়কগাছ! খুব বেশী হলে তিন হাত দূর দিয়ে একটা সাপ সর্পিল অঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে এগিয়ে চলেছে।

হাতে কিছু একটা রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।

সামনেই অনেক ডালপালাওলা গাছ ছিল। তা থেকেই একটা মজবুত দেখে ডাল ভেঙ্গে নিলাম।

যাবার পথে সেটাই মাঝে মাঝে গাছে মেরে একটু সাহস সঞ্চয় করতে লাগলাম।

নর্মদা বইছে ধীর গতিতে। পাড়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

দূরের হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়ে একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে বটে তবে সেটা দাঁড়িয়ে আছে না চলছে ঠিক সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

হাত ডুবিয়ে এক আঁজলা জল তুলে নিলাম। মুখে দিতে বেশ মিষ্টিই লাগল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে হঠাৎ মনে হল এতখানি হেঁটে এলাম একটু বসাই যাক।

দূরে কে যেন বাঁশীতে ফুঁ দিল। ভারী মিষ্টি সেই বাঁশীর সুর। সম্ভবতঃ ওই নৌকাতে বসেই কে বাজাচ্ছে।

নির্জন নদীর ধারে ভালোই লাগছিল। সাথে নদীর স্রোতের কুল কুল শব্দ।

আমার ডানদিক ঘেঁষে একটা ঝোপ।

হঠাৎ—

হ্যাঁ, মনে হল ওই ঝোপের মধ্যে কে যেন খড় খড় করছে।

শুকনো পাতার ওপর পায়ে চলার শব্দ।

কীই বা হতে পারে, হাজার দুশ্চিন্তা এসে ভীড় করল মনের মধ্যে। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

এক-দুই-তিন—গুনছি মনে মনে।

চার গোনার আগেই বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড এক বাঘ!

বা-ঘ দেখে আঁৎকে উঠলাম। এ যে স্বপ্নাতীত।

ঘনাদা হাসতে লাগলেন হা-হা-হা করে।

এই কি হাসির সময়! কে যেন বক্রোক্তি করল ভীড়ের মধ্যে থেকে। স্বপন বলল, প্লীজ ঘনাদা, না হেসে বরং আমাদের গুলি করুন। আরও উপভোগ্য হবে।

ঘনাদা সে অনুরোধ উপলব্ধি করলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম—ভাববার একমুহূর্ত সময় নেই। কুইক ডিসিসান নিতেই হবে।

সুমুখে জলে ঝাঁপ মারা বা গাছে উঠে পড়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই।

তবে জলে ঝাঁপ মারা আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জলের নীচে কি আছে জানি না। বাঘের হাত থেকে বাঁচলেও হয়তো বা কুমীরের পেটে যেতে হবে।

কিন্তু গাছে উঠতে গেলেও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এই সময়টুকু যে সে আমাকে দেবেই তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ইতিমধ্যে বাঘটাও বিস্ময় কাটিয়ে কী যেন একটা বদমতলব আঁটছে মনে মনে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে একটা ধরালাম। আগুন দেখেও যদি বাঘটা একটু ঘাবড়ায়।

আগুন দেখে বাঘটা একটা বিকট ডাক ছাড়ল। তারপর হঠাৎ তিন পা পিছিয়ে গেল।

এই সুযোগটুকুও নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে গাছের ডালটা ধরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমার কাণ্ড দেখে বাঘটা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি সময় নষ্ট করিনি। দুর্গা নাম জপ করে প্রায় গাছে উঠে পড়েছি, হঠাৎ এক বিকট গর্জন করে দীর্ঘ এক লাফে আমার কাঁধের নিচেই কামড়ে ধরল বাঘটা।

সব্বনেশে কাণ্ড।

বাঘের দাঁতগুলো চেপে বসেছে আমার মাংসপেশীর মধ্যে। আর কিছু না ক—হাতখানা তো খসিয়ে নিয়ে যাবে দেহ থেকে। ডান হাত বলে কথা।

তাছাড়া একবার মাংসের স্বাদ পেলে বাঘটা কি আর সহজে ছেড়ে দেবে আমাকে। ন হয়তো পুরোপুরিই আমাকে গ্রাস করতে চাইবে।

আমার এই চিন্তার অবকাশে তার তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো যেন মাংস কেটে বিঁধতে গল।

আর নয়। শেষ অস্ত্র মাসেল কন্ট্রোলিং। চোদ্দ বছর বয়সে এই মাসেলের খেলা খিয়ে আমি মিঃ স্টীলম্যান হয়েছিলাম।

তার সবটুকু না থাকলেও কিছুটা আছে। কাঁধের মাসেল শক্ত করতেই বাঘের চোয়াল দুটো 'খটাস্' করে খুলে গেল।

দাঁত বসিয়ে কামড়ে ধরে থাকা আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। পরিণতি -ধপ্।

ঘনাদা হাসলেন।

মধু হঠাৎ বলে উঠল—'খটাস্'টা কি?

ঘনাদা একটু বিব্রত হলেও মুহূর্তের মধ্যে সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন।

বললেন, না বোঝার মতো কিছু নেই।

বাঘটা সর্বশক্তি দিয়েই আমার কাঁধটা কামড়ে ধরেছিল। কিন্তু মাসেল শক্ত রতেই ওর চোয়াল ফেটে ওই শব্দ হয়েছিল।

চোয়ালে ফাটল ধরাতে তার মাড়িতে আর সেই শক্তি ছিল না। সে কারণে— ।

এখনও দাগটা আছে বলে ঘনাদা জামার হাতাটা তুলে কি যেন দেখতে লাগলেন।

স্বপনের তর সইল না। বড় বড় পা ফেলে সে এগিয়ে গেল দাগ দেখতে। র দেখাদেখি আরও কয়েকজন গেল।

সবাই প্রায় একসাথেই ঝুঁকে পড়ল।

দাগ একটা রয়েছে ঠিকই, তবে সেটা বাঘের থাবা, না বেড়ালের থাবা—তফাৎ ঝোর কোনও উপায় নেই।

সকলে একে একে নিজ নিজ আসনে ফিরে গেল, ঘনাদা আবার মুখর হলেন। লেন, চোয়াল ভাঙ্গা বাঘ যতবাররই হা-লু-ম বলে ডাকতে গেল কোনবারেই 'টা বেরুল না।

'লু-ম' উচ্চারিত হল। রয়েল বেঙ্গলের পক্ষে সেটা কি কম লজ্জার।

রাগে শোকে দুঃখে তার চোখ দুটো টগরফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠল।

সে স্পষ্টই বুঝতে পারল কামড়ে খাবার ক্ষমতা এ জন্মের মতো তার গয়া।

ইঁদুর বেড়াল ভিন্ন আর বড় দরের কিছু কপালে জুটবে না। পা মুড়ে বসে সে কী যেন ভাবতে লাগল।

যতোই হোক বাঘ তো বটে। একটা আঁচড় দিলেও—

গাছ থেকে নেমে আমি পা টিপে টিপে বাসের দিকে রওনা দিলাম। দেখাদেখি সেও পা টিপে টিপে আমার পেছনে আসতে লাগল।

ইচ্ছে করে আমি একবার দৌড়বার ভান করতে সেও দৌড়তে শুরু করল।

এদিকে বাসের যাত্রীরা আমার পেছনে বাঘ দৌড়তে দেখে তারা তো প্রাণভয়ে চীৎকার জুড়ে দিল। এবং তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ে সবাই ইট ছুঁড়তে শুরু করল।

আমি তাদেরর বিরত হবার জন্য ইশারা করলেও তারা গ্রাহ্য করল না।

এদিকে বাঘটা বিপদ বুঝে আরও ঘনিষ্ট হয়ে এল।

সহযাত্রীদের আর কিছুতেই বোঝাতে পারি না এই বাঘ আর এখন বাঘ নেই। পোষা ছাগলেরও অধম।

এদিকে বাঘকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া কিছু কিছু ইঁটেরর টুকরো আমার গায়েও লাগছে।

প্রাণের দায়ে আমার একটা পা বাঘের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। বাস থেকে ওরা 'হায়-হায়' করে উঠল।

দু'একজন এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখে হাতঢাকা দিল।

এদিকে পা ঢোকাতে বাঘটা ভ্রমবশতঃ কামড় দিতে গেল। কিন্তু ফাটা চোয়ালে চোয়ালে ঠোকাঠুকি লাগতেই সে বিকট চীৎকার করে মুখ থেকে বার করে দিল আমার পাখানা।

পূর্বের মতোই জীব বার করে আমার পা চাটতে লাগল।

বাঘে পা চাটছে—এ দৃশ্য দেখে সকলে তো তাজ্জব। এমন ব্যাপার ঘটতে পারে কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না। দু'একজন তো আঙ্গুল দিয়ে বার বার চোখ রগড়াতে লাগল।

বাঘের মুখ থেকে পা টেনে নিয়ে বাসের দিকে এগোতেই, সবাই এসে উপুড় হয়ে পড়ল আমার পা-এর ওপর।

ইস্ সে এক বিড়ম্বনা।

ঘনাদা মুচকি হাসতে লাগলেন।

হাততালিতে সরব হয়ে উঠল সবাই। কে যেন পেছন থেকে 'আর একটা' 'আর একটা' বলে চীৎকার করে উঠল।

কিন্তু লম্বুদা সভাপতির চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এতক্ষণ যে শিকার কাহিনী তোমরা শুনলে সেটা যে তোমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে তাতে কোনই

সন্দেহ নেই।

অন্ততঃ তোমাদের অবিরাম করতালি সেই কথাই বলে।

এইমাত্র তোমাদের প্রিয়তম পিনডিদা এয়ারপোর্টে পৌঁছেছেন। এটা একটা সৌভাগ্যই বলতে হবে। কারণ আফ্রিকার জঙ্গল থেকে সামান্য একটা ঘরোয়া মিটিঙে যোগদানের জন্য এখানে ছুটে আসা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

পিনডিদার নাম ঘোষণা হওয়া মাত্রই একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল হলের মধ্যে। পিনডিদাকে বক্তৃতামঞ্চে বিশেষ দেখা যায় না। খুব কমই তিনি জনসমক্ষে আসেন। যে কারণে বক্তৃতামঞ্চে তাঁর নাম ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ঘাড় বাড়িয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগল। পিনডিদা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

জন ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি হাত তুলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রত্যুত্তরে অত্যুৎসাহী শ্রোতৃবৃন্দও হাত তুলল। পিনডিদা ধীরে ধীরেই মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলেন।

মঞ্চে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসল দখল করতেই একটা মৃদু করতালি ধ্বনিত হল কক্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। একজন বলে উঠল পিনডিদা সবাইকে টেক্কা দেওয়া চাই।

পিনডিদার কানে আবদারটা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুচকি হেসে তাকে বসার ইঙ্গিত করলেন। সে নীরবেই বসে পড়ল।

পিনডিদা ভাঁজ করা রুমালটা দুইগালে আর থুতনিতে বোলাতে বোলাতে বললেন, দি গ্রেট হান্টার জিম-এর নাম নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়। জিম আর আমি একসময়ে এক প্লেটে খেয়েছি এমনকি এক বিছানায় শুয়েছিও। বলতে গেলে আমাদের দুজনের মধ্যে একরকম হরিহর আত্মা ছিল।

তারপর জিম টপ শিকারী বনে গেল। আর আমি........। পিনডিদা খোলামনে হা-হা করে একমিনিট হাসলেন। যদিও হাসিটা একেবারেই নিরর্থক নয়।

*　　　　*　　　　*

আমার জন্মদিনটা আমি অনেক সময় ভুলে যাই কিন্তু জিম ভুলে না। সেবার আমার পঁচিশতম জন্মদিনে সকাল থেকেই পথ চেয়ে আছি। আর কেউ না আসুক জিম আসবেই। বিগত পঁচিশ বছরে সে একবারও অনুপস্থিত থাকেনি।

সকাল-বিকেল-সন্ধে উতরে যায় অথচ জিম-এর দেখা নেই। খুবই আশ্চর্য লাগছিল এমন ঘটনা তো ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। তবে কি অসুখ বিসুখ করল।

না রাত নটা নাগাদ জিম গাড়ী করে এসে হাজির। বললে, পন্ডী এক্সট্রিমলি

স্যরি। আজ তোমার জন্মদিন ভুলিনি। কিন্তু এমনই একটা দায়িত্ব চেপে গিয়েছে আসব-আসব করেও আসতে পাচ্ছিলাম না। অনেক দেরী হয়ে গেল।

যাহোক মেনু কার্ডে চিকেন-চাউ রেখেছ তো। কারণ ওটার লোভেই এই অসময়ে দৌড়ে আসা।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, একমিনিট ঘ্রাণ টেনে দেখ দেখি।

জিম আমার কথামতই চোখ বুজে ঘ্রাণ টানল। তারপর ওহ্ নাইস— নাইস বলে ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারের। এবং অভ্যাসমত পাইপ ধরাল।

ইতিমধ্যে উপস্থিত অতিথিরা প্রায় সকলেই একে একে চলে গিয়েছে। বাকী বলতে বাড়ীর ক'জন আর প্রিয় অতিথি জিম। জিম আমার বাড়ীতেও যথেষ্ট পরিচিত। বাড়ীর লোকেরাও জিমকে নিয়ে একই টেবিলে ডিনারে বসতে চায়। আমি কোনও আপত্তি করিনি।

প্রস্তাবটা শুনে জিমও খুশী। বন্দুক কাঁধে নিয়ে সে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। আত্মীয় স্বজনের সাথে একসাথে বসে তার ডিনার খাবার অবকাশ কোথায়। স্বভাবতই সে খুশী হল এই প্রস্তাবে।

ডিনার টেবিলে আমার পাশেই জিমের সীট। আশে পাশে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য একটাই। জিমের পাশে বসে ছবি তোলা।

ইতিমধ্যে টেবিলে যথারীতি সার্ভ শুরু হয়ে গেছে। খেতে খেতেই গল্প শুরু হয়ে গেল। জিমকে প্রশ্ন করলাম ব্যাপার কি বলত? এখন কী কাজে ব্যস্ত তুমি?

জিম মুরগীর ঠ্যাঙ চিবোতে চিবোতে বললে, আরে সে কথা আর বোলোনা। চম্পাবতে একজোড়া ব্যাঘ্র দম্পতী সম্প্রতি বন থেকে বেরিয়ে আশে পাশের গ্রামে ঢুকে পড়ে নির্বিচারে পশুপক্ষী মানুষ মেরে খাচ্ছে।

এমন ধূর্ত দুজনে বাঘা বাঘা শিকারীকেও ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে। শুধু তাইই নয় কামড়ে আঁচড়ে এমনভাবে ভয় দেখাচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও শিকারী সাহস না পায় সেখানে যেতে।

অথচ এই ব্যাঘ্র দম্পতীকে এখুনি খাঁচাবন্দী না করতে পারলে, গ্রামের লোকেরা আতঙ্কে শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। সরকারের পক্ষে প্রশাসনিক এই ব্যর্থতা সরকার কিছুতেই মানতে রাজী নয়। তাই তারা হন্যে হয়ে শিকারী খুঁজছে এবং পুরস্কার হিসাবে মোটা টাকা ঘোষণা করেছে।

খবরটা আমি যথাসময়ে পেয়েছিলাম বটে কিন্তু তেমন গ্রাহ্য করিনি। হঠাৎ ট্রাঙ্ককল এল ডি এস পি সুনীল প্রসাদের কাছ থেকে, রিসিভার তুলতেই তিনি বললেন, জিঙ্ক, একজোড়া বাঘ এখানে প্রলয় বাধিয়েছে। স্থানীয় শিকারীরা সকলেই কেটে পড়েছে। যারাও আছে তারা প্রায় আত্মগোপন করেই আছে। এবং হাবেভাবে

নিয়ে দিয়েছে, প্রাণের চেয়ে পয়সা বড় নয় ইত্যাদি। অতএব এখন আপনিই ষ ভরসা।

অনুগ্রহ করে একদিন সময় করে এখানে আসুন। এ-ব্যাপারে কিছু দরকারী কথা াছে। ডি এস পি-র গেস্ট বলে কথা। আদর যত্নে অস্থির। আমি যে চিকেন উয়ের ভক্ত তিনি জানতেন সে কথা। এর আগে অনেক অকেসানেই খাইয়েছেন। ভাবত লাঞ্চ টেবিলে চিকেন চাউয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য নাকি তিনি কলকাতা থেকে বাবুর্চিও আনিয়েছেন।

মুখে দিতেই খাবারের সত্যতা উপলব্ধি করলাম। খেতে খেতেই মি: প্রসাদ সঙ্গটা তুললেন। বললেন আপনার পুরো দায়িত্ব। আপনি নিজে মারুন বা অন্য কারুর সাহায্য নিন সেটা কোনও ব্যাপার নয়। তবে যেহেতু আপনি একজন রিনাউন্ড শিকারী তাই দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

নিলামও। উঠলাম সরকারী গেস্টফ্ল্যাটে। কুমায়ুনের অন্তর্গত চম্পাবতের একটা মানচিত্র দিয়ে উনি আমাকে বিপদসঙ্কুল এলাকাগুলো দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাঘ্র দম্পতীর চোখ এই গ্রামগুলোর ওপর। থাকে জঙ্গলে। খাল পেরিয়ে এসে তারা গ্রামবাসীদের ঘাড় মটকে মেরে খেয়ে পালিয়ে যায়।

কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। অসম্ভব ধূর্ত এরা দুজনে। প্রতিবারই নতুন নতুন ফন্দী এঁটে পালিয়ে যায়।

তাদের সেই সুচতুর ফন্দীর সাথে পাল্লা দেওয়া যাচ্ছে না।

জিম একমুহূর্ত নীরব হয়ে গিয়ে চোখ বুজিয়ে মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে লাগলেন। ঠ্যাংটা পুরোপুরি গলাধঃকরণ করে বললেন, শিকারে গেলে আমি অবশ্য সহজে সহযোগী নিইনা। সহযোগী থাকলে মনোযোগে বড্ড চির ধরে। আর সেই অন্যমনস্কতার ফাঁকে শিকার পালিয়ে যায়। ইতিপূর্বে গেছেও অনেক বলেই আমার এই সিদ্ধান্ত। তবে একা গেলাম না। সঙ্গে নিয়ে গেলাম দুটো নধরকান্তি ছাগল আর পঞ্চাশগজ দড়ি। টোপ ফেলার জন্য।

গেস্ট কোয়ার্টার থেকে প্রায় দশমাইল দূরে একটা অখ্যাত গ্রাম। এই গ্রামে ব্যাঘ্র দম্পতী কম করেও বার দশেক হানা দিয়েছে। এবং তিনজন চাষী সহ গোটা তিনেক গরুর ঘাড় মটকেছে।

এই গ্রামের উদ্দেশেই আমি যাত্রা করলাম। এখানে যে তাদের আবার দেখা মিলবেই সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

যে খাল পেরিয়ে বাঘ গ্রামে ঢোকে তার সংলগ্ন একটা আখের ক্ষেত। এই আখের ক্ষেতের মধ্যেই এসে বনবিবিরা প্রথম আত্মগোপন করে তারপর মধ্যরাতে বা ভোররাতে তারা বাড়ীতে আকস্মিক হানা দেয়।

অতএব ব্যাঘ্র দম্পতীকে ঘায়েল করতে গেলে দুর্গকে আমিও দুর্গ হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং আখের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এই আখের ক্ষেতের শেষপ্রান্ত বরাবর একটা পেয়ারা গাছ ছিল। ডালপালা বহুল এই পেয়ারা গাছটা আমার শিকারের উপযোগী আস্তানা বলেই মনে হল। এই গাছে মাচা গড়লে এখানে বসেই তাবৎ আখের ক্ষেতের ওপর নজর রাখা যাবে। অর্থাৎ ব্যাঘ্র দম্পতী এই আখের ক্ষেতে ঢুকলে গাছে বসেই সরাসরি গুলী করা যাবে।

তবে সঙ্গে আনা ছাগল দুটো কী ভাবে কাজে লাগানো যায় তাই নিয়েই ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিলাম।

আখের ক্ষেতের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে প্রায় মাঝ বরাবর জায়গায় একটা খুঁটি চোখে পড়ল। গরু ছাগল বেঁধে রাখার জনাই বোধহয় কেউ সেটা সেখানে পুঁতেছিল।

ভাবলাম মন্দকি। এটাকেই বাঘ শিকারের চার হিসাবে কাজে লাগানো যাক। ছাগলের গলায় দড়ি বাঁধাই ছিল। দড়ির খুঁটটা কেবল আমি সেই খুঁটির গায়ে জড়িয়ে দিলাম।

ব্যবস্থাদি করতে করতেই সূর্য পাটে গেল। আবছা আঁধার নামতে লাগল আখের ক্ষেত ঘিরে।

তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিয়ালের দৌরাত্মিও শুরু হয়ে গেল চতুর্দিকে। নীচে থাকা আর কোন প্রকারেই নিরাপদ নয়। এই সন্ধ্যের ঝোঁকেও তারা অনেক সময় বেরোয় গৃহে প্রত্যাবর্তনকারী পশুপক্ষীদের উদরস্থ করার লোভে। অতএব সাবধানের মার নেই। সেই প্রবাদবাক্য মেনে নিয়েই পিয়ারাগাছে উঠে পড়লাম। বন্দুক সামনেই রাখলাম। কখন যে তাঁরা আসবেন কিছুই জানা নেই। এসে পড়লে তখন আর খুঁজবার সময় কোথায়!

*   *   *

অনুমান মিলল না। প্রথম দু'প্রহর বসে বাঘের নাম স্মরণ করলাম বটে, কিন্তু বাঘতো দূরের কথা, একটা ফেউ ডাক পর্যন্ত কানে এল না। হতেই পারে। আমি এসেছি বলে কি বাঘ আসবে না। বাঘ যখন তখন আসবে। আমাকে সেই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।

পিয়ারাগাছ থেকে আমার বেঁধে রাখা ছাগলটার দূরত্ব কম করে একশো সওয়াশো গজের মতো হবে। এতদূর থেকে তার গতিবিধি কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

অগত্যা চোখে দূরবীক্ষণ লাগালাম। ছাগলটা পা মুড়ে বসে মনের আনন্দে

আখগাছ চিবুচ্ছে। এমন স্বাধীনভাবে খাবার সুযোগ তো বড় একটা ঘটে না।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে লাঞ্চ প্যাকেট বার করলাম। শিকারে গেলে এই লাঞ্চপ্যাকেট আমাকে সর্বদাই মজুত রাখতে হয়। আমি বাঘকে বন্দী করি এক কথা। কিন্তু বাঘেও তো আমাকে বন্দী করতে পারে। তখন আমায় কে খাওয়াবে? তখনকার জন্যই এই সাবধানতা। জিম আবার একখানা ফ্রাইতে কামড় বসাল।

সকলেই তখন খাওয়া ভুলে জিমের মুখের দিকে তাকিয়ে। স্বয়ং জিমের মুখ থেকে শিকারের কাহিনী শোনা কি কম ভাগ্যের কথা।

জিম ফ্রাইটা বেশ তারিফ করেই খেল। আর একটা প্লেট থেকে তুলে নিয়ে দুই আঙ্গুলে নাড়াতে নাচাতে বললে, নাঃ সারারাত নিষ্ফল কাটল। স্বভাবতই বসে বসে বেশ একটু ঝিমুনি এসে গেল। চোখের আর দোষকি। তারাও তো খানিক বিশ্রাম চায়।

ঠিক এইমুহূর্তে ছপাস ছপাস করে একটা শব্দ কানে ভেসে এল। অর্থাৎ কেউ যে খালের জল পেরোচ্ছে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

সজাগ হয়ে উঠলাম। আবছা অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে শব্দের গতি প্রকৃতি থেকে অন্ততঃ সেইরকমই মনে হচ্ছে। বাইনাকুলারটা চোখে লাগাবার অবকাশে হঠাৎ সেই শব্দটা আকস্মিক বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার সেই বরফের নিস্তব্ধতা।

ব্যাপারটা কী যে ঘটল কিছুই বুঝলাম না। তবে কি বাঘ নয়। অন্য কোনও জীবজন্তু। তারা এখানে আসবে কেন?

এই আখের ক্ষেতে এমন আকর্ষণ থাকতে পারে। চারপাশে চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমার ছাগলটার দিকে। ছাগলটার দু পাশে কারা যেন নড়াচড়া করছে। তবে আলোর অভাবে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না।

দূরবীক্ষণ চোখে লাগাতে, চক্ষু ছানাবড়া। দুটো তেজী বাঘ ছাগলটার লেজ আর মুড়ো ধরে নিঃশব্দে ছেঁড়াছেড়ি করছে।

দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। বাঘদুটো বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। কোনও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না।

কেবলমাত্র লক্ষ্যভেদের জন্য যে প্রস্তুতি। যেখানে মাচা বেঁধেছিলাম তার ওপরেই গাছের ডাল ধরে দাঁড়ালাম। না দাঁড়ালে ঠিক লক্ষ্যভেদ হয় না। বিশেষ করে আলোর অভাব থাকলে। এভরিথিং রেডী। শুধু ট্রিগারে আঙ্গুলের চাপ দিতে যা বাকি। হঠাৎ মনে হল ব্যাঘ্র দম্পতী মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। তার পর মুহূর্তেই হাত পা মেলে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

এমনভাবে শুয়ে পড়ল, ক্ষেতের জমির সাথে প্রায় মিশেই গেল বললেও অত্যুক্তি

হয় না। বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুঁড়লাম। গুলী লাগল না। কেবল গুলীর হাওয়াটা লাগল তাদের গায়ে। পড়লাম মহা বিপদে। বাঘের অস্তিত্ব বোঝাই যখন দায় তখন আর গুলী লাগাব কেমন করে এত দূর থেকে। অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু এমন ধূর্ত বাঘ মাথা তো তুললোই না। উপরন্তু পুরো ছাগলটা দুজনে উদরস্থ করে বুক হেঁটে হেঁটে আবছা অন্ধকারে কেটে পড়ল।

অর্থাৎ আমায় আর গুলী করার সুযোগই দিল না। মাঝখান থেকে বিশ কেজি ওজনের নধর ছাগলটা খেয়ে পালিয়ে গেল। চারে পেয়েও শিকার পালাতে ব্যর্থতার দুঃখে আমি আঙ্গুল কামড়াতে লাগলাম।

এই ব্যর্থতার দুঃখে আমার জিদ বেড়ে গেল। ভাবলাম ব্যাঘ্রদম্পতী একবার সফল হয়েছে যখন নিশ্চয়ই আবার আসবে। অতএব এই ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়া এখন আমার পক্ষে ঠিক নয়।

দেখতে দেখতে আরও তিনদিন কেটে গেল। ব্যাঘ্র দম্পতীর আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। পরের দিন ছিল রবিবার। অমাবস্যা।

সন্ধ্যা না হতে হতেই চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার ওপর চারপাশে গাছপালা থাকার জন্য অন্ধকারটা আরও বেশী ঘনীভূত হয়েছে। এমন কি আমার নির্দিষ্ট খুঁটিতে বাঁধা ছাগলটাও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

আমার টর্চটাও জ্বালাইনি। আলো দেখে যদি ব্যাঘ্র দম্পতি আমার উপস্থিতি ধরে পেরে যায় তাহলে আর এ ধারই মাড়াবে না।

কেবল কান খাড়া রেখেছি। ওঁরা এলে খাল পেরিয়েই আসবেন। আর খাল পেরিয়ে আসতে গেলে জল কেটে আসতেই হবে। চুপিচুপি আসা সম্ভব নয়।

প্রথম প্রহর কাটল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফুরফুরে হাওয়া লেগে একটু ঝিমুনি এল। জোছনা পক্ষ হলে কোনই অসুবিধে হয় না। চারদিক দেখতে দেখতে ভালো সময় কাটে। কিন্তু অন্ধকার পক্ষেই যত অসুবিধা।

জোনাকির চিকমিক ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কতক্ষণ আর তা দেখতে ভালো লাগে।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙ্গতে অবাক কাণ্ড।

যেখানে আমার ছাগলটা বাধা ছিল, সেখানে অন্ধকারে দুটো বাঘের চোখ জ্বলছে। তাহলে এসে গেছেন। আনন্দে বুকটা নেচে উঠল। অনুমান তাহলে মিলেছে।

এবার বাছাধনদের নিধন করার পালা। আগেরবার কায়দা করে ছাগল খেয়ে পালিয়েছে। এবার আর ছাড়ছি না। তাছাড়া বাজারে আমার একটা সুনাম আছে। এই সুনামটা বাঁচানোর দায় আমারই।

বন্দুক তুলে দিয়ে ওই জ্বলন্ত চক্ষু দুটোর মাঝ বরাবর তাক করলাম। আলোর অভাবে দেহের অন্যান্য অংশ যখন দেখাই যাচ্ছে না ধরে নিয়েছিলাম ওই দুই চোখের মাঝ বরাবর গুলী করলে গুলী কপালেই বিদীর্ণ হবে।

আর কপালে লাগলে সে যত বড় বাঘই হোক না কেন কাৎ হবেই।

অতএব। আর একমুহূর্ত দেরী নয়। ফা-য়া-র।

আগুনের ফুলকি কেটে গুলী ছুটল সোজা। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত চোখ দুটো নিভে গেল। ভাবলাম 'কাৎ' বলে জিম, মৃদু হাসলেন।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, না ইচ্ছা পূরণ হলো না। আবার সেই চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

তাহলে কি গুলী লাগেনি। আমার তো মাথায় হাত। এমন মিস ফায়ার তো আমি বড় একটা করি না। অন্ততঃ আমার অতীত গৌরব সেই কথাই বলে।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফায়ার। আবার আগুনের হলকা ঝরিয়ে গুলী ছুটল সেই চক্ষু দ্বয়ের মধ্যবর্তী কপাল লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিভে গেল। আবার অন্ধকার। ভাবলাম ঘুঘু বারে বারে কি আর ধান খেয়ে যেতে পারে। এবার বাছারা যাবে কোথায়। ধরা তাদের দিতেই হবে।

প্রায় পাঁচমিনিট চুপচাপ। কোনই সাড়াশব্দ নেই। এমনকি সেই চোখ দুটোও আর জ্বলছে না।

আমিও খানিকটা নিশ্চিন্ত। বাছাধনেরা তাহলে স্বর্গারোহণে গিয়েছে। মনে মনে বেশ খুশীই হয়ে উঠলাম। টর্চটা জ্বালব কিনা ভাবছি! অবাককাণ্ড সেই চক্ষু দুটো আবার জ্বলে উঠল।

এবং প্রায় পূর্বের মতোই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। গুলীর আঘাতের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

তাহলে এবারেও গুলী লাগেনি। কিন্তু আমার গুলী অন্ধকারে যাচ্ছে বলেই তার গমন পথটা পুরোপরিই আমার কাছে পরিষ্কার। দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী অঞ্চল লক্ষভেদ হওয়ার ব্যাপারে কোনই হেরফের হচ্ছে না। অথচ—।

হঠাৎ এক তাজ্জব কাণ্ড ঘটল। সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুটোর মধ্যবর্তী ব্যবধানটা ক্রমেই বাড়তে শুরু করল। পূর্বে যেখানে ছিল আট আঙ্গুল ; সেটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে আঠারো —আঠাশ—আটত্রিশ—। চোখ কি ইচ্ছেমত স্থান পরিবর্তন করতে পারে নাকি!

তাহলে কি ভূত দেখছি! কৌতূহল আর চাপতে পারলাম না। জ্বাললাম টর্চ। শিকারে দরকার নেই। এখন ভূতের পাল্লায় না পড়লে বাঁচি। টর্চ জ্বালতেই

অবাককাণ্ড। ছাগলটা হাওয়া। ব্যাঘ্র দম্পতী সেটা উদরস্থ করে হাঁটুগেড়ে পাশাপাশি বসে থাকলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য দেড়হাতের মত। তবে তারা যে পলায়নাদ্যত তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

টর্চ রেখে আবার বন্দুক তোলার অবকাশে তারা দুজনেই গা ঢাকা দিল। কেবলমাত্র বেচারী ছাগের কিছু দেহাবশিষ্ট সেখানে পড়ে আছে।

আবার কপালে করাঘাত করলাম। মুখের গ্রাস হাত ফসকে গেল দেখে। জিম নীরব হবার সাথে সাথে রিণ্টু প্রশ্ন করল,

কিন্তু চোখের ব্যবধানটা বাঘ কী ভাবে বাড়াল বললেন না তো?

জিম গোল গোল চোখ করে বললে, এই ব্যাঘ্র দম্পতী যে ভয়ঙ্কর ধূর্ত সেকথা আগেই বলেছি। আগের বার মাটিতে লেপটে শুয়ে গুলী বাঁচাল। এবার করল কি দুজনে পাশাপাশি হাঁটু-গেড়ে বসে একজন ডানচোখ আর একজন বাঁচোখ খুলে রাখল। এবং নিঃশব্দে ছাগ মাংস ধ্বংস করল।

আমি একটা বাঘ সন্দেহ করেই, দুই চক্ষুর মাঝামাঝি কপাল তাক করে গুলী ছুঁড়লাম।

গুলী গেছিলও ঠিক। তবে তাদের কপালে লাগল না। দুই বাঘের মাথার ফাঁক দিয়ে গুলী বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে আমি কিছুই টের পেলাম না। মাঝখান থেকে ওরা নিঃশব্দে ভোজ পর্বটা সেরে সরে পড়ল এই আর কি।

জিমের কথা শুনে সকলেই সকলের দিকে আড়চোখে তাকাল।

জিম হাসলেন। এখানেই শেষ নয়। এই ঘটনার পর আমার জিদ আর এক কাঠি বেড়ে গেল।

মনে মনে ভাবলাম না ফিরে যাব না। হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব। দেখি ওরা কতখানি ধূর্ত? ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখেনি—

জিম একমুহূর্ত থামলেন। হ্যাঁ, আবার প্রতীক্ষা শুরু হল। তবে ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। সেইদিনই আবার অতিথি দ্বয়ের আবির্ভাব হল ছাগ মাংসের লোভে। তবে এবার আর ছাগলের মাংস ভোজে না গিয়ে সরাসরি হাজির হল ওই পেয়ারা গাছ তলায়।

আমি যে পেয়ারা গাছের মাথায় আশ্রয় নিয়েছি সেটা তারা বুঝেই ফেলেছিল। এবার টার্গেট করল আমাকে।

এদিকে আমি গাছের মাথায় ওদেরই প্রতীক্ষায় বসে আছি। সাগ্রহে অপেক্ষা করছি ওদের স্বাগত জানানোর জন্য।

আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ ওরা নিল। বাঘিনীটা নীচে দাঁড়িয়ে রইল। বাঘটা নিঃশব্দে গাছের কাণ্ড বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

দুটো ডালের ফাঁক দিয়ে একটা পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম। বাঘটা আমার ওই পাটাই কামড়ে ধরার মতলব করেছিল।

বাঘের থাবা আর আমার পায়ের দূরত্ব যখন প্রায় হাতখানেকের মতো, হঠাৎ বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধটা এসে নাকে ঢুকল। চমকে উঠলাম। এই গাছের মাথা তো এখন আমার ঘরবাড়ী হয়ে গিয়েছে।। কই এই গন্ধতো ইতিপূর্বে আমার নাকে আসেনি। আসার কথাও নয়।

তাহলে এখন আসছে কোত্থেকে। অন্য কোনও জন্তুর গায়ে বাঘের গন্ধ আছে বলে তো কখনও শুনিনি।

টর্চ জ্বালতেই চমকে উঠলাম। থাবার ওপর নখগুলো চকচক করছে। এই থাবার চোটেই সে কত পশুপাখীর প্রাণনাশ করেছে।

পরমুহূর্তেই স্বয়ং মহাররাজের সঙ্গে চোখাচোখি। আগুনের ভাঁটার মতো তখন সে দুটো জ্বলছে।

বন্দুক তুলেই গুলী।

'ধপ' করে একটা ভারী শব্দ হল। বাঘটা যে পড়ে গেল তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

কিন্তু যা ধূর্ত, গুলী খেয়ে কবুল হল কিনা এখনই যাচাই করা দরকার। টর্চ জ্বাললাম। মাথায় হাত। দম্পতী হাওয়া—

তবে এক টুকরো লেজ রেখে গিয়েছে দুই ডালের ফাঁকে। তাড়াতাড়ি নেমে পালাতে গিয়ে লেজটা আটকে পড়েছিল সেখানে। ভাগ্যক্রমে আমার গুলীটা গিয়ে ওর লেজেই লাগে। গুলী লেগে লেজটা কেটে যায়।

ওর শাপে বর হয়। লেজ কেটে যেতে সে পড়ে মাটিতে। তারপর বাঘিনীর পিছু পিছু অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

এখন আমার মাথায় বজ্রাঘাত। মিঃ প্রসাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেব কি! বাঘ শিকার করতে করতে আমার আঙ্গুলের মাথায় কড়া পড়ে গিয়েছে। আর এই ব্যাঘ্র দম্পতী আমাকে কি না নাজেহাল করে ছাড়ল!

তা আমি বলছিলাম কি তুমি আমায় এব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পার কি। অনেক অসাধ্যসাধন করেছ তুমি। এটা তার তুলনায় কিছুই নয়। আজকেই তোমার ডিসিসানটা জানালে ভালো হয়।

আমি তাহলে রাতে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি এই আর কি!

জিম চিকেন চাউ চামচ করে তুলে মুখে ফেলল।

* *

ডিনার পর্ব শেষ।

জিম আর আমি বাইরের বারান্দায় বসে সিগারেট ধরিয়েছি। জিম বার বা আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ সে যে আমার মতামতটা জানতে চায় বুঝতে কোনই অসুবিধা হচ্ছে না।

আমিই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গলাম। বললাম, জিম, বেসিকালি তোমার একটা ভুলের জন্যই প্রখ্যাত বাঘশিকারী হয়েও এই বাঘ শিকার করতে পারলে না।

জিম সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, ভুলটা কি জানতে পারি?

আমি বললাম, অবশ্যই এই ব্যাঘ্র দম্পতী অসাধারণ ইনটেলিজেন্ট। অর্থাৎ প্রতিবারেই নতুন নতুন কৌশল করেই তোমার অব্যর্থ লক্ষভেদের হাত থেকে বেঁচে গেল। আমার মনে হয় এই ব্যাঘ্র দম্পতীর শিরঃচ্ছেদ করতে গেলে সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।

আমায় যদি তাদের মুণ্ড আনতে বল এই পথেই আনতে হবে।

জিম বললে, তাই কর। আমার কোনও আপত্তি নেই। জোড়া মুণ্ড পেলেই হল।

আমি বললাম, বেশ রাজী। আমায় যদি এই কাজ করতেই হয় দুটো ছাগমুণ্ড আর একটা শাবল এখুনি আনিয়ে দাও। আমি জোড়া মুণ্ডই তোমায় উপহার দেব। আর পারত পরের দিন একবার দেখা করো। মনে হয় জোড়া ছাগমুণ্ডের পরিবর্তে জোড়া বাঘের মুণ্ডই উপহার দিতে পারব। জিম 'ইজ ইট' বলে চোখ দুটো বড় বড় করে মুচকি হাসলেন।

পরের দিন সাতসকালেই কিটস ব্যাগে করে দুটি ছাগমুণ্ড আর একটা শাবল হাজির। জিম বাজার থেকে কিনে লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমি দুটো বন্দুক, একডজন কার্তুজ, কিছু ড্রাই ফুড আর মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য একশিশি ওডোমস নিয়ে চম্পাবত রওনা হলাম।

ওই আখক্ষেত খুঁজে বার করতে আমার খুব অসুবিধা হল না। জিম আমায় ছবি এঁকেই জায়গাটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। সেখানে পৌছতে কিছু টাঙ্গা ভাড়া লাগল মাত্র।

আখের ক্ষেতের ভিতর যেখানে ব্যাঘ্র দম্পতি দুটি ভোজ খেয়েছিল, সেখানে পৌছে জায়গাটা ভাল করে নিরীক্ষণ করলাম। যেমন কোনদিক দিয়ে তাঁদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা বেশী। কোথায় টোপ ফেলা যেতে পারে। বেকায়দায় পড়লে পালাবার পথ আছে কি না। অন্য কোনও হিংস্র জীবজন্তুর অস্তিত্ব আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো জানা থাকলে অনেক নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

সবকিছু খোঁজখবর করার পর ওখানেই ওই খুটির কাছাকাছি শাবলের সাহায্যে একটা গর্ত খুঁড়তে লেগে গেলাম।

তা একমানুষ সমান গর্ত। মুখের কথা নয়। খুঁড়তে খুঁড়তেই সূর্য অস্ত গেল।

অগত্যা প্রস্তুতিপর্ব তড়িঘড়ি করতে হল। আঁধার নেমে গেলে আর একেবারেই নিরাপদ নয়। দুটি বন্দুকেই কার্তুজ ভরলাম। আমি সর্বাঙ্গে ওডোমস বুলিয়ে নেমে পড়লাম ওই গর্তের মধ্যে। গর্ত বরাবর আমি ঢুকে যাওয়ার ফলে বাইরে থেকে আমাকে দেখা যাওয়ার কোনই সম্ভাবনা রইল না।

সান্ধ্যকালীন আহার সেরে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম নরখাদক সেই ব্যাঘ্র দম্পতীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

*     *     *

জোছনা পক্ষ। আলোর খই ফুটছে চতুর্দিকে। সেখানে থাকতে যে একটু অসুবিধা না হচ্ছে তা নয়। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের স্বার্থে কষ্টটা গায়েই লাগছে না।

রাত তখন দশটা হবে। মাঝে মাঝেই টর্চ জ্বেলে ঘড়ী দেখছি। ঘড়ীর টিক টিক শব্দটা পর্যন্ত কানে আসছে। হঠাৎ খস-খস করে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটার একটা শব্দ হল। যদিও চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—

হাতের দুটো আঙ্গুল দুই বন্দুকের ট্রিগার স্পর্শ করল।

ওই পদশব্দ গর্তের মুখ বরাবর এসেই থেমে গেল। বুকের মধ্যে খুশীর তুফান। এত সহজে বনবিবির সাক্ষাৎ পাওয়াতো ভাগ্যের ব্যাপার। ছাগ মুণ্ড দেখে তাদের গরগরানি শুরু হল। পরমুহূর্তেই তারা দুজনে কামড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গেই চাপদিলাম ট্রিগারে। কেঁপে উঠল বন্দুক দুটো। বন্দুকের গর্জনের সাথে সাথেই কেল্লা ফতে। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে দেখি মুণ্ডহীন ব্যাঘ্র দম্পতীর নিঃসাড় দেহ সেখানে পড়ে আছে।

বিচ্ছিন্ন মুণ্ড দুটি কুড়িয়ে এনে কিটস্ ব্যাগে ভরে নিয়ে ফিরে এলাম। পরের দিন জিমের হাতে সে ব্যাগ তুলে দিতে সে তো বিস্ময়ে হতবাক। যেন আকস্মিক বোবা হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললে, আনপ্যারালাল!

পিনডিদা মুচকি হেসে চারদিকে তাকালেন।

সরোজ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আপনি আনপ্যারালাল আনডাউটেডলি। কিন্তু আপনার কৌশলটা যদি একটু এক্সপ্লেন করেন খুব ভালো হয়।

পিনডিদা ঘাড় নাড়লেন। বেশ, বলছি শোন। বন্দুকের নলের মুখে ছাগমুণ্ড দুটো লাগিয়ে গর্তের বাইরে রেখেছিলাম ব্যাঘ্র দম্পতীকে প্রলোভিত করার জন্য।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম ওরা আস্তছাগল ভেবেই কামড় বসাবে। আর বসালোও। সাড়া পেতেই আমি ট্রিগার টিপলাম।

বন্দুকের নল ওদের মুখের মধ্যে। গুলী বেরিয়ে ওদের মুণ্ড দুটোকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। পড়ে রইল ওদের নিঃসাড় দেহ।

আমি গর্ত থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। জানি একশো গজের বেশী দূরে যাবে না। কারণ বন্দুকের গুলীর রেঞ্জ একশো গজ।

অতএব গুলীতে মুণ্ডু উড়িয়ে নিয়ে গেলেও একশো গজ দূরেই পড়বে। তাই পড়েছিল। শুধু কুড়িয়ে আনাতেই যা পরিশ্রম।

এসব একেবারে অঙ্কে ছকা বলে পিনডিদা হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন। আর সেই তালে তালে হাততালি পড়তে লাগল।

লম্বুদা দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত তুলে সকলকে নীরব হবার আবেদন জানালেন। মোটামুটি কোলাহল থামতে লম্বুদা মৃদু হেসে বললেন অনুষ্ঠান সূচীর শেষ বক্তা স্বয়ং আমি। ওরফে শ্রীশ্রী লম্বমান দত্ত। ওরফে তোমাদের একান্ত প্রিয় লম্বুদা।

সভাপতি হিসাবে লম্বুদা নিজের নাম ঘোষণা করা মাত্রই সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল!

প্রায় তিনচতুর্থাংশ শ্রোতা লম্বুদাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠে তালে তালে করতালি দিতে লাগল।

লম্বুদা হাতজোড় করে সকলের দিকে ঘুরে ঘুরে তাঁর প্রতি এই অকৃপণ ভালোবাসা গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু এ জন্য কোনও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হল না তার চোখে মুখে। আনন্দের স্রোত বইল সম্মেলনকক্ষে।

স্বপন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মধুরেণ সমাপয়েৎই আমাদের সকলের কাম্য। আশা করি আপনার অভিজ্ঞতাটি আরও উপভোগ্য এবং স্মরণীয় হবে।

লম্বুদা আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন মাত্র। বিড় বিড় করে বললেন সারা জীবন তো খালি বাঘই মারলাম। অভিজ্ঞতারও অভাব নেই। এখন কোন্‌টা বলব সেটাই ভাবছি।

লম্বুদার এই মন্তব্যে একটা চমক আছড়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। তাঁর কথা শুনে যদি কারুর মনে ধারণা হয় তিনি তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে শ'খানেক বাঘ মেরেছেন তাতেও অবাক হবার মতো কিছু নেই। কিন্তু আমরা যারা তাঁকে চিনি তিনি আদৌ জ্যান্ত বাঘ দেখেছেন কি না সে ব্যাপারেও প্রায় বুক ফুলিয়েই বাজি ধরতে পারি।

স্বপন আবার মুখর হল। বললে আপনার গল্প বাছাবাছির প্রয়োজন নেই। আপনি এখন যা বলবেন তাই সুপার্ব। কবিগুরুতো কয়েক হাজার কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কেবলমাত্র গীতাঞ্জলি রচনার জন্য।

আপনি যদি কখনও নোবেল প্রাইজ পান, একটা প্রাইজ দিয়ে আপনার মূল্যায়ন করা যাবে না। দিলে বার কয়েক দিতে হবে। যে দৃষ্টান্ত অন্তত নোবেল প্রাইজের ইতিহাসে বিরল।

নোবেল প্রাইজের নামে বার কয়েক ঢোক গিলে লম্বুদা কি যেন বলতে চাইলেন। ঠোট দুটো তাঁর মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলেও, কোনও শব্দ উচ্চারিত হল না। তিনি একটু অপ্রস্তুত হতে আমি সে প্রসঙ্গ মুলতুবী রেখে একটা উষ্ণতম ব্যাঘ্র শিকারের গল্প বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম।

লম্বুদা 'হুম' বলে মুখে একটা শব্দ করলেন এবং তর্জনিটা নাকের ডগায়-স্পর্শ করলেন।

গ্রামাফোনে রেকর্ড ঘুরতে শুরু করার পর, পিন স্পর্শ করলে যেমন আমরা গান শোনার জন্য সজাগ হয়ে উঠি, লম্বুদার এই নাকের ডগায় তর্জনি সংযোজন তেমনি লম্বুদা মুখর হবার সঙ্কেত দিল।

আমরা তাই অযথা কথা না বাড়িয়ে, সাগ্রহে সেই শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে উঠলাম।

লম্বুদা ফস্ করে লাইটার জ্বেলে একটা চুরুট ধরালেন। মুখের মাংসপেশীগুলো টান টান করে হঠাৎ খুব ছোট্ট করে একটা ধোঁয়ার রিঙ ছাড়লেন ঘরের কড়ি বরগা লক্ষ্য করে।

রিঙটা এতই ছোট সেটা ওই ভারী বায়ুস্তর ভেদ করে কড়ি ছুঁতে পারবে কিনা সে বিষয়ে ক্রমশঃ সন্দেহ জাগল।

ছোট বড় সকলেই কৌতূহলবশতঃ ওপর দিকে তাকিয়ে রইল।

রিঙের অস্তিত্ব নিয়ে যখন সকলেই সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান, হঠাৎ লম্বুদা হা-হা করে হেসে উঠলেন। বাই দি বাই সালটা আমার তেমন স্পষ্ট মনে নেই। তবে বয়েসটা মনে আছে। আঠারো ঠাটারো হবে। সবেমাত্র এন্ট্রান্স পাস করে বেরিয়েছি।

অবশ্য তখনই দেশবাসী আমায় চিনে ফেলেছে। সব বিষয়ে একশোয় একশো —যা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে না।

খালি পুরস্কার আসতে লাগল। এই স্মৃতি পদক ওই স্মৃতি পদক তো আছেই, তাছাড়াও নগদ মূল্যের উপহারের ছড়াছড়ি। হাজার হাজার টাকা। অত কাঁচা টাকা কোথায় রাখি। শেষপর্যন্ত বাবা ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিলেন। অত টাকা ঘরে রাখা কোনক্রমেই নিরাপদ নয়।

ক্রমশঃ টাকার পাহাড় হয়ে গেল ব্যাঙ্কে। আয়করের নোটিশে যখন বিব্রত, আমারই এক বন্ধু চাঁদনি রাতে সুন্দরবনের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে এক লোভনীয় প্রস্তাব করল আমার কাছে।

সুন্দরবন আমার কাছে অপরিচিত না হলেও রাতে সুন্দরবন দেখার সৌভাগ্য তখনও আমার ঘটেনি। তাছানা মেজাজটাও খুব খুশী থাকার জন্য সুযোগটা সাথে

সাথেই লুফে নিলাম।

মোট সতেরো জন যাত্রী। আমি বাদে ষোলজন। বয়স কারুরই কুড়ি পেরোয়নি। যে কারণে এই লঞ্চ জার্নিটা  শুরু থেকেই বেশ জমে উঠল।

যথাসময়ে লঞ্চ ছাড়তে ডান্স শুরু হল লঞ্চের সঙ্কীর্ণ ডেকে। তখন অবশ্য ব্রেক মেক চালু হয়নি। তাছাড়াও স্বদেশী আন্দোলনের হাওয়ায় ইংরেজী কালচার তখন ঘরে ঘরে বর্জিত।

আমরা তাই পাঞ্জাবের সেরা ভাঙরা নাচের আসর বসালাম সেখানে।

প্রথমে আমার বন্ধু দলুই শুরু করল। দলুর বাবা পাঞ্জাবে ছিল দীর্ঘকাল। সেই সূত্রেই তার ভাঙরা নাচের সাথে পরিচয়।

দলু শুরু করল বটে কিন্তু নাচের টেকনিকটা শিখে নিতে অন্যদের বিশেষ সময় লাগল না।

ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় সকলেরই দেহ অল্পবিস্তর নাচের ছন্দে আন্দোলিত হতে লাগল।

পাইলট কিন্তু আমাদের এই উচ্ছ্বাস দেখে একটুও খুশী হল না। বেশ রেগে গিয়েই বললে, এভাবে আপনারা নাচানাচি শুরু করলে লঞ্চ উলটে আমাদের পাতালে পৌঁছতে বিশেষ সময় লাগবে না।

যারা সাঁতার জানত না পাইলটের কথা শুনে তো মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। এবং নাচ থামিয়ে দর্শক সেজে গেল।

তাদের দেখাদেখি সকলেই ক্রমশঃ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল একমাত্র আমি ছাড়া। লম্বুদা হাসলেন।

আমি তো জলের পোকা। সাঁতরে সমুদ্র পার হয়েছি আর এত কোন ছার! লম্বুদা সগর্বে সকলের মুখের ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে কার মনে কি প্রতিক্রিয়া হল সেটাই লক্ষ্য করা তাঁর উদ্দেশ্য।

অবশ্য নদীর নাম বা অতিক্রম করার তারিখটা জিজ্ঞাসা করলে কি ফল হত সেটা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল।

এজন্যই তিনি বিশেষ সময় নিলেন না। পরমুহূর্তেই বললেন, নদীর ধার ঘেঁষে এগুচ্ছি। যদিও ধার ঘেঁষে যাওয়াটা নীতি বিরুদ্ধ।

পাশেই সজনে খালির জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে ক্ষীণ বাঘের গর্জন ভেসে আসছে।

যা শুনে অনেকেরই বুকে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। হাত পা ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, অনবরত সেই গর্জন শুনে শুনে এমন অবস্থা হল, লঞ্চের

আকস্মিক ভোঁ শব্দও তাদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

তাদের আশঙ্কা বাঘ যখন সাঁতারে পটু, ভোঁ শুনে এগিয়ে এসে লঞ্চে উঠতে আর কতক্ষণ? হাসি পেলেও তাদের বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অসম্ভব সম্ভব হতে আর কতক্ষণ লাগে!

হৈ হুল্লোড় ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়তে বাঘের গর্জন ঘনঘন শুরু হল।

ওদিকে কিচেনে তখন কড়ায় কাটলেট উঠেছে। কাটলেটের সরস গন্ধে ম-ম করছে নদীবক্ষ।

হঠাৎ সুভাষ একটা দারুন প্রস্তাব করে বসল। বেশ চীৎকার করে বললে, এখন কেউ যদি লঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে জঙ্গলে পাঁচ মিনিট কাটিয়ে আসতে পারে তাকে আমার ভাগের গোটা কাটলেটখানাই পুরস্কার দিয়ে দেব।

কথাটা যে সকলেরই কানে পৌঁছল সেটা সকলের ছানাবড়া চক্ষু দেখেই বোঝা গেল।

সকলে ইসারায় মনোভাব চালাচালি করলেও, তপন আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

বেশ গম্ভীর হয়েই বললে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। একখানা কাটলেটের জন্য শুধু শুধু বাঘের পেটে যেতে যাব কেন?

প্রাণে বেঁচে থাকলে আপসেই কাটলেট আসবে ভুরি ভরি। সেজন্য এত তাড়াহুড়া করার কি আছে।

সুভাষ বোধ হয় এতটা ভেবে মন্তব্যটা করেনি। স্বভাবতঃই আলোচনার মোড় ঘুরে যেতে দেখে সে একটু বিব্রত বোধ করল। যেটা আমার চক্ষু এড়াল না।

ঝিমিয়ে পড়া আমেজটা পুনরায়জাগ্রত করার উদ্দেশে আকস্মিক আমি হঠাৎই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করে বসলাম। বললাম বাজির কাটলেট যেন গরম খোলাতেই ছাড়া থাকে।

আমি বাঘ-এর সাথে মোলাকাৎ করে এসেই ওখানা খেতে চাই।

শুনে বাকী ষোলজনই হৈ হৈ করে উঠল। মধু ফুটকি কেটে বললে, শোকসভাটা তাহলে লঞ্চেই ব্যবস্থা করি—কি বলেন!

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল লঞ্চের মধ্যে।

আমি বললাম, দোস্ত হাসির কি আছে। তোমরা কাপুরুষ বলে কি জগৎসুদ্ধ লোক কাপুরুষ হবে?

কথাটা বোধহয় ওর গায়ে বিঁধল। বললে, মেনে নিলাম আমরা কাপুরুষের দল, এখন দেখাও দেখি তোমার সাহসের দৌড় কত—

আমার রক্ত ততক্ষণে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। বললাম, লঞ্চ তীরে

ভিড়াও। আমি বাজি ধরলাম।

পাইলট এতক্ষণ সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে লঞ্চ চালনা করছিল।

আকস্মিক আঘাটায় লঞ্চ ভেড়াবার প্রস্তাব তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই সে স্প্রিংয়ের পুতুলের মত লাফিয়ে উঠল। বললে, নদীর ঠাণ্ডা জল তুলে মাথায় দিন। আমার মনে হয় আপনার মাথার স্ক্রুগুলো হিটে আলগা হয়ে গিয়েছে।

তার কথা শুনে সবাই আমার দিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল পাইলটের ভীতি প্রদর্শনে বুঝিবা আমার পেন্টুলুন খুলে যাবে।

কিন্তু আমি যে সে বান্দা নই সেটা বোধ হয় তার জানা ছিল না।

এগিয়ে গিয়ে আমি স্টিয়ারিং ধরে লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। লঞ্চ হিসিং হিসিং শব্দ করতে করতে পাড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

যথারীতি লঞ্চ ভিড়ল তীরেতে। সঙ্গীদের সকলেরই মুখ গম্ভীর। সত্যি সত্যিই এমন একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যে আমি পা বাড়াতে পারি কেউই তা আঁচ করতে পারেনি।

লঞ্চও ভিড়ল তীরে আর সাথে সাথেই ভেসে এল বাঘের গর্জন।

ওরা তো আমার হাত টেনে ধরল। বললে, লম্বু যাসনি। এখনও সময় আছে ভেবে দেখ।

ওদের করুণ আবেদন আমি সহাস্যেই প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম বন্ধু ভয় কী বস্তু আমি চিনি না।

কিছু কিছু গল্পে শুনেছি বটে, কিন্তু সেটা গল্পের উপাদান বলেই ধরে রেখেছি। সেটাই তো সত্যিকার জীবনের স্বাদ।

গল্প যদি কারও জীবনে সত্যি হয় হোক। তাতে আপত্তি কি?

কথাগুলো তাদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে হনহনিয়ে ঢুকে গেলাম বনের ভেতর। 'হায়-হায়' একটা শব্দ কানের পাশ দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

কয়েক পা এগুতেই বিপত্তি। একটা বড়সড় গোখরো সাপ সড়সড়িয়ে আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল।

আমি লাফিয়ে উঠে পেছন দিকে তাকাতেই ওদের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। ওরা ব্যাপারটা আঁচ করেই ইসারা করল আবার ফিরে আসার জন্য।

না, আর পেছনে তাকানো নয়। পাঁচ মিনিট জঙ্গলে এক চক্করেই কেটে যাবে।

চলেছি। দু'চারটে হরিণও চোখে পড়ল। আপন মনে তারা খেলা করছে গাছের তলায়।

আমার পায়ের সাড়া পেতেই তারা চোঁ-চোঁ দৌড়।

আমি খুব সাবধানেই এগুচ্ছি। খালি হাতে বাঘের রাজ্যে ঢোকা—

মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপের খোঁচা লাগছে জামা প্যাণ্টে। জামার হাতাটা একটু ছিঁড়েও গেল।

একবার পেছন ফিরে তাকালাম। লঞ্চটা গাছের আড়ালে পড়ে গিয়েছে। ওদের মুখ আর চোখে পড়ছে না।

ইতিমধ্যে তিনমিনিট কেটে গিয়েছে। আর মাত্র দু'মিনিট। কিছুই না। আমি বরং দশমিনিট থেকে দেখিয়ে দেব—আমার ক্ষমতা কতখানি।

উলুখাগড়ার বন অবধি যাওয়াই আমার লক্ষ্য ছিল। গেলামও! কিন্তু যার জন্য এত আশঙ্কা তিনিই স্বয়ং উপস্থিত সেখানে।

আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই সে গ-র্-র্-র্ করে গর্জন করে লেজ নাড়তে লাগল।

বিপদের জন্য মনে মনে আমি তৈরী থাকলেও হঠাৎ এমন সামনা-সামনি বাঘের মুখে পড়ে যাব স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

কিভাবে তার মোকাবিলা করব সঙ্গে সঙ্গে আমি স্থির করে ফেললাম।

বাঘট যে প্রচণ্ড ধূর্ত বুঝলাম তার পা টিপে পা টিপে এগুনো দেখে। তার মতিগতি পরীক্ষার জন্য আমি একবার দ্রুত দৌড়বার ভান করতেই, সেও তার গতি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করল।

অর্থাৎ বড় বড় পা ফেলতে লাগল।

তারপর হঠাৎ! লম্বুদা নীরব হয়ে পরম নিশ্চিন্তে ধূমপান করতে শুরু করলেন।

বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন নীরস রসিকতা কারুরই ভাল লাগল না। অথচ তাঁকে যে একটু বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন আছে এটাও কেউ অস্বীকার করতে পারল না।

সাময়িকভাবে একটা নীররবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরের মধ্যে। লম্বুদা চোখ বুজিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন।

ধৈর্য পরীক্ষা যেমন শুরু হয়েছিল হঠাৎ, তেমনি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল।

কেউ কিছু মুখ ফুটে বলার আগেই লম্বুদা পুনরায় সরব হয়ে উঠলেন।

বুঝলে সেকি দৌড়। আমি যে স্পীডে দৌড়ই বাঘটাও সেই স্পীডে দৌড়বার চেষ্টা করে। সে কি সাংঘাতিক দৌড় প্রতিযোগিতা!

অবশ্য—লম্বুদা গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসলেন। পারবে কেন, আমি তো ওলিম্পিক ফেরৎ। সে তো নয়!

কিন্তু দুটো সুযোগ সে বেশী পেল। এক বয়সের পার্থক্য। সে তো সবে কৈশোর

অতিক্রম করেছে—আরি আমি একযুগ আগে।

দ্বিতীয়তঃ আমার মসৃণ মাঠে দৌড়ানো অভ্যেস। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তো নয়। কিন্তু সে তো এতেই অভ্যস্ত।

যে কারণে গতিতে সে ক্রমশঃই আমার নিকটতর হতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ব্যবধান রইল লঞ্চ পর্যন্ত ফিরে আসার পথে বিশেষ কোনও দুশ্চিন্তা রইল না।

পূর্ব পরিকল্পনা মতোই আমি দৌড়ে এবার নদীর দিকে বাঁক নিলাম।

কিন্তু তখন আর এক কাণ্ড ঘটল।

সহযাত্রীরা উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিল আমার অপেক্ষায়। হঠাৎ আমাকে ওই প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগারটা তাড়া করেছে দেখে ওরা লঞ্চ আর তীরেতে ভিড়িয়ে রাখা নিরাপদ মনে করল না।

তাদের ষোল জনের জীবন-মূল্যের কথা ভেবে তারা লঞ্চ চালিয়ে নিয়ে বেশকিছু ব্যবধানে চলে গেল।

এদিকে বাঘটাও বোধহয় আমার মতলব কিছুটা বুঝে ফেলে আরও মরিয়া হয়ে উঠল।

এবার আমি আকস্মিক দৌড়ানো বন্ধ করে একটা দীর্ঘ লাফ মারলাম। বাঘটাও হারবার পাত্র নয়। সেও মারল লাফ।

আমার লম্ফনের দৈর্ঘ্য আমি জানি। গুনে গুনে তেরো হাত আর বাঘটা লাফালো বারো হাত।

একহাত কম আমার থেকে।

বাঘের কাছ থেকে আমি মাত্র একহাত দূরে—বুঝতেই পারছ তখন আমার মনের অবস্থা কি?

ওদিকে লঞ্চের ওপর ওরা সকলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। আমার এমন শোচনীয় পরিণতিটা কেউই চোখ খুলে দেখতে চায় না।

দু'একজন আবার মাথাও চাপড়াচ্ছে—আমার এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

আমার তখন ঘাবড়াবারও সময় নেই। কারণ বাঘের গরম নিঃশ্বাস মাঝে মাঝে আমার পিঠে রীতিমত ছ্যাঁকা মারছে।

হঠাৎ নদীর তীরে চোখ পড়তেই যে দৃশ্য দেখলাম তা ভুলবার নয়। আমি বলেই স্টেডি রইলাম। অন্য কেউ হলে নির্ঘাত ভিরমি যেত।

একটা প্রকাণ্ড কুমীর জলের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে হাঁ করে আছে ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীরের ছবিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। এখন আমার কী করণীয়? ঘাবড়াবার ছেলে আমি নই।



এক সেকেণ্ডের মধ্যেই পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

বাঘটা যে এবার লাফিয়ে আমার ঘাড় মটকাবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। গ-র্-র্ একটা গর্জনের শব্দও এসে অনবরত কানে আছড়ে পড়ছে। আমি এতক্ষণ বাঘের দিকে পেছন ফিরে ছিলাম। হঠাৎ ঘুরে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

আমাদের ব্যবধান বড় জোর পাঁচ থেকে আট হাত। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে দাঁত খিচিয়ে থাবা মেরে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

থাবার জোর বুজলাম মাটি তোলার পরিমাণ দেখে। সে ইচ্ছে করলে বোধহয় এক একদিনে এক একটা কূপ খনন করতে পারে।

ওই থাবা আমার ঘাড়, কাঁধ বা দেহের অন্য কোথাও মারলে, তার কি পরিণতি হবে সে কথা অতএব সহজেই অনুমেয়।

তবে অন্য কেউ হলে এই মুহূর্তে পেন্টুলুন হলদে হয়ে যেত। নেহাৎ আমি বলেই—

বাঘটাও অবশ্য আমার মতলবটা ঠিকমত আঁচ করতে না পেরে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

সে আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছিল আমার মুখের দিকে। অর্থাৎ আমি কোনও রকম অস্ত্রশস্ত্র বার করি কিনা সেটার প্রতিই বোধহয় সে লক্ষ্য রাখছিল।

দেখতে দেখতে পাঁচ সেকেন্ড কেটে গেল।

আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই বাঘ যে আমাকে আক্রমণ করবে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

অন্ততঃ আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা সেই রকমই আভাস দিল।

এখন আমিও প্রস্তুত।

হুম্, যা ভেবেছি তাই। বাঘ লাফ মারল একেবারে আমার মাথা টার্গেট করে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বডি থ্রো দিয়ে গোলকিপারের ভঙ্গীমায় দু'হাতে বাঘটাকে ফিস্ট করে শুনে তুলে দিলাম।

কাম ফতে। ব্যাঘ্র বাবাজীবন বিশ হাতের মত শূন্যে উঠে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল।

লম্বুদা একমিনিট থামলেন। সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার মুখর হলেন।

বাঘ কিন্তু শূন্যে পাক খেতে খেতে কোনও বদ মতলব ভাঁজছিল। ভেবেছিল ওপর থেকে সরাসরি আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আমাকে কড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু আমি যে এনট্রান্স পরীক্ষায় ম্যাথামেটিক্সে লেটার পাওয়া ছাত্র সেটা বোধহয় তার জানা ছিল না। জ্যামিতিক গঠনভিত্তিক এমন এক ভড়কি দিলাম তাকে, সে আমার ঘাড়ের বদলে পড়ল গিয়ে সেই কুমীরের মুখে।

ওই প্রকাণ্ড কুমীরটার হাঁয়ের মধ্যে পড়ে বাঘটা হঠাৎই স্থির হয়ে গেল। আর পরমুহূর্তেই খটাং খট্ করে একটা শব্দ হল। চেয়ে দেখি বাঘের ওই বিরাট মাথা

খানা কুমীরের দাঁতের ফাঁকে আটকে গিয়েছে!

বাঘটাকে এমন অসহায় অবস্থায় পড়তে দেখে আমারই কেমন মজা লাগল। ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কটা গোঁফ আছে দেখে নিলাম। তারপর পটপট করে সেগুলো ছিঁড়ে নিলাম।

সতেজ গোঁফগুলো ছিঁড়তে বাঘটা তো চটে লাল। কিন্তু করার কিছুই নেই। কারণ তার মাথাটা তখন কুমীর চিবিয়ে মাখন করে তুলেছে!

ইতিমধ্যে বাঘটা ডাকবারও চেষ্টা করল কয়েকবার।

কিন্তু সে শব্দ বিড়ালের ডাকেরই মতো শোনাল। কয়েক মিনিট পরে আবার একবার বাঘটা ডেকে উঠল বটে, তবে বাইরে থেকে নয়, কুমীরের পেটের ভেতর থেকে।

ব্যস্ তার পরেই সব ঠাণ্ডা।

লম্বুদা হঠাৎ হাতের তালু নাকে স্পর্শ করে শুঁকতে শুরু করলেন।

বাঘের মৃত্যুর সঙ্গে লম্বুদার হাতেরর তালুর কি সম্বন্ধ থাকতে পারে এই নিয়ে যখন আমরা সকলেই অল্পবিস্তর চিন্তিত, লম্বুদা মুচকি হাসলেন। একখানার বদলে সাত সাতখানা কাটলেট ঝপাঝপ পড়ল এসে হাতেতে। আমার এই কৃতিত্বে সকলেই আমাকে কিছু না কিছু পুরস্কার দিতে চায়। আর তার জন্যই এই সাতখানা কাটলেট!

ভালোবাসা কখনও প্রত্যাখ্যান করতে নেই। সকলকে খুশী করার জন্য সাতখানা কাটলেটে এক সাথে কামড় বসালাম। যাতে কেউ কিছু বলতে না পা-রে।

অনেকদিন আগেকার কথা। পেট ভরেছিল কি না খেয়াল নেই, তবে সাতখানা সেই গরম কাটলেটের গন্ধটা এখনও লেগে আছে হাতে। নাকে দিলেই আমি সে গন্ধ পা-ই।

তোমরা ইচ্ছা করলেও শুঁকতে পার বলে তিনি তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে।

আমরা ঢোক গিয়ে বললাম, জয়গুরু!

---

# লম্বুদার পাল্লায় ভূত



কদিন ধরেই নিদারুণ শৈত্য প্রবাহ চলছিল শহরের ওপর দিয়ে।

ঠাণ্ডায় যখন লোকের দাঁত কপাটি লাগার যোগাড় ঠিক সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেই একদিন জমিয়ে আড্ডা বসেছে আমাদের সুনির্দিষ্ট ক্লাব ঘরেতে।

প্রাত্যহিক কাজে কম্মে সেদিন কারুরই বিশেষ মন নেই। অল্প বিস্তর কাজে ফাঁকি দেবার মনোবাসনা নিয়েই সকলে হাজির হয়েছে সেখানে।

আমাদের এই ক্লাবের আজীবন সভ্য বলে যারা পরিচিত যথা অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে। একমাত্র আসেননি এই আড্ডার চূড়ামণি, দর্জিপাড়ার দত্ত বাড়ীর বিশ্ববিশ্রুত বংশধর শ্রীশ্রীলম্বমান দত্ত ওরফে আমাদের পরম প্রিয় লম্বুদা।

আমরা যতদূর জানি লম্বুদা কাল পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে ছিলেন না। অন্ততঃ সেরকম খবরই ছিল আমাদের কাছে।

বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে-কে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দেওয়ার জন্যই নাকি তিনি উগান্ডায় গিয়েছেন। আজ ভোরের ফ্লাইটেই তাঁর ফেরার কতা।

যদি এসে পৌঁছান, আজকের এই মধুচক্রে তিনি যে হাজিরা দেবেনই সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই।

আমরা অন্ততঃ সেই বিশ্বাসটুকু তাঁর ওপর রাখি।

আমাদের আড্ডা যেদিনই বসে, শুরুতেই সেদিনের চায়ের সঙ্গে টা-টা কি হবে সে নিয়ে কিছুক্ষণ হৈ-হট্টগোল চলে। সভ্যদের বেশীরভাগেরই পকেট গড়ের মাঠ হওয়ার দরুন তারা যতোটা গর্জায় ততোটা বর্ষায় না।

প্রতিবারই দশবিশ পয়সা মাথা পিছু চাঁদা তুলে এই ইচ্ছা পূরণ করতে হয়। অবশ্য লম্বুদা উপস্থিত থাকলেই একমাত্র এই রেওয়াজের ব্যতিক্রম ঘটে। খুশী মনেই তিনি পাঁচ-দশ টাকা পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর রাখেন। মুচকি হেসে বলেন, খালি পেটে কি আর আড্ডা জমে!

সেদিন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন লম্বুদার আবির্ভাব ঘটল না অগত্যা সভ্যদের কাছেই যথারীতি এ ব্যাপারে আবেদন রাখা হল।

সঙ্গে সঙ্গেই 'খোঁজ' রব উঠল পকেটে। বেশ কিছু 'পাঁচ-দশ' পয়সা জমা হল টেবিলে।

ঠাণ্ডার বাজার বলেই হয়তো মেনু নিয়ে তেমন কোনও ঝামেলা হল না। সিঙ্গাড়া

সহযোগে গরম চা-কেই ভোটে ফেলা হল এবং সর্বসম্মতিক্রমেই তা গৃহীত হল।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল আড্ডার অন্যতম সদস্য বাস্তবের ওপর। সে তৈরীই ছিল। টেবিল থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে তখনি দৌড়াল স্থানীয় শর্মাজীর খাবারের দোকানে। গরম গরম ফুলকপির সিঙ্গাড়ার সন্ধানে। ফুলকপির সিঙ্গাড়ায় শর্মাজীর দোকানের প্রচণ্ড সুনাম।

যথাসময়েই বাস্তব ফিরে এল সিঙ্গাড়ার ঠোঙা হাতে নিয়ে।

সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা টেবিলের প্রশস্ত বক্ষ স্পর্শ করামাত্রই আড়াই ডজন চক্ষু নিবদ্ধ হল তার ওপর। কেউ কেউ আবার আবেগ সামলাতে না পেরে মুখে নানারকম শব্দও করে ফেলল। কেউ আবার চোখ বুজিয়ে ঘ্রাণ নিতে লাগল। প্রবাদে বলে, ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম!

সিঙ্গাড়া কিভাবে ভাগ বাটরা হবে এই চিন্তায় যখন অল্প বিস্তর সকলেই বিভোর, হঠাৎ ইন্দ্রজিৎ একটা কাণ্ড করে বসল।

সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে না পেরে ঠোঙার ফাঁক দিয়ে একটা সিঙ্গাড়া টেনে নিল এবং মুখে পুরে কামড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে মুখরিত হ'য়ে উঠল ক্লাবরুম। সিঙ্গাড়ার উষ্ণতার গভীরতা সে ঠিক অনুমান করতে পারেনি বলেই এই দুর্ভোগ।

তার এই অসহায় অবস্থা দেখে অল্প বিস্তর সকলে বিব্রত বোধ করলেও তাকে সাহায্য করার মতো কিছুই ছিল না। কারণ সিঙ্গাড়াটি ইতিমধ্যেই তার দাঁতের ফাঁকে চেপে বসেছিল। কেউ কেউ এটাকে তার অধৈর্যতার উপযুক্ত শাস্তি ভেবেই মুচকি হাসতে লাগল।

'উঃ' 'আঃ' 'উস্' 'বাপরে-মারে' ইত্যাদি নানান অস্বস্তি সূচক ধ্বনির মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে সিঙ্গাড়াটিকে রপ্ত করতে, আমরা সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং নিজের নিজের ভাগে মনোনিবেশ করলাম।

সত্যিই শর্মাজীর সিঙ্গাড়ার তুলনা নেই। এর চরিত্রই আলাদা।

সংখ্যা সীমিত বলেই সকলে পাখীর মতো ঠুকরে ঠুকরে খেতে শুরু করে দিল।

নীরবতা ভঙ্গ করল প্রথম বিমল। রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বললে, আমি কি একটা প্রস্তাব করতে পারি? খেতে খেতেই আমরা সকলে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লাম।

বিমল পরম উৎসাহেই বলল, আজকের এই ঠাণ্ডার বাজারে আমাদের আড্ডার আলোচ্য বিষয়বস্তু পাল্টানো হোক। আমার মনে হয় আজ এই মুহূর্তে যদি আমরা ভূতের গল্পের আসর বসাই খুবই উপভোগ্য হবে।

এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত। এখন হাউস যা বলবে—

বিমল নীরব হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে হৈ হৈ করে উঠল। কমল বললে, বিমলের সঙ্গে আমিও একমত। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডাও যেরকম বাড়ছে, একমাত্র ভূতের গল্পই আমাদের দেহ মনের উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব আর একমুহূর্ত বিলম্ব না করে এখনই একখানা জমাটি ভূতের গল্প শুরু করা হোক।

ইন্দ্রজিৎ গম্ভীর হয়ে বললে, প্লীজ ওয়েট টিল টি কামস্!

সিঙ্গাড়া পর্ব শেষ হবার প্রায় দশমিনিট পরে কালী কেবিনের কেষ্টা ছোঁড়াটা এসে হাজির হল মাটির ভাঁড় আর কেটলি হাতে নিয়ে।

চায়ের ভাঁড়ে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে কমল বলল, প্রস্তাব তো সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হল, এখন বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে শুনি?

কমলের প্রশ্ন শুনে সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সকলের কৌতূহল নিবৃত্ত করে অমল হাত তুলে বললে, অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমিই প্রথম শুরু করছি। কেমন—

অমল স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে আমরা সকলে নিশ্চিন্ত মনেই চা পানে মনোনিবেশ করলাম।

চা-পর্ব পুরোপুরি মেটবার পূর্বেই অমল সরব হল। রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বলল, তা প্রায় আট দশ বছর আগেকার কথা। আমরা তখন মছলন্দপুরে থাকি।

এখন সেখানে প্রচুর ঘর বাড়ী হয়েছে। চেহারা প্রায় পুরোই পালটে গিয়েছে বললে চলে।

তখন কিন্তু এত ঘরবাড়ী তৈরী হয়নি। চারদিকে ছিল ফাঁকা মাঠ আর ধেনো জমি। বাসিন্দাও প্রায় আঙ্গুলে গোনা যেত। চাকরি বাকরি বিশেষ কেউই করত না। সকলেরই অল্প বিস্তর জমিজমা ছিল। সেখানে চাষবাস করেই সকলের সারাবছরের খোরাকি উঠে যেত।

দিল্লীতে আমার বড় মাসী থাকত।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বড় মাসীর বড় ছেলে রন্টু বেড়াতে এল আমাদের গ্রামে। রন্টু ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ ডানপিটে প্রকৃতির। তাছাড়া দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার ফলে দেশের জিনিষ বা দেশীয় লোকেদের ওপর তার বিন্দুমাত্র টান ছিল না। সর্বদাই সে নাক সিঁটকে থাকত।

আমাদের গ্রামে এসেও সে তার সেই মনোভাব পালটাতে পারল না। বিভিন্ন ব্যাপারে সে প্রায়ই আমাকে 'গ্রাম্য' বা 'গেঁয়ো' বলে অপদস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল যেটা আমার কাছে অস্বস্তিকর ঠেকলেও মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারলাম

না। নিতান্ত সৌজন্য বোধের খাতিরেই নীরবে সে অপমান সহ্য করতে লাগলাম।

একদিন দু'জনে মিলে গ্রামে একটা চক্কর মারতে বেরিয়েছি। রন্টু বলল, সব রকম গাছই অল্প বিস্তর দেখলাম। কিন্তু ধান গাছ দেখা হল না। তোদের এখানে তো চারদিকেই ধানক্ষেত। চল না ধান গাছ দেখে আসি।

প্রস্তাবটা ও নিজে থেকেই করেছে যখন আমার কিছুই বলার নেই। আমি সাগ্রহেই তার ইচ্ছা পূরণে সাড়া দিলাম।

সামনেই ধানক্ষেত। ক্ষেতের মাঝ বরাবর আলের ওপর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ কাটা কিছু খড় পড়ে থাকতে দেখে সে বলল, চাষ করতে খড় লাগে বুঝি?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। প্রশ্নটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিনা যাচাইয়ের জন্য।

রন্টু কিন্তু তার প্রশ্নে অটল রইল।

ধান গাছ থেকেই যে খড় হয় এটা আমি সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে দিতে, ও বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, আমার এতদিন আইডিয়া ছিল খড় গাছ আছে বুঝি! আমরা তো খড় দরকার হলে সুপার মার্কেট থেকে কিনি অতসত আর জানব কি করে বল। ক্ষেতের ওপর ঘুরতে ঘুরতে এমন অনেক অজানা জিনিষই তার জানা হয়ে যাচ্ছিল। সে তাতে খুশী হলেও মুখে প্রকাশ করছিল না। গেঁয়ো হয়ে যাওয়ার ভয়ে। হঠাৎ তেঁতুল পাড়ার মণ্ডলদের পরিত্যক্ত বাড়ীটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলে ওটা পোড়ো বাড়ী মনে হচ্ছে। লোকজন কেউ থাকে না নাকি ওখানে?

আমি ঘাড় নাড়লাম। আগে থাকত মণ্ডলরা সপরিবারে। এখন থাকে ভূত!

তার মানে? সকৌতূহলে রণ্টু তাকাল আমার মুখের দিকে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, হ্যাঁ ঠিক তাই। ওই বাড়ীর আশেপাশে যতো ক্ষেত দেখছিস সবই এককালে ছিল হারাণ মণ্ডলের।

হারাণ মণ্ডল খুবই প্রভাবশালী জমিদার ছিল। স্বচক্ষে তার জমিদারীর কাজকম্ম তদারক করার জন্য, তখনকার কালে বিশহাজার টাকা খরচ করে এই বাড়ীটা তৈরী করেছিল এবং সপরিবারে এখানেই বাস করছিল।

সুখ সইল না তার। সইবেই বা কি করে, গরীব প্রজাদের যেভাবে উৎপীড়ন করত।

হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে হারাণ মণ্ডল হঠাৎ একদিন মারা গেল।

হারাণ মণ্ডলের দুই ছেলে তখন নাবালক। অগত্যা হারাণ মণ্ডলের স্ত্রী যশোদা দেবী নিজেই জমিদারী দেখাশুনা করতে শুরু করল। কিন্তু তারও সে সুখ সইল না। দুই ছেলে হঠাৎ বসন্ত হয়ে মারা গেল।

পুত্র হারিয়ে যশোদা দেবীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। ক'দিন পরেই সে পাশের পুকুরে

ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল।

মণ্ডল পরিবারের আর কোনও উত্তরাধিকারী রইল না।

বেশ কিছুদিন বাড়ীটা বেওয়ারিস পড়ে রইল।

খবর পৌঁছতে হারাণ মণ্ডলের এক মাসতুতো ভাই এসে একদিন বাড়ীর দখল নিল। কিন্তু সেও বেশীদিন ভোগ করতে পারল না।

সে থাকাকালীন নানারকম ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটতে লাগল বাড়ীতে।

ক'দিন সাহস করে রইল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও পালিয়ে বাঁচল। সেই থেকে আর কেউ ধার মাড়ায়নি ওই বাড়ীর। তা প্রায় দশবছর হয়ে গেল।

এখন ওটা প্রায় পুরোপুরিই ভূতের আড্ডা, বলে আমি রণ্টুর মুখের দিকে তাকালাম।

রণ্টু ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল যেন সে খুব ভয় পেয়েছে।

আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম। রণ্টুর মতো ডানপিটে ছেলেকে ঘাবড়ে দেওয়া কম কথা নয়। আমি আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছি দেখে হঠাৎ ও হো-হো করে হাসতে হাসতে বসে পড়ল মাটিতে।

যতোই ওকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করি, ততোই ওর হাসির বেগ বেড়ে যেতে লাগল।

বেশ একটু অপ্রস্তুতই হলাম। এত হাসির কিইবা কারণ থাকতে পারে বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আগাগোড়া তার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তেমন কিছু বেফাঁস বলেছি বলে তো মনে পড়ল না।

এবার আমারই বোকা বনার পালা। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ।

রণ্টু আর হাসতে পাচ্ছিল না। দমের অভাবে সে গোঁ গোঁ করে মুখে শব্দ করতে লাগল।

ধৈর্য ধরে আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা ভিন্ন আর কোনও পথ রইল না।

আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, গ্রামের লোকেরাই তো গেঁয়ো ভূত। এখানে আবার ভূতেরা আসবে কী করতে। তাদের কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

রণ্টুর কথা শুনে রাগে আমার গা রী রী করে উঠল। বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই বললাম—একথা তোকে উইথড্র করতে হবে।

তোরা দিল্লীতে থেকে এমন কী রাজ কাজ করিস যা আমরা পারিনা?

রণ্টু বললে, তোরাতো গেঁয়োই। গেঁয়োই যদি না হবি তাহলে কি আর ভূত বিশ্বাস করিস! ভূত তো গেঁয়োদের জন্যেই তৈরী। দেখিস না একমাত্র গ্রামেই রাজ্যের ভূতেদের বাস।

হুঁঃ, চল আমাদের দিল্লীতে—একটা যদি ভূত বা ভূতুড়ে বাড়ী দেখাতে পারিস আমি সারাজীবন তোর গোলাম হয়ে থাকব।

রন্টু বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই কথাগুলো বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এবং মুখে শিস দিতে লাগল।

আমি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললাম, ভূত কি আমিই বিশ্বাস করি নাকি? আমিই তো কোনও দিন ভূত দেখিনি। তবে আমার বাবা কাকা ভূত স্বচক্ষে দেখেছেন বলেই আমি বলি। না দেখলে হয়তো তোর মতোই বিশ্বাস করতাম না।

রণ্টু যেন এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। ঠোঁট উল্টে বললে, যদি নাইই বিশ্বাস করিস তাহলে তোর ভূতের ভয় নেই নিশ্চয়ই।

আর সেটাই যদি সত্যি হয়, আজকের রাতটা তুই মণ্ডলদের বাড়ীতে একা কাটা দিকিনি। দেখি তোর বুকের পাটা কতখানি!

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, যদি কাটাতে পারি কি দিবি?

রণ্টু এক মিনিট ভাবল। পকেট থেকে তার জুনিয়ার পার্কার পেনটা তুলে, আমার চোখের সামনে নাচিয়ে বললে, এটা পাবি।

বিলিতি মাল। বুঝতেই পারছিস এর দাম কত। এখন মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না।

কদিন হল পূর্ণিমা গিয়েছে।

চাঁদ উঠতে দেরী হবে। চারদিক জমাট অন্ধকারই বলা চলে।

আমার এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বাড়ীতে কিছুই ভাঙলাম না। বাড়ীতে জানাজানি হলে যে সকলেই বাগড়া দেবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত মিথ্যার আশ্রয়ই নিতে হল আমাকে।

মামার বাড়ীতে বেড়াতে যাবার নাম করেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম একমাত্র রণ্টু ছাড়া আর কেউই জানল না সে খবর।

রণ্টু অবশ্য আমায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। পথে সে আমার সঙ্গী হল। আমি সত্যি সত্যিই মণ্ডলদের বাড়ী পর্যন্ত যাই কিনা সেটা দেখাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

দুজনে এক সাথেই চলেছি। মুখে কারুরই কথা নেই। রণ্টু মাঝে মাঝে শিস দিয়ে কী যেন একটা হিন্দী গানের সুর ভাঁজছে।

আমরা যখন ওই বাড়ীর প্রায় একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছি, রণ্টু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, আর এগিয়ে লাভ নেই বন্ধু। বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

তুই যা। আমি এখানেই দাঁড়াই।

রণ্টুর চাতুরি আমি বুঝে ফেললাম। কিন্তু কিছুই বলার নেই। বাজীটা আমার যাওয়া নিয়ে। আমাকেই যেতে হবে।

যতদূর দৃষ্টি যায় আমি বারবার তাকালাম পিছন দিকে। আমি এগুনোর সঙ্গে সঙ্গেই, রণ্টুও বাড়ীর পথ ধরেছে। তবে সে আর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

এই মাঠে ঘাটে আমাদের শৈশব কেটেছে। পথঘাট অল্পবিস্তর সবই আমার পরিচিত। এমন কি কোথায় ক'টা গাছ আছে তা পর্যন্ত আমি মুখস্থ বলতে পারি।

যেতে আমার কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না তবে শুরুতে আমার যে গতি ছিল বাড়ীর কাছাকাছি এসে ক্রমশঃই তা মন্থর হয়ে আসতে লাগল।

বাড়ীর সুমুখে হাজির হতেই আমার দেহের শিরায় উপশিরায় এক বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলে গেল।

কয়েক মিনিটের জন্য থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম বাড়ীর সামনে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম এতদিনের দুঃস্বপ্নময় সেই অভিশপ্ত বাড়ীটা।

সদর দরজাটা ভেজান থাকলেও প্রায় ঝুলছিল ফ্রেম থেকে। এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ধরে ঠেলা দিতেই, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটা বিশ্রী শব্দ করে উঠল। কপাট জোড়া ঈষৎ ফাঁক ক'রে মুখ বাড়াতেই, একটা মাকড়সার জাল জড়িয়ে গেল আমার সারা মুখেতে। গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল। হাত দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করে বাড়ীর ভেতরে সভয়ে পা বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গেই 'ধুপ' করে একটা শব্দ হল ভেতরে। বুকের মধ্যে ঢিপ করে উঠল এবং সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল।

এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে এবং এটা নিছকই একটা অভৌতিক কাণ্ড ভেবে মনকে ভরসা দিতে লাগলাম।

আর কোনও সাড়াশব্দ না পেতে এবার এগুলাম বাড়ীর ভেতরে। বাঁ দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে স্তূপাকার মাটি আর ভাঙা ইঁট। সিঁড়ির হাতল সংলগ্ন লোহার শিকগুলো অধিকাংশই চুরি হয়ে গিয়েছে, ফলে কোথাও কোথাও রেলিংটা হেলে পড়েছে।

এই হাতল ধরে ওপরে ওঠা রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। যে কোনও মুহূর্তেই বিপদ ঘটতে পারে।

বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ওই জঞ্জাল ডিঙ্গিয়েই সোজাসুজি ওপরে উঠে যাব মনস্থ করে পা বাড়ালাম।

আট দশটি সিঁড়ি ভাঙ্গার পরই লক্ষ্য করলাম শিলিং থেকে খসে পড়া একটা বড় বালির চাবড়া সিঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাকালাম ওপর দিকে। যদি বিপজ্জনক কিছু

থাকে। এই ধরণের বালির চাবড়া যদি মাথার ওপর একটা পড়ে মাথার চাঁদিটা ছেঁদা হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ভূত দেখতে এসে শেষকালে মাথা ফাটিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়া এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কিছু নেই। তাছাড়া এ-কাণ্ডটা যে ভূতের দ্বারা হয়নি সেকথা সকলকে বোঝানোও রীতিমত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ভূত আর যাই হোক বালি তো হতে পারে না।

দুর্গানাম জপ করতে করতেই ওপরে উঠতে লাগলাম।

দোতলায় পৌঁছতে প্রায় চল্লিশটা সিঁড়ি ভাঙ্গতে হল। হারাণ মণ্ডল নিজে বসবাস করবে বলেই হয়তো এক তলার উচ্চতা এতো বেশী করেছিল।

সিঁড়ির মুখেই লম্বা ধরণের বারান্ডা। বারান্ডার কোলে পর পর তিনখানা ঘর। শেষ প্রান্তে রেলিঙ। রেলিঙের ধারে দাঁড়ালে সুমুখে তার জমিদারীর সীমানা দেখা যায়।

মাঠে যখন ধানের বীজ রোপন করা হতো বা ধান পাকলে কাটা শুরু হতো, তখন হারাণ মণ্ডল এখানে বসে থেকে কাজকর্ম তদারক করত।

তার বসার আরাম-চেয়ারটা যথারীতিই পড়ে আছে একপাশে। সেটা যে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত, সেটা তার জীর্ণদশা দেখলেই মোটামুটি অনুমান করা যায়। গদীটা ছিঁড়েও তুলো বেরিয়ে পড়েছে।

রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হল যেন একটা ছাইরঙের আলোয়ান চাপা দিয়ে সারা গ্রামখানা ঝিমুচ্ছে।

আমাদের বাড়ীটা দেখবার চেষ্টা করলাম। সারিবদ্ধ নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চিলেকোঠার টালীর ছাদটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চিলেকোঠার সংলগ্ন ছোট ছাদের পাঁচিলের ধারে মনে হচ্ছে যেন একটা মাথা নড়ছে। রণ্টুও হতে পারে আবার চোখের ভুলও হতে পারে।

অন্ধকারে এ ধরণের বিভ্রম কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

মাঝে মাঝে লেড়ীকুত্তার ডাকে গ্রামের সাময়িক নীরবতাটুকু ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

দু একটা শিয়াল এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। যতখানি ভয় পেয়েছিলাম কিছুক্ষণ এখানে কাটানোর ফলে, কিছুটা মন হালকা হল। মনে হতে লাগলো হয়তো বা রণ্টুর এই চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাবই দিতে পারব।

এবার ভূত প্রসঙ্গে নানাকথাই মনে আসতে লাগল। যদি নেহাৎই ভূতের পাল্লায় পড়ি, কীভাবে আত্মরক্ষা করব তার একটা প্রস্তুতি করতে লাগলাম মনে মনে। সেটা

শারীরিক বা মানসিক দুইই হতে পারে।

একবার মনে হল এই ভূতুড়ে বাড়ীতে নেহাৎই যদি বন্দী হয়ে পড়ি তাহলে সরাসরি ঝাঁপ মারব পথে এই বারান্দা থেকে। আর বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। অবশ্য লম্বা পা ফেলে কেউ পেছু ধাওয়া না করলে।

আবার মনে হল সঙ্গে কিছু অস্ত্রসস্ত্র রাখলেও ভালো হতো। সরাসরি আক্রমণ করলে আর কিছু না পারি তাকে ঘায়েল তো করা যেত। তাই বা কম কি।

আমার এই অলস চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাতের গভীরতাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত চীৎকার চেঁচামেচি যেটুকু ভেসে আসছিল তাও ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ও কিছু কিছু কমছে এবং মোটামুটি একটা বোঝাপড়া গড়ে উঠছে এই নির্জন পরিবেশের সঙ্গে।

বিকেল থেকেই মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছিল।

বাতাসের চাপে নুইয়ে পড়া গাছগুলো থেকেও এক বিচিত্র ধরণের শব্দ ভেসে আসছিল।

এখানে দাঁড়িয়ে এ ধরণের ঝোড়ো হাওয়া খাওয়া ঠিক সমীচীন হবে বলে মনে হল না। এত খোলা হাওয়া—ঠাণ্ডা লেগে হিতে বিপরীত কিছু একটা ঘটলে কে দেখবে? এখনই কোথাও আশ্রয় নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সুমুখে সারিবদ্ধ ঘরগুলোর দুটিতে দরজা ভাঙা। সম্ভবতঃ দীর্ঘদিনের দেখাশুনার অভাবে সেগুলো আলগা হয়ে গিয়ে এই পরিণতি। ভবিষ্যতে হয়তো কেউ সেগুলো খুলে নিয়ে যাবে। আশ্রয় নিলে একমাত্র মধ্যিখানের ঘরটিতেই নেওয়া যেতে পারে।

চারদিকে সর্তক দৃষ্টি রেখেই এগিয়ে গেলাম ঘরের দিকে।

কপাট জোড়ার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াতেই চোখে পড়ল দুটো ভাঙা চেয়ার। তবে চেয়ারগুলো ব্যবহারযোগ্য কিনা বোঝা গেল না।

ঘরের ভেতর পা দিতেই ঘরের কোণে জমাট বাঁধা একখন্ড অন্ধকারে 'ঝটপট' করে কী একটা শব্দ হল।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। পিছিয়ে এলাম তিন পা।

আবার সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

ঘর থেকে বেরিয়ে না এসে চৌকাঠ বরাবর দাঁড়িয়ে রইলাম। তেমন কিছু ঘটলে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি।

বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ধীরে ধীরে সাহস ফিরে আসতে লাগল।

ঘরের কোণে পক্ষী জাতীয় কোনকিছুতে বাসা বেঁধেছে।

ভালো করে বোঝা না গেলেও, চামচিকেই মনে হল। এই পরিবেশে চামচিকেতে বাসা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এমন নোংরা ও অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে এখানে রাত কাটানো কষ্টসাধ্য মনে হল। পাশের ঘরে কপাট না থাকলেও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার।

তাছাড়া মাছখানে একটা তক্তপোশও রয়েছে। প্রয়োজনে ওর ওপরে বসেও কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাবে।

ঢুকলাম ঘরেতে। তক্তপোশটা ধুলোয় ভর্তি। পা দিয়ে ধুলোটা ঝেড়ে নিলাম। আমার পাদস্পর্শে নড়বড়ে তক্তপোশটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল।

এক নাগাড়ে ঘণ্টা দুই দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পা দুটো অবশ হয়ে পড়েছিল। তক্তপোশের ওপর বসে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এদিকে বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার ক্রমশই পাতলা হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলোর বন্যা বইবে।

কিছুক্ষণ সেখানে অলসভাবে বসে থাকার ফলে স্বাভাবিক কারণেই চোখ দুটো ঘুমে জুড়ে এল।

নেহাৎই আমরা অভ্যাসের দাস। বারোটা বাজলে আমি আর জেগে থাকতে পারি না। অন্তত বিশ পঁচিশ মিনিট ঘুমিয়ে নেওয়া চাইই।

ঘুম ঠেকাতে একটা গানও ধরলাম। গান গাইলে নাকি ভূতের ভয় এবং চোখের ঘুম দুইই চলে যায়।

কিন্তু অসময়ের গান বলেই হয়তো আমার আসল উদ্দশ্য সফল হল না অর্থাৎ ঘুম আবার দুচোখ ভরেই নেমে এল।

ঘুমের সাথে এবার শক্তি পরীক্ষা শুরু হল। আমি ঘুমাব না কিন্তু ঘুম নাছোড়বান্দা।

হঠাৎ ঠক্-ঠক্-ঠক্ তিনবার শব্দ হল দরজায়।

ঘরে উপস্থিত সকলেই সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। সকলেরই চোখ চলে গেল সেদিকে।

ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিয়ে হুড়কো টানতেই যিনি সহাস্য বদনে ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি আর কেউই নন আমাদের চির প্রত্যাশিত লম্বুদা।

লম্বুদার পোষাকের কিঞ্চিৎ হেরফের ঘটেছে।

সাধারনতঃ তিনি খাকি হাফপ্যান্ট ও সাদা হাফশার্ট পরেই আসেন। গলায় একটা রঙ চটা নীল মাফলার জড়ান থাকে।

আজ কিন্তু জামা ও প্যান্ট দুটোই পাল্টেছেন। গাঢ় নীল বর্ণের ট্রাউজারের সঙ্গে কমলা রঙের একটা চামড়ার জ্যাকেট গায়ে চড়িয়েছেন।

মাফলারটির অস্তিত্ব খুঁজে বার করা খুবই মুশকিল! কারণ সবুজ বর্ণের বাঁদুরে টুপিটা চোখের কালো মণি দুটো ছাড়া আর সব কিছুই ঢেকে ফেলেছে!

বিমল ফিসফিস করে আমাকে প্রশ্ন করলে, কীরে লম্বুদা তো নাকি অন্য কেউ? মুখটা যেরকম ঢেকে রেখেছে চেনার তো কোন উপায় নেই।

আমি বললাম, এক মিনিট। দুটো কথা বলতে দে তাহলেই আমরা বুঝে ফেলব। চেহারা নকল করা যায় কিন্তু অমন বুলি কপচাবে কে?

যা হোক তিনি ঘরে ঢুকে তার অভ্যেস মতোই নির্দষ্ট চেয়ারটি দখল করলেন। মাথার বাঁদুরে টুপিটা টেনে হিঁচড়ে খুলতে খুলতে বললেন, একজন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানের জিনিস মাথায় পরে থাকার মধ্যে গৌরব আছে, কী বল? অবশ্য....

লম্বুদার ইঙ্গিতটা বুঝতে আমাদের কারুরই অসুবিধা হল না। কমল একটু রসিকতা করে বললে, ক্যাসিয়াস ক্লে-কে বলে এনেছেন তো?

লম্বুদা চোখের পাতা দুটো উলটে কমলের দিকে তাকালেন। এক মিনিট নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন আমার দু হাত ধরে স্বামী-স্ত্রীর সাধাসাধি, কিনা আমার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে পারে।

যতো বোঝাই আমার পঞ্চাশ বছরের জীবনে মাত্র একদিন এক ঘণ্টার জন্য টেমপারেচার সাতানব্বই ক্রশ করে আটানব্বই ছুঁয়েছিল, ওরা নাছোড়বান্দা। বিশেষ করে ক্যাসিয়াসের বৌ। এটা মাথায় পরতে তবেই পাইলটকে এয়ারপোর্ট থেকে বিমান ছাড়তে দিল। উঃ—লম্বুদা একমিনিটের জন্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। পকেট থেকে চুরুটের কেসটা বার করে, ডালাটা খুলতেই গোটা কয়েক আধপোড়া চুরুট উঁকি মারল।

কোনটি খাবেন চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটা জোরাল ঘ্রাণ টেনে বললেন, বাতাসে ঘিয়ের গন্ধপাচ্ছি কী ব্যাপার?

লম্বুদার প্রশ্নটা শুনে যখন আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি, হঠাৎ বিপ্লব 'মাই গড' বলে চীৎকার করে উঠল এবং পকেট থেকে সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা বার করে লম্বুদার হাতে দিয়ে বলল, রাইট ইউ আর। আপনি আসবেন জেনেই আপনার ভাগটা আমরা সরিয়ে রাখতে ভুলিনি। গরমই আছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।

লম্বুদা মিনি গোয়েন্দাগিরিতে সফল হতে তাঁর চোখে একটা খুশীর ঝিলিক খেলে গেল।

সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা ঈষৎ ফাঁক করে দুই আঙ্গুলের সাহায্যে একটা শূন্যে তুলে মুখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললেন, হুঁ নির্ঘাৎ ধা—পা—

আবার বিস্ময়ের পালা নামল সকলের চোখে।

ধাপার সঙ্গে সিঙ্গাড়ার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, আমাদের কারুরই মাথায় এল না। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি দেখে লম্বুদা ফিক করে এক ঝলক হাসলেন।

ঠোঁটটা ছুঁচলো করে বললেন, সিঙ্গাড়ার কফি বলছে তার জন্ম ধাপাতেই। অর্থাৎ ধাপার কপি দিয়েই এই সিঙ্গাড়া ভাজা হয়েছে!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সিঙ্গাড়ার মধ্যে যে কপির পুর ছিল সেটা আমাদের কারুরই এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। না থাকারই কথা কারণ অনেকক্ষণই তা হজম হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া সিঙ্গাড়ার খোলসের ওপর থেকে, ভেতরে পুরের গন্ধ শুঁকে তার জন্মস্থান বলা কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে।

এক্ষেত্রে আমাদের মন্তব্য করার মতো কিছুই ছিল না। কেউ বা সশব্দে কেউ বা নিঃশব্দে একটা ঢোক গিলল মাত্র।

লম্বুদা অবশ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন নি। ইতিমধ্যেই তিনি সিঙ্গাড়ার বক্ষস্থলে একটা কামড় বসিয়েছেন। একজোড়া সিঙ্গাড়া লম্বুদার কাছে কিছুই নয়। নেহাৎই দু টিপ নস্যি বলা যেতে পারে।

মুড়ি মুড়কির মতোই সিঙ্গাড়া দুটো তাড়াতাড়ি উদরস্থ করে, একটা ঢাউস ঢেকুর তুললেন।

ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, সিঙ্গাড়াই যখন খাওয়ালে, চা আর এক রাউণ্ড হোক। যা ঠাণ্ডা পড়েছে!

ইন্দ্রজিৎ 'এগ্রিড' বলে হাত তুলল।

লম্বুদা কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই পকেট থেকে একটা দু টাকার নোট বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, দু টাকা সিরিজের পয়লা নম্বর নোট এটা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এটা আমায় উপহার দিয়েছিলেন। এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আ-ছে!

যথাসময়েই কেটলিতে চা এল।

লম্বুদা একাই তিন ভাঁড় চা খেয়ে ফেললেন। চুরুট কেস থেকে আধপোড়া একটা চুরুট বার করে ধরালেন এবং চোখ বুজে মুখ থেকে ধূম উদগীরণ করতে লাগলেন।

বেশ কিছু ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠাণ্ডার বাজারে টপিকস্‌টা কিন্তু ভালই বেছে। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছি। ওতেই আমার শরীর গরম হয়ে গিয়েছে।

যা হোক, আর সময় নষ্ট কোর না। শুরু কর—

আমি শুরু করব বলে প্রস্তুত হচ্ছি লম্বুদা হঠাৎ আমার মুখের সামনে তর্জনীটা তুলে বললেন, ওয়েট এ বিট।

ভূতের গল্প শোনার জন্য যখন সকলেই আমরা উৎগ্রীব, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদার এই অনুরোধে সকলেই অল্পবিস্তর সজাগ হয়ে উঠল এবং ফ্যানটাসটিক একটা কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

লম্বুদা অবশ্য সময় নষ্ট করলেন না। চুরুটটা পর পর কয়েকবার টেনে নিলেন এবং ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক করে শূন্যে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার কাণ্ড কারখানা দেখে আমাদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু হয়ে গেল।

লম্বুদা আড়চোখে সেটা প্রত্যক্ষ করলেও তার মধ্যে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং আরও নির্বিকার চিত্তেই তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শনে মন দিলেন।

তিনি থেকে থেকে ধোঁওয়া ছাড়তে লাগলেন এবং তা থেকে কী যেন একটা বস্তুর আকৃতিগত রূপ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রতিকৃতিটা কার আমরা অনুমান করতে না পারলেও, তিনি যে এটা অনর্থক আঁকেন নি এবং পিছনে কোনও উদ্দেশ্য রয়ে গিয়েছে সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কারই ছিল।

কাজটা সম্পূর্ণ হতে তিনি প্রশ্ন করলেন, আনডারস্ট্যাণ্ড মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস্?

আমরা সমস্বরে 'না' বলতে তাঁর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, না বোঝাই স্বাভাবিক। তবে তৈরী থাক এখনিই একে দেখতে পাবে।

এদিকে প্রতিকৃতিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই, মূল রহস্যটা ব্যক্ত করার জন্য লম্বুদাকে অনুরোধ জানালাম।

লম্বুদা হয়তোবা এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা বলামাত্রই তিনি গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসির রেশ ছিটিয়ে বললেন, না বোঝার মতো কিছুই নেই।

এটা একটা জ্যান্ত ভূতের প্রতিকৃতি। যে গল্প তোমরা শুনছ, ধর সেই গল্পেরই নায়ক। কিছুক্ষণের মধ্যেই যার আবির্ভাব ঘটবে।

লম্বুদার কথা শুনে সকলেরই চোখ গোল গোল হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ ভূত ততক্ষণে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে।

আমি লম্বুদার মুখের দিকে তাকতেই লম্বুদা এবার আমাকে শুরু করার জন্য ইশারা করলেন।

আমি আর বিলম্ব করলাম না। চেয়ারে পা দুটো তুলে, একটু গুছিয়ে বসতে বসতে বললাম, তক্তপোশে বসে মুহূর্ত গুনছি। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ।

হঠাৎ ঘরের ছাদে 'ধুপ' করে একটা শব্দ হল।

নির্জন রাত বলেই হয়তো শব্দটা অত জোরে কানে বাজল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং এর পরে কি ঘটলে কি করব তার একটা ছক তৈরী করতে লাগলাম।

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি না ঘটলেও, শব্দের কারণ নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে বিশ্রীভাবেই পাক খেতে লাগল।

একবার মনে হল সম্পূর্ণটাই মনের ভুল হয়তো। এমনও তো হতে পারে যেহেতু এ ধরণের কোনও ঘটনা আজ সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত, আমার মনের সেই কল্পনাটাই শব্দ ভ্রমে কানে পৌঁছেছে।

অথচ আমি অযথাই ভয় পেয়ে মরছি এখানে বসে।

পরক্ষণেই আবার মনে হল, বাড়ীর সংলগ্ন নারকেল গাছটা থেকে কেউ ছাদের ওপর লাফিয়েও তো পড়তে পারে।

হয়তো বা জোড়া পায়ে লাফ মেরেছে বলেই এই শ-ব্দ!

এরপর যে সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসবে না এমনইবা গ্যারান্টি কোথায়?

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন আমি আকাশ পাতাল এমন অনেক কিছুই চিন্তা করছি, হঠাৎ দ্রুত সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কে যেন নীচে নেবে গেল। আমি ঘর থেকে মুখ বাড়ালাম কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না।

মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। নিঃশ্বাসে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে।

জিদ ভরে এই দুঃসাহসিক কাজে পা বাড়ালাম বটে, কিন্তু তেমন অশুভ কিছু ঘটে গেলে তখন আর আফশোষের অন্ত থাকবে না।

যাহোক অনুশোচনা করারও সময় নেই। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্ডায় বেরিয়ে এলাম এবং রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। যদি কিছু চোখে পড়ে।

দীর্ঘ সময় কাটালাম সেখানে। এটাও মনের ভুল কি না ভাবছি, হঠাৎ ঘরের ভেতরে কাঠের জানালার পাল্লাগুলো দুমদাম বন্ধ হয়ে গেল।

এবার সত্যি সত্যিই ভয় হল এবং হাতের তালু দুটো হঠাৎ অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। বাড়ীর ভিতরে থাকা আর সমীচীন হবে কি না ভাবছি, রাতের জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল কুৎসিত স্বরে। প্যাঁচার ডাক আগে বহু শুনেছি কিন্তু এমন কুৎসিত আর ভয়ার্ত ডাক কখনও শুনিনি।

যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে রইলাম প্যাঁচাটার দিকে। আকাশ পরিষ্কার ছিল বলেই তার ডানা নাড়াটা অনেকক্ষণ চোখে পড়ল।

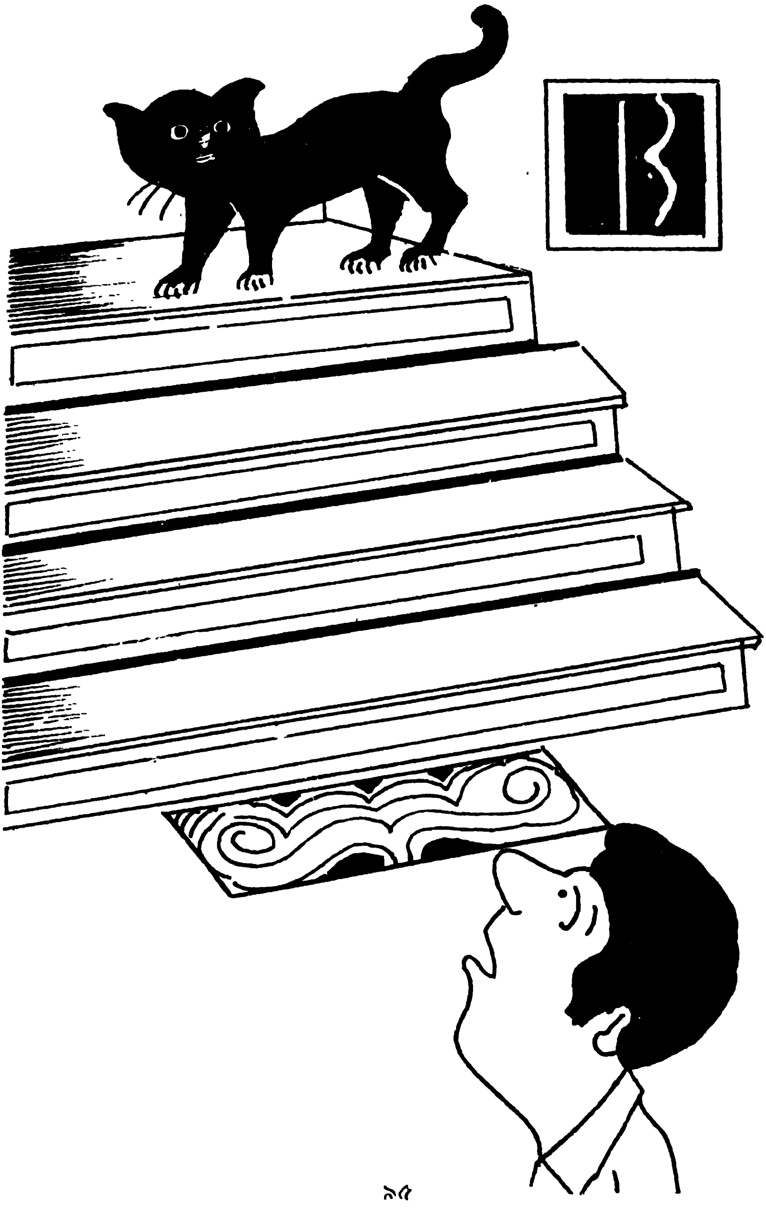
প্যাঁচাটা অদৃশ্য হয়ে গেলেও তার কুৎসিত ডাকটা আমার কানে কেবলই বাজতে লাগল। মনে হল সে যেন এই বাড়ীরই চারদিকে ডেকে ডেকে পাক খাচ্ছে।

এবার আমি পা পা করে এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দিকে। কয়েক ধাপ ওপরে চাতালটায় চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। কুচকুচে কালো একটা বিড়াল থাবা

গেড়ে কটকট করে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

এই মুহূর্তে একটা নরখাদক বাঘ দেখলেও বোধহয় অতটা ভয় পেতাম না যতটা ভয় পেলাম বিড়ালটিকে দেখে।

চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। যদি ভয় পেয়েও সে পালায়।



কিন্তু সেরকম কোনও আভাস দেখতে পেলাম না তার মধ্যে। বরং তার দৃষ্টি আরও ভয়ার্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ইতিপূর্বেই আতঙ্কে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হবার উপক্রম হয়েছিল। বিড়ালটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার জামাও ঘামে ভিজে উঠল।

ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্য মুখে নানারকম শব্দ করলাম। হাত পা ছুঁড়লাম কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না। গ্যাঁট হয়েই সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সে এবং নিশ্চিন্ত মনেই লেজ নাড়তে লাগল।

এবার সত্যি প্রমাদ গুণলাম। বাড়ী থেকে বেরুতে গেলে এই সিঁড়ি ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। অথচ যেভাবে বিড়ালটি সিঁড়ি আগলে বসে রয়েছে,—কি করব ভাবছি। বিড়ালটি হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

নিজের অজান্তেই আমি পাঁচ সাতটা সিঁড়ি পেছিয়ে এলাম।

আমাকে পেছুতে দেখে বিড়ালটি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি দেখলাম আর ওপরে উঠে কোনই লাভ নেই। যদি লাফ মারতে না পারি সরাসরিই বন্দী হয়ে পড়ব বাড়ীর ভিতর।

এখন বিড়ালটির নজর এড়ানো একান্ত প্রয়োজন। অন্ততঃ তাতে পালাবার পথও কিছুটা প্রশস্ত হবে।

বিড়ালটি পিছনে মুখটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি সিঁড়ির ধাপের সংলগ্ন মোটা সিমেন্টের আলটার আড়ালে চট্ করে সরে গেলাম।

এখন বিড়ালটি আমাকে দেখতে না পেলেও, আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। সে গা ভেঙ্গে দাঁড়াল এবং বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ির পাশে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেল।

বিড়ালের উদ্দেশ্য বা পরিচয় যাই হোক, আমি আর সেখানে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করলাম না। জামা তুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে, একরকম কয়েকলাফেই সদরে এসে দাঁড়ালাম।

ওপরে চোখ তুলতেই আবার বিস্ময়! বারান্দার রেলিঙের ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে বিড়ালটি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর চোখ দুটো তার অন্ধকারে আগুনের ভাঁটার মতোই জ্বলছে।

ঘামে জামাটা প্রায় ভিজে গিয়েছে। হাত পা পুরোপুরিই ঠাণ্ডা, তাছাড়া রাত্রি জাগরণের ফলে শরীরটাও ঝিম ঝিম করছে। মোটামুটি সময় উত্তীর্ণ। আর থাকা প্রয়োজন হবে কিনা ভাবছি দাঁড়িয়ে।

এদিকে রাত আরও গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারটা ক্রমশঃ পাতলা হয়ে, চাঁদ উঠল আকাশে। চাঁদের আলোয় পরিচিত গাছপালা ও ঘরবাড়ীগুলো দেখে মনে

থেষ্ট বল সঞ্চার হল। বাড়ী ফিরে যেতেও এখন কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু এখুনি ফিরে গেলে রণ্টুর কাছে মুখ দেখান ভার হবে। এরপর রণ্টু যে কোনওরকম ব্যঙ্গ করুক না কেন, নীরবেই তা সহ্য করতে হবে।

এলোমেলো এমন অনেক কিছুই ভাবতে ভাবতে বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম বিড়ালটি নেই। কোথায় যেন া ঢাকা দিয়েছে।

বিড়ালটির এই আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধান যথেষ্টই সন্দেহের কারণ হয়ে াঁড়াল। বিড়ালটিই মণ্ডল পরিবারের কারুর অশরীরী আত্মা কী না কে জানে!

পিছন ফিরে ঘন ঘন তাকাতে লাগলাম। সেই বা আমার ওপর এমন তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে কেন?

সুমুখে ধানক্ষেতের পশ্চিম প্রান্ত বরাবর শ্মশানের রাস্তা। কারা যেন মড়া পুড়িয়ে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে।

তাদের কথাবার্তা স্পষ্টাস্পষ্টি শোনা না গেলেও বয়স যে সকলের কম তাদের কণ্ঠস্বর থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই মুহূর্তে মানুষের গলা পেয়ে যেমন সাহস পেলাম, তেমনই ভয় পেলাম মড়ার কথা স্মরণ করে।

এতক্ষণে হয়তো তার অশরীরী আত্মা এই ক্ষেতখামারেই কোথাও না কোথাও এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে সেদিক তাকাচ্ছি। কোন গাছের পাতা নড়ে উঠলেই মনে হচ্ছে সেটা বুঝিবা কোনও প্রেতাত্মার দ্বারাই ঘটছে।

থেকে থেকে ভীষণ ভয় পেয়েও যাচ্ছি। আবার যুক্তির ধাক্কায় সেই ভয় কেটেও যাচ্ছে।

হাতে ঘড়িও নেই। এখন ক'টা বাজে কে জানে। তবে অন্ধকারে স্বচ্ছতা দেখে মনে হচ্ছে ভোরের আলো ফুটতে আর বিশেষ দেরী নেই।

রণ্টু নিশ্চয়ই এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে কি আর রাত জেগে বসে থাকার ছেলে!

বাড়ীর পথে দৃষ্টি মেলতেই বিস্ময়ের পালা। দূরে সুপুরী গাছটার তলায় কটা ছেলে নিচু হয়ে কি যেন কুড়োচ্ছে!

নিঃসঙ্গতা আমায় এমন পাগল করে তুলেছিল যে ছেলেটিকে দেখা মাত্রই আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম।

চীৎকার করেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম।

প্রথমবার চীৎকারে তার কোনও সাড়া পেলাম না। দ্বিতীয়বার চীৎকার করতেই

সে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকাল এবং সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ইশারায় তাকে ডাকতে সে উঠে দাঁড়াল এবং গুটি গুটি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে এসে দাঁড়াতে আমি প্রশ্ন করলাম, কী করছ তুমি ওখানে?

সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। যেন ভূত দেখল।

প্রশ্নটা সঙ্গত হয়নি ভেবেই আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম। হেসে বললাম, একটা বিশেষ কাজে এসেছি এখানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে। একা থাকতে ভাল লাগে না। তুমি যদি কিছুক্ষণ আমার কাছে থাক খুব খুশি হব।

আমার অনুরোধ শুনে সে চুপ করেই রইল। অনুরোধ রাখবে কি রাখবে না বুঝতে পারলাম না।

আকস্মিক এ ধরণের একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার জন্য বোধহয় সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। আমার সব প্রশ্নের উত্তরেই সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে এবং কি যেন ভাবতে লাগল।

নীরবতা অবশ্য সম্মতিরই লক্ষণ। আমি সেই ভরসাতেই হাল ছাড়লাম না। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলাম। ওর কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করলাম, তোমার কি কোনও কাজ আছে? খুব কি অসুবিধা হবে?

এতক্ষণে সে মুখ খুলল। ক্ষীণস্বরে বললে, না না অসুবিধা কি আর । আমি তো আছিই—

সে রাজী হতে আমি খুবই খুশী হলাম। হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে এসে বসালাম বাড়ীর সুমুখে ছোট চাতালটার ওপর।

নামটা জানার আগ্রহ হল। নাম কী?

প্রশ্ন করতেই সে বেশ একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হেসে বললে, নাম জেনে কী হবে?

বুঝলাম সে আমায় সঙ্গ দিতে রাজী হলেও, নাম ধাম প্রকাশে রাজী নয়। এটা অবশ্য এক একজনের স্বভাব থাকেও।

তার সঙ্গটাই যথেষ্ট, নাম ধাম জেনে আমারই বা কি হবে?

তাই আর পীড়াপীড়ি করলাম না। বললাম, তুমি এখানে থাকলে তোমার ভয় করবে না তো?

এই প্রশ্ন শুনে তার মুখের ভাব কিঞ্চিৎ পালটে গেল। বরং একটু উৎসাহ ব্যঞ্জক স্বরেই বলল, ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়?

গেঁয়ো ছেলেরা সাধারণতঃ একটু সাহসীই হয়। তার এই ধরণের প্রশ্নে তাই আমি খুব অবাক হলাম না। আমিও তো গ্রামের ছেলেই বটে।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, কেন ভূতের! এ বাড়ীতে ভূত থাকে তুমি জান না?

ভূ—ত! ভীরুতায় ভরা চোখ দুটো তার চকচক করে উঠল। ভূত এখানে থাকে শুনেছ কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছ কখনও!

—না দেখিনি বটে। আর সেইজন্যেই তো আসা। যদি সশরীরে ভূতের দর্শন মেলে।

তবে একা থাকতে ঠিক মন চাইছে না। সেই জন্যেই তোমার সঙ্গ চাওয়া।

তুমি সঙ্গে থাকলে মনে একটু .বল পাব এই আর কি।

ওঃ, সে একঝলক মৃদু হাসল। আমার কাছে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করল, ভূত কারা হয় বলতে পার?

ওর কৌতূহল আমি এড়িয়ে যেতে পারলাম না। বললাম, মৃত্যুর পর যে সব মানুষের আত্মার সদ্‌গতি হয় না পরলোকে তারাই ভূত হয়।

তাই নাকি? হঠাৎ সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল! আমার কাঁধে হাত রেখে বললে. মানুষ মরেই তাহলে ভূত হয়।

আমি নীরবে ঘাড় নেড়ে তার কৌতূহল নিবৃত্ত করলাম।

ক্রমশঃ ওর সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠল।

ও নিজে কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা না করলেও, আমি যা বলতে লাগলাম তাতে মেটামুটি সায় দিতে লাগল এবং নিজেও টুকটাক মন্তব্য করতে লাগল।

সময়টা আগে যেমন কাটছিলই না, এখন যেন দ্রুত কাটতে লাগল।

এদিকে চাঁদও আকাশের মাঝামাঝি উঠে এসেছে। জোছ্‌নালোকে প্রায় দিনের মতোই ভ্রম হচ্ছে মাঠঘাট গুলো।

ভোর হতে যে আর বিশেষ বাকি নেই, মাঝে মাঝে পাখীর এলোমেলা কিচমিচ ডাক থেকেই তা অনুমান হচ্ছে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল।

ছাদের পাঁচিলের গা থেকে একটা বালির চাবড়া খুলে পড়ল আমাদের সামনে। খুব জোর বেঁচে গেলাম। ওটা আমাদের যারই মাথায় পড়ত, নির্ঘাত তার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

কোত্থেকে চাবড়াটা খসল দেখবার জন্য মুখ তুলে তাকালাম ওপর দিকে। এটা আদৌ দুর্ঘটনা না কারুর শয়তানি সেটাই জানার দরকার ছিল।

কিন্তু ওপর দিকে তাকাতেই এক বিপত্তি ঘটল। ঝুর ঝুর করে অজস্র বালি পড়ল চোখের ওপর এবং চোখ করকর করে উঠল।

এমনিই এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে সময় কাটছিল। চোখে বালি পড়তে

মেজাজটা খুবই গরম হয়ে গেল। বললাম, নিশ্চয়ই ব্যাটা ভূতেরই কীর্তি।

ভূত না হলে এমন বজ্জাতি আর করবে কে? বালির চাবড়া পড়ার বা ওপর থেকে বালি ঝরার আর কি সময় ছিল না?

আমার এই মন্তব্য শুনেই সে তার হাতটা বাড়িয়ে রাখল আমার কাঁধেতে। কাঁধ কাঁধ স্পর্শ করে বললে, কি করে বুঝলে?

আমি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেই বললাম এ আর না বোঝার মতো কি আছে দেখছ না এত জায়গা থাকতে আমাদের মাথা বরাবরই পড়ল। আর কি পড়ার জায়গা ছিল না?

ব্যাটাকে একবার যদি বাগে পাই, টের পাইয়ে দেব কত ধানে কত চাল। পড়েনি তো আমার খপ্পরে?

আমার মন্তব্য শুনে সে কিন্তু কোনওরকম উচ্চাবাচ্চ করল না। নীরবই রইল যদিও তার হাতটা পূর্ববৎ আমার কাঁধের ওপরেই রইল।

হঠাৎ...

হ্যাঁ, হঠাৎই মনে হল তার হাতটা কেমন যেন ভারী ভারী ঠেকছে। প্রথমে এটাকে নিছকই মনের ভুল ভেবে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সেটা সাময়িক। উত্তরোত্তর চাপ বৃদ্ধি পেতে মনটা আবার সেখানে চলে গেল। তবে কি ইচ্ছে করেই সে এটা করছে?

পাশে মুখ ফেরাতেই বিস্ময়ের পালা। তার ছোট্ট দেহটা ধোঁয়ার মতোই হালকা হয়ে বাতাসে কাঁপছে।

হয়তো বা স্বপ্ন দেখছি ভেবে আমি দুহাতে চোখ রগড়ালাম। চোখ খুলে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

কো-থা-য় গেল? আর গেলেইবা আমার কাঁধে তার হাত থাকবে কেন?

আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর পেলাম না। কিন্তু হাতের ভার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশির মতোই সেটা সেঁটে বসল আমার কাঁধের ওপর।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। চীৎকার করে উঠলাম কে? কে তুমি? বলো—

কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই। মনে হল যেন সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ মরে এই অশরীরীর পিছনে এসে ভীড় করেছে।

দেখতে দেখতে পূর্ব আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঁকি মারল। সূর্য ওঠা পর্যন্তই এই বাড়ীতে থাকতে হবে—এটার ওপরেই বাজী হয়েছিল রণ্টুর সঙ্গে। মোটামুটি সে শর্ত পূরণ হতে আমি বিষণ্ণ মনেই বাড়ীর পথে রওনা হলাম।

লম্বুদার চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বেলে চুরুট ধরিয়ে

কমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, পুওর চাইল্ড।

মন্তব্যটা তিনি আমাকে করলেন না ভূতকে করলেন, ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য নিয়ে আর কোনওরকম গবেষণা না চালিয়ে আমি পুনরায় শুরু করলাম।

রণ্টু বাড়ীর ছাদেই অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখামাত্রই সে দৌড়ে নেবে এল আমার সঙ্গে করমর্দন করতে। কিন্তু আমার মুখের চেহারা দেখে সে ঘাবড়িয়ে গেল।

কতক্ষণ আর সে ঘটনা গোপন রাখা যায়। ক্রমশঃ জানাজানি হতেই তুমুল হৈ-চৈ পড়ে গেল বাড়ীতে।

প্রথম প্রথম কেউই বিশ্বাস করতে চাইল না ব্যাপারটা। বরং এ নিয়ে নানারকম ঠাট্টা মস্‌করা চলতে লাগল।

কেউ বললে, নিশ্চয়ই ও কোত্থেকে গাঁজা বা ভাঙ কিছু একটা খেয়ে এসেছে। কেউ বললে, না না লেখাপড়া ছেড়ে দেবার এ এক ধরনের ফন্দী। আবার কেউ বললে, দেখগে কোন অপেরায় নাম লিখিয়েছে। এটাও তো অভিনয়েরই অঙ্গ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যখন খুবই বিব্রত বোধ করছি, পাড়ার এক পুরুত ঠাকুরই আমায় বাঁচালেন।

পুরুত ঠাকুরের একমাত্র ছেলে শশীভূষণের কাঁধে অনেককাল আগে একবার ভূত ভর করেছিল। তাই ঘাড়ে ভূত চাপলে কি কি লক্ষণ সাধারণতঃ প্রকাশ পায় তিনি ভালো ভাবেই জানতেন। এ খবর যথারীতি তাঁর কানে পৌঁছল।

আমার মধ্যেও সেই সব লক্ষণ দেখে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অর্থাৎ আমার ঘাড়েও ভূত চেপেছে। সেকথা তার মুখ দিয়ে প্রচার হতে সকলেই সভয়ে ও বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

রণ্টু খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। আমার এই দুর্দশার মূল উৎস যে সে, সেই কথা উপলব্ধি করেই আর এখানে থাকা উচিত মনে করল না। কারণ এজন্য ভবিষ্যতে উত্তম মধ্যম কয়েক ঘা তার পিঠে পড়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। অতএব এক্ষেত্রে পলায়নই একমাত্র বুদ্ধির পরিচয়।

স্কুল খোলার অজুহাতে সেই দিনই রণ্টু দিল্লী পাড়ী দিল। কারুর উপদেশেই সে কর্ণপাত করল না।

এবার শুরু হল আমার চিকিৎসা।

আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে দলে দলে আমাকে দেখতে আসতে লাগল বাড়ীতে এবং তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে লাগল মা ও বাবাকে।

কত মণ যে সরষে পুড়ল তার ইয়ত্তা নেই।

যে যা বলতে লাগল, সেই মতোই চিকিৎসা চলতে লাগল আমার। হেন টোটকা চিকিৎসা নেই যে হল না। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। ভূত গ্যাঁট হয়েই চেপে বসে রইল আমার ঘাড়েতে। এক চুল নড়বার নাম করল না।

ঘরোয়া চিকিৎসা যখন ব্যর্থ হল ডাক পড়ল ওঝার।

ওঝা এসে নিবিষ্ট মনে সমস্ত ঘটনা শুনল। আমার দেহে হাত বুলিয়ে কি যেন অনুভব করার চেষ্টা করল, তারপর বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে, হুঁ, যা ভেবেছি তাই। বেশ জাঁদরেল ভূতই ঘাড়ে চেপেছে। এখন তার শক্তি পরীক্ষা করা একান্ত দরকার। ছোট ও বড় মিলিয়ে ক'টা পিতলের ঘড়া চাইল ঠাকুমার কাছে।

যথাসময়েই ঘড়া হাজির হতে, ওঝা সেগুলো জল ভর্তি করে আমাকে ডেকে বলল, তুমি দাঁত দিয়ে ধরে ঘড়াগুলো পাশের ঘরে নিয়ে যাও। ওঝার নির্দেশ শুনে তো বাড়ীশুদ্ধ লোকের চক্ষু ছানাবড়া।

দাদু বাধা দিয়ে বলল, না না এ সম্ভব নয়। তোমার পাগলামিতে বাছা আমার দাঁতগুলো খোয়াবে নাকি।

ওঝা কিন্তু দাদুর নিষেধ মানল না, বললে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। ঘাড়ে ভূত চাপাতে এখন অসাধারণ শক্তির অধিকারী সে।

তবে কতখানি শক্তি সে ধরে সেটাই পরীক্ষা হবে এখন। এ থেকেই বোঝা যাবে কী রকম আকৃতির ভূত চেপেছে ওর ঘাড়ে। এতে দাঁতের কোনও ক্ষতি হবে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনারা।

ওঝার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে দাদু অবশ্য আর বাধা দেননি।

ওঝার কথাই সত্যি হল। অক্লেশে আমি ঘড়া কটা দাঁতে কামড়ে ধরে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে।

ওঝা খুবই গম্ভীর হয়ে গেল। বেশ চিন্তিত মুখেই বলল, হুম যা ভেবেছি তাই। বেশ বজ্জাত ভূতই ঘাড়ে চেপেছে। এর জন্য কড়া দাওয়াই দেওয়া দরকার। তার নির্দেশ মতোই বাড়ীর লোকেরা একদিন রাত আড়াইটের সময় আমাকে পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে আনল!

ভূত যদি শীত কাতুরে হয় এই দাওয়াইতে নাকি ভূত দেহ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই কাজ হল না। জলে ভিজেও ভূত যথারীতি ঘাড়ে চেপেই বসে রইল।

একদিন দুপুরে চড়া রোদে গরম বালিতে সারা দুপুর আমাকে শুইয়ে রাখল।

এবারেও কিছু কাজ হল না। ভূত নাছোড়বান্দা।

ওঝা বেকায়দা দেখে শরীর খারাপের অজুহাতে সরে পড়ল। এবার অন্য ওঝার খোঁজ শুরু হল। আমার এক মামা মুর্শিদাবাদ থেকে একজন টপ র‍্যাঙ্কের ওঝা এনে

হাজির করল বাড়ীতে।

সে পূর্বের চিকিৎসার ফিরিস্তি শুনে গুম মেরে গেল এবং মুখে বিড় বিড় করে কি সব বলতে লাগল। কাঁধেতে তার একটা বড় পুঁটুলি ছিল। সেই পুঁটুলিতে বাঁধা বই পত্তর ঘেঁটে কি সব দেখল। বাবাকে বললে, চিকিৎসা ভুল কিছু হয়নি। তবে ওষুধের মাত্রা আরও কড়া হওয়া দরকার। তিনগাছা মুড়ো ঝাঁটা চাই। এখনি আনিয়ে দিন চিকিৎসা শুরু করে দিই।

তখন সকলের মনের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে ঝাঁটা চাইতে, কেউ আর কোনওরকম বাধা দিল না।

সেদিনই হাট বার ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনগাছা মুড়ো ঝাঁটা এসে গেল হাট থেকে।

ওঝা ঝাঁটা তিনগাছা গঙ্গার জলে ভাল করে ধুয়ে নিল। ঝাঁটার গায়ে তেল সিদুঁর মাখিয়ে বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ল। তারপর ঝাঁটা হাতে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। পরিণতিটা কেউই স্বচক্ষে দেখতে রাজী হল না। সকলেই একে একে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘর শূন্য হতে ওঝা দরজায় খিল এঁটে দিল। তারপর নির্মমভাবে ওই মন্ত্রপূতঃ ঝাঁটা মারতে লাগল আমার পিঠের ওপর। দু'টো ঝাঁটা মুচড়ে ভেঙ্গে গেলেও কোনও কাজ হল না। ওঝা মুষড়ে পড়েই এবার তৃতীয় ঝাঁটায় হাত দিল।

তবে আর পেটাবার প্রয়োজন হল না। ওতেই ভূত নেমে গেল ঘাড় থেকে।

ভূতের হাত থেকে রেহাই পেলাম বটে, কিন্তু ঝাঁটার দাগের হাত থেকে রেহাই পাইনি বলে, আমি শার্টটা তুলে আমার পিঠটা দেখালাম সকলকে।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা 'ই-স্-স্-স' ধ্বনি-তরঙ্গ বয়ে গেল ঘরের মধ্যে। দু'একজন চেয়ার উঠে এসে ঝুঁকে পড়ল আমার পিঠের ওপর এবং বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

কেউ কেউ আবার সহ্য করতে না পেরে অন্যদিকেও মুখ ঘোরাল।

সকলেই যখন ওঝার এই নিষ্ঠুর আচরণের সমালোচনায় মুখর একজনের মধ্যে কিন্তু কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি হলেন অদ্বিতীয় লম্বুদা। তিনি চোখ বুজিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে অনর্গল চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার এই নির্বিকার ভাবসাব দেখে কিন্তু কেউই খুশী হতে পারল না। বিশেষ করে ভূতের নামে এই নির্মম নির্যাতনের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখাতে সকলেরই কৌতূহল বৃদ্ধি পেল এবং তাঁর এই নির্বিকার থাকার মূল কারণ জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লম্বুদা সেটা অনুভব করলেও, অন্যমনস্কতার ভান করে বসে রইলেন। কেউ সেটা মুখ ফুটে প্রশ্ন না করলে যে তিনি সে প্রসঙ্গ তুলবেন না সেটা অনুমান করতে কারুরই

অসুবিধা হল না।

আবার বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার প্রশ্ন উঠল।

সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কে তুলবে? শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎ-ই মুখর হল। লম্বুদার উদ্দেশে বলল, আপনার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আপনি বোধহয় কখনও ভূতের পাল্লায় পড়েন নি। পড়লে অন্ততঃ এতখানি নির্বিকার থাকতে পারতেন না এই লোমহর্ষক ঘটান শোনার পরও।

লম্বুদা ঈষৎ চক্ষু ফাঁক করে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে একমিনিট তার দিকে তাকিয়ে থেকে, অদ্ভুত এক শব্দ করে গলা ঝেড়ে বললেন, রাইট ইউ আর মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড।

আমি জীবনে কখনও ভূতের পাল্লায় পড়িনি। তবে, হুম্...

লম্বুদা পুনরায় নীরব হয়ে ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন।

এখানেই ইতি টানবার বাসনা যদি তাঁর থাকত তিনি আর অহেতুক হুম্ বলে চুপ করে বসে থাকতেন না।

এই নীরবতা যে তাঁর সরবতারই পূর্ব লক্ষণ সেটা সকলেই উপলব্ধি করাতে হৈ-চৈ পড়ে গেল ঘরের মধ্যে।

আবার সকলে ঘুরে ঘুরে তাকাতে লাগল ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে।

ইন্দ্রজিৎ যে আর খোঁচা দিতে রাজী নয় সেটা তার মৌখিক অভিব্যক্তিতেই ধরা পড়ে গেল। এমনকি সে তাকালও না কারুর দিকে।

ইন্দ্রজিতের মনোভাব প্রকাশ পেতে, শেষ পর্যন্ত বাস্তবই এ দায়িত্ব পালন করল।

লম্বুদাকে উদ্দেশ্য করে বললে, আপনার মুখনিঃসৃত 'তবে হুম্' শব্দদ্বয় আমাদের কাছে যথেষ্ট রহস্যময় ঠেকছে।

রহস্য উদঘাটনের নির্মম যন্ত্রণার হাত থেকে আপনি যদি আমাদের উদ্ধার করেন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।

লম্বুদা গুরুগম্ভীর চালে এক ঝলক হাসলেন। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, তুমি ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে। কিন্তু আমার কেস স্বতন্ত্র। ভূতের পাল্লায় আমি পড়িনি, বরং ভূতই আমার পাল্লায় পড়েছিল বলে লম্বুদা হা-হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন—বেচারী!

লম্বুদার এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরে চমকের শিহরণ খেলে গেল। ভূতের পাল্লায় লোক পড়ে এটাই চিরকাল শোনা গিয়েছে। শুধু শোনাই বা বলি কেন দেখাও গিয়েছে এযাবৎ তাই।

কিন্তু এই প্রথম উল্টো কথা শোনা গেল। অর্থাৎ ভূত পড়েছে মানুষের পাল্লায়। স্বভাবতঃই সকলে যেমন একদিকে খুশীতে উল্লসিত হয়ে উঠল, তেমনিই কাহিনীটা

শোনার আশায় গা ঝেড়ে উঠে বসলচেয়ারে।

মোটামুটি পরিবেশ শান্ত হতে, লম্বুদা এবার পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন এবং ওষুধে ফল ধরেছে দেখে ঘন ঘন ধূমপান করতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর ছেয়ে গেল। ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকায় লম্বুদার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু চুরুটের লাল আগুন ধক্ ধক্ করে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করছিল। লম্বুদা চায়ের ভাঁড়ে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, ঠাণ্ডা বাড়ছে। বরফ পড়তে আর বিশেষ দেরী নেই। আর এক রাউণ্ড চা খেলে কেমন হয়।

প্রস্তাবটা তিনি করেছেন যখন, খরচ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েই সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলাম—এক্সেলেন্ট!

গরম চা সহযোগে লম্বুদার গল্প প্রায় স্বর্গের অমৃতেরই সমান।

আমরা যখন মৌতের স্বপ্নে বিভোর লম্বুদা মাথা গুনতে শুরু করলেন। বিড় বিড় করে মনে মনে কী যেন হিসেব করে তিনখানা ছাতাধরা এক টাকার নোট প্যান্টের গোপন পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, শুধু চা কেন সঙ্গে কিছু টা-ও হোক।

চা পানের আনন্দেই আমরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। টা-এর প্রস্তাব হতেই হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল ক্লাবঘর।

লম্বুদা মনে মনে খুশী হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। পায়ের ওপর পা তুলে বসে মৃদু নাচাতে শুরু করলেন।

সর্বসম্মতিক্রমেই এবার বিমলের ওপর চা আনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

বিমল চিরকালই একটু নিরীহ প্রকৃতির। সচরাচর তাকে কোনও কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

দায়িত্ব পেতে সে হাসি মুখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চা না খাওয়া পর্যন্ত যে লম্বুদা মুখ খুলবেন না সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত ছিল। এই সময়টুকু কাটানোর জন্য চা-এর সঙ্গে 'টা'-টা কী ধরনের আসতে পারে সে নিয়ে একটা ছোটখাটো গবেষণা শুরু হয়ে গেল।

অর্নব বললে, বিমল ভয়ানক মিষ্টিখোর। 'টা'-টা যখন নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি তখন ও নির্ঘাত এককাড়ি মিষ্টি কিনে আনবে।

কমল অর্নবের যুক্তিটা মানতে চাইল না। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করে বললে, তোর অনুমান ঠিক নয়। এই ক্লাবের লাইফ মেম্বার সে। আমরা কী খেতে ভালবাসি না বাসি জানে না সে এ কখনও হতে পারে!

আমার মন বলছে চায়ের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল জমে যেটা অর্থাৎ গরম তেলেভাজাই

আনবে।

'নো স্যার' মিষ্টি বা তেলেভাজা কোনটাই আনবে না। আনবে 'ডালমুট' তোমরা দাঁতের ব্যায়াম শুরু করতে পার। লম্বুদা বেশ গম্ভীর চালেই কথাগুলো বলে, নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারে।

আকস্মিক লম্বুদার এ ধরনের একটা মন্তব্যে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। বিমল কি আনবে না আনবে কিছুই বলে যায়নি। সবটাই যখন অনুমানের ওপর নিভর্রশীল, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদার এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে এই মন্তব্যের মূল উৎসটা জানবার জন্য সবাই উসখুস করতে লাগল। কিন্তু প্রশ্ন করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব দেখা দিতে মোটামুটি প্রসঙ্গটা সেখানেই ধামা চাপা পড়ল।

অনুমান শেষ পর্যন্ত মিলল লম্বুদারই।

বিমল ঘরে ঢুকে ডালমুটের ঠোঙাটা টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, চা আসছে। শুরু করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা মৃদু সোরগোলের ঝড় বহে গেল লম্বুদার অনুমানকে ঘিরে।

তিনি আমার হাত দুয়েক ব্যবধানে বসেছিলেন। আমি জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে লম্বুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার অনুমানের ভিত্তিটা অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

লম্বুদা মুখটা ছুঁচলো করে বললেন, সিমপ্লি কমনসেন্স!

তোমাদের এখানে আসার পথে বনমালীর তেলেভাজার দোকানে যে লাইন দেখে এসেছিল সেই লাইনে যদি বিমল গিয়ে দাঁড়াত, তেলেভাজা পেতে পেতে তার আগামীকাল বিকেল হয়ে যেত।

নিশ্চয় সে ও ঝুঁকি নেবে না।

এবার মিষ্টি প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি দিয়েছি তিন টাকা। বাইশ ভাঁড় চায়ের দাম দু টাকা পঁচাত্তর পয়সা। বাকী থাকে পঁচিশ পয়সা।

ওই পয়সায় বাইশটা বোঁদেও হবে না, রসগোল্লা পান্তুয়া দূরে থাকুক। অতএব মিষ্টি কেনার কথাই উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে অন্যকিছু কেনাই স্বাভাবিক। যেহেতু ডালমুট আনবে এতে আর সন্দেহ কি। লম্বুদা বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই হাসলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম করমর্দনের জন্য। তিনি কোনও সঙ্কোচ না করে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যুত্তর দিলেন।

ডালমুট হাতে হাতেই ভাগ হয়ে গেল। প্রথম সমান ভাগেই ভাগ হল, পরে প্রত্যেকেই নিজের অংশ থেকে দু'টি করে তুলে দিল লম্বুদাকে তাঁর প্রতি আমাদের

ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে।

লম্বুদা যে একটু লোক দেখানো আপত্তি না করলেন তা নয়। সেটা নেহাৎ-ই সাময়িক।

ইতিমধ্যেই চা এসে হাজির হল।

লম্বুদা প্রথম ডালমুট ফেললেন মুখে। গোল গোল চোখ করে ডালমুট চিবুতে চিবুতে বললেন, এ কী আর ডালমুট। ডালমুট খেয়েছিলাম সেবার ইংল্যান্ডেশ্বরীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। আ-হা, তার স্বাদের কথা ভাবলে এখনও আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি ঠোঁট চেপে মৃদু হাসলেন।

ইন্দ্রজিৎ আর জিহ্বা সংযত করতে পারল না! সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে উঠল, রাজকীয় ব্যাপার যখন ডালমুটের ডালগুলো কী সোনার ছিল লম্বুদা?

রাইট ইউ আর। লম্বুদা কণ্ঠস্বর এক পর্দা ওপরে তুললেন! সোনা-মুগের ডালই ছিল কিন্তু সেটা তো আমার বক্তব্য নয়। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল গিয়ে ইংলিশ আর বেঙ্গলী প্রিপারেশনে আকাশ পাতাল ফারাক! ওরকম বিচিত্র স্বাদের ডালমুট যে বয়সে মুখে পড়বে, সেই বয়সের নড়চড় হবে না। বন্ধ ঘড়ির মতোই কাঁটা স্থির হয়ে থাকবে।

লম্বুদা ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালেন।

ইন্দ্রজিতেরও জিদ চেপে গেল। লম্বুদার উদ্দেশে বলল, আমাদের ভাগ্যে তো আর ওই ঐতিহাসিক ডালমুট জুটবে না। আপনি যদি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেন, শ্রবণেন অর্দ্ধ ভোজনম্ হয় আর কি।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বলব বৈকি! লম্বুদা গোগ্রাসেই ডালমুটগুলো নিঃশেষ করলেন। চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, এই তো সেদিনের কথা। দেখতে দেখতে কতগুলো বছর কেটে গেল।

ইংল্যাণ্ডের রাণীর রাজ্যাভিষেক, বুঝতেই পারছ কি এলাহি ব্যাপার।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। আমিও সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হাজির হয়েছি ওখানে।

যথাসময়েই রাজকীয় প্রথায় রাণীকে আহ্বান জানানো হল এই অনন্যসাধারণ ভোজসভায় যোগদানের জন্য। বিশ্বের সম্মানীয় ব্যক্তিদের সাথে তাঁর পরিচয় করে দেওয়া হবে।

যথারীতি পরিচয় পর্ব শেষ হতে রাণী সকলকে সেই ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

সে কি এলাহি ব্যাপার। নিমন্ত্রিতদের সুবিধার জন্য সব দেশীয় খাবারই সেখানে রাখা হয়েছে। যাতে আপন আপন রুচি মতোই সকলে খেতে পারেন। ভারতীয় খাবারের

সমাবেশ হয়েছে যেখানে, খুঁজে খুঁজে সেখানেই হাজির হলাম। সিঙ্গী মাছের ঝোল থেকে শুরু করে মুরগী মসল্লম—সবই আছে। কি খাই সেটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। একবার মনে হচ্ছে বাংলা খানা খাই, পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে ও তো রোজই খাই। তার চেয়ে পাঞ্জাবি খানা খাই। আবার মনে হচ্ছে— মেনু নিয়ে যখন বিব্রত ঠিক সেই মুহূর্তে ডালমুটটা পড়ে গেল সামনে। ডালমুট আমার চিরকালের প্রিয়। ডালমুট পেলে আমি দুবেলা ভাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারি।

অতএব নির্বিচারে এক চামচ ডালমুট মুখে পুরে দিলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল।

লম্বুদা কয়েক সেকেণ্ড চোখ পিট পিট করলেন। হ্যাঁ, ডালমুট মুখে দেওয়া মাত্রই মুখটা কখনও ঝাল, কখনও মিষ্টি, কখনও টক, কখনও তেতো আবার কখনও নোনতা হয়ে যেতে লাগল।

একসঙ্গে এতরকম টেস্টের ডালমুট কখনও খাইনি। বেয়ারাকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, এই ডালমুট কোন দোকানের বলতে পার?

সে বড় বড় চোখ করে বললে, এ জিনিষ দোকানে পাবেন কোত্থেকে? খাস রাজবাড়ীর পাকঘরে তৈরী। রাজপ্রাসাদের টি টেবিলে এই ডালমুট থাকে।

আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। প্রায় পাঁচশো গ্রামের মতো ডালমুটই খেয়ে ফেললাম সেদিন। লম্বুদা নীরব হয়ে পা নাচাতে শুরু করলেন।

পাঁচশো গ্রাম ডালমুট খেলেন... বিপ্লব অচৈতন্য হবার ভান করে ঢলে পড়ল চেয়ারের হাতলে।

লম্বুদা আড়চোখে তাকালেন সেদিকে। মুখের ভেতর থেকে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ব্যাঙ ভাবে ডোবাই বুঝি জগৎ! আর ডোবার ভেতরে যা আছে সেটাই বোধহয় জগতের ঐশ্বর্য।

কিন্তু ডোবার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে এটা তাদের বিশ্বাস করানোই শক্ত। অবশ্য কোনওদিন যদি মুখ বাড়ায় দেখতে পাবে ঐশ্বর্যভরা অপর জগৎকে! লম্বুদা বিপ্লবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই কথাগুলো বলে উঠলেন এবং পুনরায় চোখ বুজিয়ে ধূম পানে মন দিলেন।

লম্বুদা সাধারণত উত্তেজিত হন না। তাঁকে জবরদস্তি উত্তেজিত না করার জন্য আমরা সকলেই বিপ্লবকে ইশারা করলাম।

বিপ্লব অবশ্য সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

লম্বুদা চোখ বুজিয়ে বসে গুণ গুণ করে কি যেন একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন।

এবার সকলেই তাকাল ইন্দ্রজিতের দিকে। আমাদের আর্জিটা বুঝতে তার কোনই অসুবিধা হল না। সঙ্গে সঙ্গেই খুক খুক করে দু'বার কাশল। লম্বুদার কানের কাছে

মুখটা নিয়ে গিয়ে বলল, এবার আপনার ঐতিহাসিক ঘটনাটা কি আমাদের উপহার দেবেন?

ঐ-তি-হা-সিক? লম্বুদা বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন। পরমুহূর্তেই একগাল হেসে বললেন, হ্যাঁ তা বলতেই পার। অবশ্য না শুনে নয়। আমি বলছি। তোমরা শোন তারপর বলবে এটা ঐতিহাসিক কি না?

লম্বুদা নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন। আমরা ধৈর্য ধরে মুহূর্ত গুণতে লাগলাম।

ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা যথারীতি ঘুরেই চলেছে। ন'পাক শেষ করে দশ পাক ছুঁতেই লম্বুদা সরব হলেন। তা বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। তখন আমি সবে তারুণ্যে পা দিয়েছি। রক্ত চনমন করছে।

মনে হাজার রকম সখ। তারমধ্যে অবশ্য শিকারের সখটাই বেশী। কোথায়ও বাঘ ভাল্লুকের গন্ধ পেলেই হল, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে দৌড়ই। একটা গুলিই যথেষ্ট। কদাচিৎ আমাকে দুটো ছুঁড়তে হয়।

অনেকদিন শিকারে বেরোইনি। হাতটা কিছুদিন ধরেই নিস্ পিস্ করছিল।

হঠাৎ একদিন সুন্দরবন ব্যাঘ প্রকল্পের ডিরেক্টর মিঃ কল্যাণ চক্রবর্তী আমায় ফোন করলেন। যথারীতি কুশল বিনিময়ের পর বললেন, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমরা আপনার শরাণাপন্ন হচ্ছি। যদি দয়া করে সাহায্য করেন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। দেশের কাজ করব এ আর বলার কি আছে। এখন বলে ফেলুন কি করতে হবে—

মিঃ চক্রবর্তী বললেন, ঝিলার জঙ্গল থেকে একটা নরখাদক বাঘ নিয়মিত নদী পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে গোরু ছাগল তো খাচ্ছেই। গত সপ্তাহে তিনজন গ্রামবাসীরও ঘাড় মটকে দিয়ে গিয়েছে।

এ ব্যাপারে অনবরত অভিযোগ আসছে গ্রামবাসীদের তরফ থেকে আমাদের দপ্তরে। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি জনস্বার্থে বাঘটিকে অবিলম্বে মেরে ফেলা দরকার। কারণ রক্তের স্বাদ একবার যখন সে পেয়েছে, তার স্বভাব পাল্টানো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। এই ধুরন্ধর বাঘটিকে আপনি যদি মারতে পারেন, আমরা নগদ পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেব ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেঘ না চাইতেই জল। এমন সুযোগ ছাড়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। সঙ্গে সঙ্গেই আমি টোপ গিললাম।

মিঃ চক্রবর্তী আমায় সবরকমের সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হলেন এবং এও বললেন, নদী পার হয়ে ঝিলার জঙ্গলে আপনার যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটা লঞ্চ দেওয়া হবে আপনাকে।

আমি সানন্দেই তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ এটা আমার কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগই মনে হল।

মিঃ চক্রবর্তী আমায় তাঁর গাড়ীতে লিফ্‌ট দিলেন চেকপোস্ট পর্যন্ত। সামনেই ঝিলা নদী, জোয়ারে তখন ফুঁসছে।

আমি গাড়ী থেকে নামামাত্রই সে খবর রটে গেল সারা গ্রামাঞ্চলে। স্থানীয় অধিবাসীরা এসে আমায় ঘিরে ধরল। বাঘটির ব্যাপারে সকলেই উদ্বিগ্ন। কেউ বললে আমার গোরু খেয়েছে, কেউ বললে আমার শুয়োর খেয়েছে, কেউ বললে, আমার ছাগল খেয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাদের ছেলে মেয়ে খেয়েছে তারাও অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের কাহিনী আমায় শুনিয়ে বাঘটির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা জানাল।

সকলের কথাই আমি মন দিয়ে শুনে বললাম, দেখি আমি কী করতে পারি। তবে আমার একার দ্বারা তো সম্ভব নয়। অচেনা অজানা জায়গা তোমাদের সাহায্যও প্রয়োজন।

বাঘ আমিই মারব। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে এই অভিযানে থাকতে প্রস্তুত অবিলম্বে জানাও।

প্রস্তাবটা করামাত্রই গ্রামবাসীদের ভীড় হালকা হতে শুরু হল। কাজের কথা মনে পড়ে যেতে একে একে সবাই এদিক ওদিক সরে পড়তে লাগল।

শেষ পর্যন্ত টিকল তিনজন। অধীর, পরান আর অটল।

অধীর মণ্ডলের বয়স কুড়ি কি বাইশ। সামনেই তার বাসা। বাসায় বিধবা মা আর ছোট বোন আছে।

পরান ও অটল দুই খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই এবং দুজনেই খুব শিকারে উৎসাহী।

মিঃ চক্রবর্তী সেখানে হাজির ছিলেন। ওদের তিনজনের নাম ঠিকানা টুকে নিয়ে বললেন, তোমরা লম্বুবাবুকে সাহায্য কর। এজন্য মোটা পারিশ্রমিক মিলবে।

ওরা সকলেই সাগ্রহে সম্মতি জানাল।

লঞ্চ তৈরীই ছিল। সকলে মিলে লঞ্চে চড়ে আমরা ঝিলা নদী পেরিয়ে ঝিলা ব্লক প্রান্তে উপস্থিত হলাম। কয়েক'শ গজ দূরেই গরাণ আব গেঁউয়া গাছের নিবিড় জঙ্গল শুরু হয়েছে।

মিঃ চক্রবর্তী বনের গভীরে না গেলেও সীমারেখা থেকেই বনের পরিধি, গভীরতা, বাঘের আস্তানা এবং কোনপথে বাঘ সাধারণতঃ যাতায়াত করে সে সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনালেন এবং বাঘ শিকারের জন্য মাচাটা কোথায় বাধা উচিত

সে সম্পর্কেও নির্দেশ দিলেন।

মোটামুটি জরীপের কাজ সেরে আমরা লঞ্চেই ফিরলাম। তবে লঞ্চে থাকতে ইচ্ছা হল না।

রাতটা অধীর মণ্ডলের বাড়ীতেই কাটাব ঠিক করলাম। মিঃ চক্রবর্তী অবশ্য তাঁর কোয়ার্টারেই ফিরে গেলেন।

রাতটা অধীরের বাড়ীতে ভালোই কাটল। বজ্জাত বাঘটা মারার দায়িত্ব আমি নিয়েছি শুনে আমাকে প্রায় দেবতার মতোই তারা আদর আপ্যায়ন শুরু করল।

সকাল হতেই আমরা চারজন লঞ্চে চড়ে গন্তব্যস্থলে যাত্রা করলাম। লঞ্চে নদী পেরোতে আর কতক্ষণ লাগে। আমরা যথাসময়েই ওপারে গিয়ে হাজির হলাম। যদিও সূর্য তখন অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে, কিন্তু বনের ভেতর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

আমরা বনের বেশ কিছু গভীরে গিয়ে মাচা বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সঙ্গীদের মধ্যে অধীরই আমাকে বেশী সাহায্য করতে লাগল। মাচা বেঁধে জলখাবার ও শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ওপরে তুলে দিয়ে বললে, আর কী করতে হবে বলুন—

আমি বললাম, কিচ্ছু না। যা করেছ যথেষ্ট। এত ঘটা করে আমি জীবনে কখনও বাঘ মারিনি।

সেদিন রাতটা মাচাতেই কাটল। মাচাটা বাঁধা হয়েছিল ভালোই কিন্তু উচ্চতা কম হয়ে যাওয়ার জন্য অসুবিধাই হচ্ছিল। বেশী দূর লক্ষ্য যাচ্ছিল না। অসুবিধার কথাটা অধীরকে বোঝাতে, সে বলল, অত বড় বাঁশ যোগাড় করাই তো মুশকিল। জঙ্গলের ভেতর থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে এখন যাওয়া তো বিপজ্জনক। বাঘ শিকার করতে গিয়ে শেষকালে কি আমরাই বাঘের পেটে যাব নাকি? একমাত্র উপায় হল নদীর ওপার থেকে দেখেশুনে বাঁশ নিয়ে আসা। কিন্তু এই ছোট লঞ্চে করে কি তা আনা সম্ভব—ভেবে দেখুন।

আমি আর অধীরকে চাপ দিলাম না। বললাম, ঠিক আছে মাচা উঁচু করার আর প্রয়োজন নেই। পাশেই যে বেলগাছটা রয়েছে, ওটার মাথায় উঠলেও আমার কাজ হয়ে যাবে। তোমরা তিনজনে বরং মাচার ওপরে থাক। দরকার হলেই আমি ওখান থেকে তোমাদের ডেকে নেব।

পরান আপত্তি জানিয়ে বললে, বেল গাছের মাথায় রাত কাটাবেন কি করে। গাছের ওপরে কি শোওয়া বসার জায়গা আছে?

আমি বললাম, সে জন্য চিন্তা নেই। গাছের মাথায় উঠে কিছু ডালপালা ছেঁটে ফেললেই হবে। বড়জোর দু'রাত। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

আমার কথা শুনে অধীরের মুখ শুকিয়ে গেল। কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে

বললে, কী বলছেন স্যার কাল না ভূতচতুর্দশী। এই তিথিতে কেউ কখনও বেলগাছে চড়ে রাত কাটায়! ভূতের পাল্লায় পড়ে শেষকালে বেঘোরে প্রাণ হারাবেন নাকি?

শুনে আমি হো-হো-হো করে হেসে উঠলাম। ভূ—ত! ধ্যুৎ! ভূত পুত আমি মানি না। ওজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না! তুমি বরং গাছের ডালপালাগুলো কাটবার ব্যবস্থা কর। আমি তো ওসব ব্যাপারে খুব অভ্যস্ত নই।

আমার কথা শুনে অধীরের প্রায় হৃৎকম্প উপস্থিত হল। সে হাতজোড় করে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে, সাহেব এখানকার ভূতেদের আপনি চেনেন না। এরা ভয়ানক বজ্জাত। যার পেছনে লাগবে তাকে গ্রাম ছাড়া করে ছাড়বে। দয়াকরে এ ব্যাপারে আমাদের জড়াবেন না। ভিটে ছেড়ে আমরা কোথায় যাব?

অধীরের অবস্থা দেখে আমার করুণা হল। পরান ও অটল মুখ ফুটে কিছু না বললেও, ওরা যে অধীরেরই দলে, সেটা তাদের হাবভাব থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। অযথা ওদের বিব্রত না করে বললাম, ঠিক আছে তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না! আমি নিজেই সব করে নিচ্ছি। ভূত চাপলে আমার ঘাড়েই চাপবে।

গাছে উঠে আমি নিজেই কুড়ুল দিয়ে ডালপালা ছেঁটে বসার জায়গা করতে লাগলাম। ওর দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার। দুটো মোটা ডাল কাটতেই সারা দুপুর কেটে গেল এবং বিকেলে বেশ ক্লান্ত লাগতে লাগল।

গাছ থেকে নামতে অধীর হাত কচলাতে কচলাতে বলল, সাহেব আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমার বাসায় চলুন। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে এখানে আসবেন। ওটাও তো প্রয়োজন।

অধীরের প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখান করতে পারলাম না। ও বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রাজী হয়ে গেলাম। লঞ্চের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল।

নদী পার হয়ে যথারীতি অধীরের বাসায় হাজির হলাম। হাত পা ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর, খেতে বসে দেখি এলাহি আয়োজন করেছে তার মা। মুরগীর ঠ্যাঙই দিয়েছে গুণে গুণে দশটা। আমি একটু ইতস্তত: করতে অধীরের মা বলল, আমরা গরীব মানুষ। কি আর খাওয়াব তোমাকে। চাষের মুরগীর মাংস আর গোরুর দুধের ক্ষীর করেছি। পেট ভরে খেয়ে নাও বাবা। রাত কাটাতে হবে তো গাছে।

দুটো মেনুই আমার প্রিয়। তাছাড়া এমন টাটকা জিনিষ আর পাব কোথায়? বেশ তারিয়েই খেতে লাগলাম। রান্নাটাও আবার উত্‌রে গিয়েছিল—লম্বুদা হঠাৎ একটু ছোট্ট ঢেকুর তুলে বললেন এখনও ঢেকুর ওঠে অবশ্য সেই ভোজের কথা মনে পড়লেই। লম্বুদা মৃদু হাসতে হাসতে তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন

চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে।

এটাই পৃথিবীর সর্বশেষ আশ্চর্য কিনা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল বিমল। ইন্দ্রজিৎ বাধা দিল। তার কানে মুখটা লগিয়ে ফিস ফিস করে বললে, ঘাঁটাসনি। এখনি আর এক ইতিহাস শুরু হয়ে যাবে!

দু'একটা ঢেকুর যদি একান্তই ওঠে উঠতে দে। ঢেকুর আটকে দিলে সবকিছুই আটকে যেতে পারে।

বিমলের প্রশ্ন করা থেকে নিবৃত্ত হওয়াটা লম্বুদার চোখ এড়াল না। তিনি বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

দুমিনিট এইভাবেই কাটল। হঠাৎ মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটিয়ে বললেন, খাওয়ার শেষে পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে আবার লঞ্চে চেপে বসলাম! ওরাও তিনজনে আমার সঙ্গে লঞ্চে উঠল। লঞ্চে পৌঁছল বটে, কিন্তু ওরা তিনজনে কেউই লনচ্ ছেড়ে নামতে চাইল না।

কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ওরা তিনজনেই আমতা আমতা করতে লাগল। পরানই প্রথম মুখ খুলল! বলল, আপনি বেলগাছ কেটে ভাল কাজ করেন নি সাহেব বিশেষ করে এরকম একটা মারাত্মক তিথিতে।

কিছু মনে করবেন না। আমরা লঞ্চে থাকব। আপনার দরকার পড়লেই আমাদের ডাকবেন। আমি দেখলাম সংস্কারটা মানুষের মনের ব্যাপার। এ ব্যাপারে জোর করার কোন মানে হয় না। কাজের চেয়ে এতে অঘটনের আশঙ্কাই বেশী। ওদের লঞ্চে রেখে আমি একাই ডাঙ্গায় উঠলাম।

সূর্য অস্ত গেলেও এখনও কিছু আলো রয়েছে। হয়তো বা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে ঢেকে যাবে চারদিক। যা কিছু করার এখনি করতে হবে।

বাঘের পায়ের ছাপের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম এদিক ওদিক। সরকারী নারকেল বাগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, গরাণ গাছের ঝোপের ভেতর সবে দু-পা এগিয়েছি হঠাৎ উৎকট একটা গন্ধ নাকে এল।

গন্ধটা যে কোনও পচনশীল জিনিষের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই কারণে কৌতূহলটাও বেড়ে গেল। একটু সাহস করে সেই গন্ধের সূত্র ধরেই এগিয়ে গেলাম। ঘন গাছের জন্যেও বটে, আলোর স্বল্পতার জন্যেও বটে বস্তুটাকে দেখা যাচ্ছিল না। ব্যাগ থেকে টর্চটা বার করে জ্বালাতেই চমকে উঠলাম। একটা হরিণের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে সেখানে।

এটা যে কোন বাঘের কাজ সে বিষয়ে নিশ্চিত। বিশেষ করে তার ঘাড়ে যে কামড়ের দাগ রয়েছে বাঘ ছাড়া আর কিসেরই বা অমন কামড়ের দাগ হতে পারে।

দুষ্কর্মটা কবে নাগাদ হয়েছে মোটামুটি আঁচ করার জনাই ঝোপের ভেতর পা

বাড়ালাম। কাছাকাছি পৌঁছে তার উপর টর্চের আলো ফেলতেই দেখলাম—যা অনুমা করেছি মোটামুটি তাই! বড় জোর একদিন কি দু'দিন আগেই ঘটনাটা ঘটেছে। কার রক্তটা তখনও পুরোপুরি শুকোয় নি এবং তার ওপরে মাছি বসছে।

হরিণের ঘাড়ে যে কামড়ের দাগ রয়েছে, তা থেকে মোটামুটি বাঘের আকৃতি অনুমান করা যায়। কম করে সাত আট ফুটের কম তো নয়ই। বেশীই হবে। তা কাণ্ডটি যে ওই বাঘটির তাতে কোনই সন্দেহ রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটাকে মারা জন্য একরকম প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম মনে মনে।

আশে পাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলছি এলোমেলো দু'চারটে পায়ের দাগও চোখে পড়ছে। কিন্তু সেগুলি বিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্দেশ্য কিছুই সফল হল না।

হতাশ হয়েই ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। রাইফেলটা ঘাড়ে নিয়ে ডালে ডালে পা দিতে দিতে বেলগাছ শীর্ষে উঠে গেলাম এবং চোখে বায়নাকুলারটা লাগিয়ে চারদিকে নজর রাখতে লাগলাম।

আঁধার নামলেও এখন পুরোপুরি গ্রাস করেনি। জন্তুজানোয়ারের মুখ চেনা না গেলেও প্রতিকৃতি চেনা যাচ্ছে। তবে নদীর ওপারে গ্রামগুলোতে এখনি হাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে চলতে ফিরতে দেখা যাচ্ছে মানুষকে।

পশ্চিম প্রান্তে একটি মন্দির থেকে কাঁসর ঘন্টার শব্দ ভেসে আসছে। সম্ভবতঃ সেখানে সন্ধ্যারতি হচ্ছে।

চোখের সঙ্গে সঙ্গে কানকেও সজাগ রাখতে হচ্ছে আমার। কারণ অনেক সময়েই বাঘের ঝোপঝাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করেই শিকার ধরতে এগিয়ে যায়। এ-কাজে বিলম্ব হওয়া মানেই শিকার ফসকে যাওয়া।

ওদিকে লঞ্চের মধ্যে এতক্ষণ একটা বাতি জ্বলছিল। যে কারণেই হোক বাতিটা নিভে গিয়েছে। কিন্তু জ্বালাবার আর কোনরকম চেষ্টা চোখে পড়ছে না। হয় বাতিটা আপনিই নিভে গিয়েছে আর না হয় ওরা নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়তে ওদের কোনই অসুবিধা নেই। কারণ রাতের আহারের পাট তাদের অনেক আগেই মিটে গিয়েছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ কি।

তাছাড়াও বেল গাছে যখন উঠবে না বলেই ওরা জিদ ধরেছে অযথা ওদের জাগিয়ে রেখে লাভ নেই।

রাত ক্রমশঃ বাড়ছে।

আমার উত্তেজনাও বাড়ছে ধিকি ধিকি করে। কোথাও কোনও শব্দ শুনলেই চমকে উঠছি। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরছি পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার নিজেকে সামলে নিচ্ছি।

যে বেলগাছের মাথাতে আমি চড়ে বসেছিলাম, তার তলাতেই হঠাৎ খড় খড় করে একটা শব্দ হল। আমি উৎকীর্ণ হয়েই বসেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই চোখে বায়নাকুলার রাখলাম কিন্তু দর্শনীয় কিছুই চোখে পড়ল না।

তবে নীচে অনেক গাছের শুকনো পাতা খসে পড়েছিল।

তার ওপর দিয়ে সাপ জাতীয় কিছুর চলা ফেরাই যে এই শব্দের উৎস, অনুমান করে আবার নজর ফেরালাম।

কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। অনুরূপ শব্দ আবার ভেসে এল গাছের তলা থেকে। এবার নীচের দিকে তাকাতেই চক্ষুস্থির। গাছের মাথা থেকে যে বেলডালগুলো হেঁটে ফেলে দিয়েছিলাম, সেগুলো মধ্যে যেটা পুষ্ট সেই ডালটা ভুঁয়েতে আপনি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার বটে। চোখের ভুল মনে করে চোখ দুটো রগড়ালাম। কিন্তু চোখ খুলে পূর্বের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখলাম।

টর্চটা গলাতেই ঝোলানো ছিল। টর্চের আলো তার ওপরে ফেললাম। ঠিক তাই। জীবজন্তু যেমন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়, গাছের ডালটাও তেমনি চলে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ মনে হল বাতাসে এটা হচ্ছে না তো? কিন্তু অত মোটা ডাল নাড়াবার মতো জোরাল বাতাসই বা কোথায়?

এবার মনে কিঞ্চিত বিস্ময়ের সঞ্চার হল। এমন একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখার মতো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না তখন আমার।

নদীর ওপারে গ্রামে আলোর নামগন্ধ নেই। গাঢ় অন্ধকার। মাঝে মাঝে কেবল কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। এই অন্যমনস্কতার সুযোগে বাঘ যাতে চোখে ধুলো দিয়ে না পালায় সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছে।

দুদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা ক্রমশঃ আমার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। ভাবলাম লঞ্চে তো ওরা তিনজন আছেই। ওদের ডাকলেই তো হয়।

আবার পরমুহূর্তেই মনে হল চেঁচামেচি করলে, বাঘটা যদি কাছাকাছি কোথাও থেকেও থাকে সাবধান হয়ে যাবে। আর সে এধারেই মাড়াবেনা। সব পরিশ্রমই বিফল হবে।

অতএব চীৎকার না করাই বাঞ্ছনীয় এই মুহূর্তে।

হাতে রাইফেলটা ছিল। কী করি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল গুলি ছুঁড়েও তো থামিয়ে দিতে পারি। রাইফেল হাতে রয়েছে যখন শুধু ট্রিগার টিপলেই হল! দেখিই না! ট্রিগার টিপলামও শেষ পর্যন্ত। হাতের রাইফেল গর্জে উঠল। খালি একঝলক ধোঁয়া!

নীচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি টর্চের আলো ফেললাম। কেল্লা ফতে। গুলিটা বিঁধেছে সরাসরি ওটা
গায়ে। কারণ ডালের একাংশ পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়। ডালটা আর নড়াচড়াও করছে না। স্থির হয়েই পড়ে আছে মাটিতে

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে খোশমেজাজে ধূমপান করতে লাগলেন।

এরকম একটা উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে লম্বুদার নীরবতা যথেষ্টই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল। আমরা সকলেই মৌখিক অভিব্যক্তিতে তা কিছুটা প্রকাশ করে লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লম্বুদা কিন্তু আমাদের এই অস্বস্তিকর অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখালেন না। যেন কিছুই ঘটেনি এরকম একটা ভাব দেখিয়ে পরম নিশ্চিন্তেই বসে রইলেন।

আবার ধৈর্য প্রতিযোগিতো শুরু হল। আমরা স্থির চিত্তেই তাঁর মুখ খোলার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগলাম।

লম্বুদা নীরব, নিঃশব্দ।

চুরুটটা ক্রমাগতই পুড়ে চলেছে। এভাবে পুড়লে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো চুরুটের আগুন তাঁর মুখ স্পর্শ করবে।

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম চুরুটের সুখ টানটা দিয়েই হয়তো তিনি আবার মুখর হবেন। কিন্তু আমাদের সে অনুমানও শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল প্রমাণিত হল। তিনি চুরুটের কেস খুলে আর একটি নতুন চুরুট বার করলেন এবং নেড়ে চেড়ে তার গঠন পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মুখে কেউ কিছু প্রকাশ না করলেও, এবার সবাই উসখুশ করতে শুরু করল কারণ সত্যি সত্যিই দ্বিতীয় চুরুটটা যদি তিনি সেবন করতে শুরু করেন, সেটা শেষ হতে হতে হয়তো বা—

কিন্তু লম্বুদা যে খুব একটা উদাসীন নন, সেটা প্রমাণ করলেন হঠাৎ মুখর হয়ে।

দেশলাইয়ের ওপর চুরুটটিকে টানটান করে শুইয়ে রেখে বললেন, গাছের ডালটার নড়াচড়া স্থির হতে, আমি পুনরায় আমার আসল উদ্দেশে মনোনিবেশ করলাম।

রাত ইতিমধ্যে আরও গভীর হয়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম জীবজন্তুর কণ্ঠস্বরও কানে আসছে।

কোন কোন চীৎকারকে বাঘের ডাক বলে মনে হলেও, বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তবে মনে মনে কামনা করছি যেন তা বাঘেরই হয়।

দুটো বাজল। তিনটে বাজল। সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাৎ 'গ-র-র-র' একটা শব্দ কানে এল।

অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা না গেলেও, চোখে বায়নাকুলার লাগালাম। শব্দটা যেখান থেকে আসছিল সেই স্থান বরাবর তাকাতেই মনে হল ঝোপটা নড়চে। তবে

কারুরই অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না।

ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাঁচ মিনিটও কাটেনি ঝোপের ডালাপালা সরিয়ে বেরিয়ে এল দীর্ঘ এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বেশ খোশমেজাজেই এগুতে লাগল যেদিকে হরিণের খণ্ডিত দেহটা পড়েছিল।

হরিণটাকে যে এই বাঘটাই খেয়ে গিয়েছিল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। আজ হয়তো বা নতুন শিকার কিছু মেলেনি। তাই বাকি অংশটা উদরসাৎ করতে এসেছে।

একবার মনে হল বাঘটাকে গুলি করি কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল এই বাঘটাই যে সেই বাঘ এমন কোনও প্রামাণ নেই। সেটা সুনিশ্চিত না হয়ে অযথা একটা বাঘ শিকার করার কোন মানেই হয় না। তাতে সুনামের চেয়ে দুর্নামের সম্ভাবনাই বেশী। অতএব অপেক্ষা করতেই হবে।

প্রায় একঘণ্টা কাটার পর বাঘটা বেরিয়ে এল জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে। অন্ধকারে তার আসল রূপ দেখা না গেলেও, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতোই জ্বলছিল।

আমার গাছ থেকে তার দূরত্ব বেশী হলে পঞ্চাশ গজের মতো। বাঘটা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগল নদীর দিকে। নদীর পথ ধরতে আমি আশ্বস্ত হলাম। এখন আর কোনও সংশয় রইল না আমার মনে। বায়নাকুলারটাও বাগিয়ে ধরলাম দুহাতে।

বাঘটা নদী বরাবর এগিয়ে গিয়ে ঘাড় নীচু করে জল খেল কিছুক্ষণ। তারপর যে পথ দিয়ে সে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে গেল।

যে কোনও বাঘই তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খেতে আসতে পারে। অগত্যা আমায় রাইফেল নাবাতে হল। বাঘটাও পরম নিশ্চিন্তে হারিয়ে গেল বনের অন্ধকারে।

আবার প্রতীক্ষা শুরু হল। তবে বেশীক্ষণ নয়। হঠাৎ গাছের তলা দিয়ে কটা শিয়াল ডাকতে ডাকতে ছুটে পালিয়ে যেতে আমি তৎপর হয়ে উঠলাম।

বাঘকেই ওরা বেশী ভয় করে। অতএব তাদের এই আচরণ যে বাঘের আবির্ভাবের ইঙ্গিত তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই!

বায়নাকুলার চোখে লাগালাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না। তবে ছায়ার মতো কিছু জীবজন্তুকে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যাচ্ছে।

সকৌতূহলে আমি যখন এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঘটা বেরিয়ে এল পাশের ঝোপ থেকে এবং বন কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল।

বাঘটা যে বেশ বড় সড় এবং তেজী সেটা তার ডাকেই ধরা পড়ল। সে সোজাই

এগিয়ে আসতে লাগল আমার গাছ বরাবর।

গাছের কাছাকাছি এসে সে ওপর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বারকয়েক দেখে তার চারপাশে পাক খেতে লাগল।

এতো সমানাসামনি বাঘ কোন দিনও পাইনি; স্বভাবতঃই হাত নিস্ পিস করে উঠল। কিন্তু উপায় নেই।

এবার বাঘটা গাছের পাশে এসে একমুহূর্ত দাঁড়াল এবং সশব্দে ঘ্রাণ নিতে লাগল।

আমি যে মগডালে আস্তানা গেড়ে ছিলাম সেখান থেকে আমার দেহের ঘ্রাণ পাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

বাঘটা ঘ্রাণ টানতে তাই আমি একটু ভাবনায় পড়লাম। আমার গন্ধ পেয়ে সে যদি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা গাড়ে, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুলি ছুঁড়তে হবে।

বাঘটা মিনিট পনেরো কুড়ি সেখানে ঘোরাফেরা করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মুহূর্ত গুনছি। এতে কাছাকাছি বাঘের দেখা পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার।

ওদিকে লঞ্চের ভেতর তখন অন্ধকার। ওরা বাঘ শিকার করতে এসে বেশ নাক ডাকিয়েই ঘুমোচ্ছে।

বাঘটা গিয়ে নদীর তীরে দাঁড়াল এবং গলা উঁচু করে কি যেন দেখতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত জলে নাবল বাঘটা। সাঁতরিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল বিপরীত দিকে।

আমি যে কি খুশী হলাম তা আর বলবার নয়। অর্থাৎ এই বাঘটাই যে নদী পেরিয়ে রাতারাতি অপকর্ম্মটি করে আসে সেটাই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। বাঘটা যদি তেমন দ্রুত গতিতে এগুতে আরম্ভ করে হয়তো বা রাইফেল-রেঞ্জের বাইরেই চলে যাবে। লঞ্চে করে তার পিছু ধাওয়া করলেও যেরকম জমাট অন্ধকার, আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।

কার্তুজ ভরাই ছিল। শুধু নিশানা করার জন্য যে সময়টুকু দরকার।

এক—দুই—তিন! অব্যর্থ লক্ষ্য। রাত কাঁপানো একটা চীৎকারে কেঁপে উঠল জলজঙ্গল। তারপর জল কেটে দ্রুত সাঁতরাবার ছপছপানি শব্দ।

আহত বাঘটা হয়তো ডাঙ্গাতেই ফিরে আসছে। রাইফেলে গুলি পুরে আবার আমায় প্রস্তুত হয়ে থাকতে হল।

বাঘটা সত্যি সত্যিই জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠল এবং টলতে টলতে জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগল।

আবার রাইফেল গর্জে উঠল। আবার চীৎকার—তবে আগেকার মতো নয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল!

দাড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাঘটা পড়ে গেল মাটিতে। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করতে গিয়েও থেমে গেলাম। আমার কাঁধটা অসম্ভব রকম ভারী হয়ে উঠেছে!

নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছে ভেবে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। বাঘের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখলাম।

কিন্তু সে অসুবিধা উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগল।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌছল মনে হল যেন একটা বিশ কিলো ওজনের পাথর ঘাড়ের ওপর কে চাপিয়ে দিয়েছে।

এখন বাঘের দিকে লক্ষ্য রাখতেই অসুবিধা হতে লাগল। ঘাড় সোজা করে বেশীক্ষণ থাকা যাচ্ছিল না।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার জন্য বাঘটাকে আর একবার গুলি করব ঠিক করেছিলাম কিন্তু এ অবস্থায় তা করতেও মন গেল না। বরং বাঘটা যদি পাল্টা আক্রমণ করে সেই ভয়েই ভীত হয়ে পড়লাম।

বাঘের মধ্যে অবশ্য কোনও সাড়া ছিল না। তার নিঃস্পন্দ দেহটা লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে।

এতক্ষণ কাঁধটাই কেবল ভারী ঠেকছিল। এবার শিরদাঁড়া বরাবর একটা মৃদু ব্যথা শুরু হল এবং মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করতে লাগল।

গাছের মগডালে বসে এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সঙ্গে যুঝতে যথেষ্টই অসুবিধায় পড়তে হল। কোনরকমে যদি একবার মগডাল থেকে মাটিতে পড়ি হাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু কিই-বা করার আছে। কাছেই বাঘের দেহটা যেভাবে পড়ে আছে নীচে নাবাটাও এখন যথেষ্ট বিপজ্জনক। বলা যায় না তো এটাও যদি বাঘের ছলনা হয়!

অগত্যা হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না। দেখতে দেখতে পাখী ডেকে উঠল চারদিকে। সূর্যের আলোও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল।

শহরে বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভূমিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। তাই মুগ্ধ হয়েই সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

সূর্যের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক বন্য জীবজন্তুর ডাক মিলিয়ে গেল, তেমনি অনেকে আবার ডেকেও উঠল।

বেলগাছের নিম্নাংশের একটা ডাল বেয়ে একটা বিষাক্ত কেউটে সাপ সড় সড়

করে নীচে নেমে গেল।

সাপটা যে জাতেরই হোক না কেন, তার সঙ্গে সহাবস্থান করেছি একথা ভাবতেও গা শিরশির করে ওঠে। অন্য সময় হলে হয়তো বা বীরোচিত কিছু একটা করেই ফেলতাম। কিন্তু তখন যা মনের অবস্থা ভগবানের নাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

এদিকে রাইফেলের গুলির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল তিন জনেরই। বাইরে আবছা অন্ধকার থাকার দরুন তারা আর কেউ সাড়াশব্দ করল না। মট্‌কা মেরেই লঞ্চের ভেতর বসে রইল।

দিনের আলো ফুটতে তবে তাদের সাড়া পেলাম। লঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে তারা বেলগাছের দিকে সকৌতূহলে তাকাতে লাগল।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি ইশারায় তাদের নিস্পন্দ বাঘটা দেখিয়ে দিলাম।

বাঘটা দেখামাত্রই ওদের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। ইশারায় প্রশ্ন করল বাঘটা মরেছে তো নাকি—

আমি বললাম, কাছে গিয়েই দেখ না।

আমন্ত্রণ জানাতে তবেই ওদের সন্দেহ ঘুচল। কারণ মিথ্যা বলে আমি যে তাদের জীবনের ঝুঁকি নেব না একথা তারা ভাল করেই জানত।

আমার কথা মতো তারা বেরিয়ে এল লঞ্চের ভেতর থেকে। অবশ্য খালি হাতে কেউই ছিল না। তিনজনের হাতেই লাঠি ও বল্লম ছিল। বাঘের কাছ বরাবর ওরা খুব সন্তর্পণেই এগিয়ে এল। অধীর মণ্ডল ছিল সামনে। পেছনে ছিল যথাক্রমে পরান আর অটল।

নিষ্প্রাণ বাঘের পিঠে ওরা পর পর কবার বল্লমের খোঁচা দিল। কিন্তু বাঘের কোনরকম সাড়া শব্দ মিলল না।

খুশীতে উথলে উঠল ওদের চোখ। ওরা তিনজনে সাহস ভরে এগিয়ে গেল বাঘের কাছে। বাঘের ইহলীলা সাঙ্গ হল কিনা যাচাই করতে।

বাঘ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হতে এবার তিনজনেই এগিয়ে এল আমার গাছের কাছে এবং আমাকে নীচে নামবার জন্য আহ্বান জানাল।

আমি দেখলাম আর গোপন করে লাভ হবে না। এখন সরাসরিই ওদের সাহায্য চাওয়া ভাল। ওরা গ্রামের মানুষ সহজেই আমার এই অসুবিধার কারণ উপলব্ধি করতে পারবে। সংক্ষেপে আমার আসুবিধার কথা ওদের বলে, গাছ থেকে নাবার ব্যাপারে ওদের সাহায্য চাইতেই ওদের তিনজনের মুখ ভয়ে পাংশুটে হয়ে গেল এবং ধীরে

ধীরে পেছু হটতে লাগল।

আমি চীৎকার করে বললাম, কী ব্যাপার তোমরা পালাচ্ছ কেন? আমার কি হয়েছে?

অধীর বললে, সাহেব আপনাকে অত করে নিষেধ করলাম ভূত চতুর্দশীর রাতে বেল গাছে উঠতে। আপনি তো কথাই শুনলেন না। বেলগাছে উঠলেন, বেলডাল কাটলেন। আবার বেলডাল লক্ষ্য করে গুলিও ছুঁড়লেন।

এখন যদি আপনার ঘাড়ে সেই বেলে-ভূত চেপেই থাকে, খুব কি অন্যায় করেছে?

এতক্ষণ আমি শারীরিক অসুস্থতা ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলাম। ওদের মুখ থেকে এ কথা শোনামাত্রই মনে হল, তাই তো এরকম একটা কিছু ঘটা তো অসম্ভব নয়। যা হোক অনুমানের ভিত্তিতেই অযথা মন খারাপ না করে শেষ পর্যন্ত নিজেই গাছ বেয়ে নীচে নাবতে শুরু করলাম।

ওরা ইতস্ততঃ করতে লাগল। অর্থাৎ আমাকে সঙ্গ দেওয়া আদৌ উচিত হবে কিনা এটাই ওদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

নদী পার হতে হব বলেই হয়তো বা ওরা পালাল না। আমার সঙ্গে বেশ বড়রকমের একটা ব্যবধান রেখেই ওরা লঞ্চের দিকে এগুতে লাগল।

লঞ্চে আমি উঠতে ওরা তিনজনেই পাইলটের আসনে আশ্রয় নিল এবং বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

ওদের হাবভাব আমার ভাল লাগল না। আমি খুব কম কথাই বলতে লাগলাম।

তবে, যেহেতু নদী পারের প্রশ্ন ছিল ওদের কিছুটা সমীহ করে না চলা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

এদিকে দ্রুত গতিতেই লঞ্চ চলতে শুরু করল।

ওপারে পৌঁছতে ওরা আমায় লঞ্চ থেকে নামতে নিষেধ করল এবং রোগ নিরাময়ে ডাক্তারের খোঁজে বেরুল।

ডাক্তার বলতে ওদের গ্রামে সেকালের এল. এম. এফ. রাধিকারঞ্জন বাবুই ভরসা। তাকে ডেকে নিয়ে এসে ওরা লঞ্চে তুলল।

তিনি আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন।

তারপর খস্ খস্ করে এক চিলতে কাগজে অ্যানাসিন ট্যাবলেটের নাম লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

এ রোগ যে অ্যানাসিনে সারবার নয়, সেটা আমার মনই বলল। আমি প্রেসক্রিপসানটা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম।

অধীর, পরান ও অটল নিজেরা ভূতের ভয়ে লঞ্চের ধারে না ঘেঁষলেও আমার ঘাড়ে ভূত চাপার খবরটা রটাতে ইতস্ততঃ করল না।

একরকম বাড়ী বাড়ী গিয়েই, সবার কানে ফিস ফিস করে খবরটা পৌঁছে দিয়ে

এল।

এটা টের পেলাম বেলা বাড়ার সাথে সাথেই দলে দলে গ্রাম্য বউ-ঝিদের, ছানাপোনা ট্যাঁকে নিয়ে এই লঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। তারা এসে একরকম ঘিরেই ফেলল লঞ্চটা।

তবে কেউই আমার কাছাকাছি এল না। ভুলবশতঃ কেউ এলেও তাকে ডেকে নিচ্ছিল মাতব্বরেরা।

এদিকে আমার শরীরের ভাবগতিক ভালো নয়। ঘাড়ের চাপ ক্রমশঃই বাড়ছে এবং বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অধীর বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল। ওকে ডেকে এক কাপ চা খাওয়ানোর কথা বলতেই, আচ্ছা দেখছি বলে সেই যে হাওয়া হয়ে গেল ঘন্টা খানেকের মধ্যে তার আর পাত্তা নেই।

আমি দেখলাম এরকম অসহায় অবস্থায়, লঞ্চে থাকার কোনই অর্থ হয় না। ভূতের ভয়ে যেরকম সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে, না খেতে পেয়ে শেষকালে আমিই মরে ভূত হয়ে যাব। কিন্তু আমি তো সে বান্দা নই—

নেমে পড়লাম লঞ্চ থেকে।

আমাকে নাবতে দেখে, কৌতূহলী জনতা কয়েকমিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

পরান চক্ষুলজ্জার খাতিরে পালাতে পারল না। বেশ ব্যবধান রেখেই আমাকে বলল, স্যার আপনার শরীর ভালো নয়। এই চড়া রোদ্দুরে বেরুলেন কেন?

আমি হাসলাম। আমি কি আর বেরিয়েছি, ভূতই আমাকে টেনে নামালো লঞ্চ থেকে।

আমি মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ী চললাম। খবরটা তো তাকে পৌঁছে দেওয়া একান্ত দরকার।

সে তেমন কিছু আপত্তি করল না। বরং ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডাইরেক্টর মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিয়ে যথেষ্টই সাহায্য করল।

মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর দূরত্ব বেশী নয়। ওখান থেকে মাইল চারেকের পথ। সাইকেল রিক্সায় বড়জোর মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগে।

আমার টুকিটাকি জিনিষপত্তর ওরাই তুলে দিল গাড়ীতে। আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলাম। শরীরটা তখনও বেশ খারাপ।

মিঃ চক্রবর্তী বাড়ীতেই ছিলেন। আকস্মিক আমার উপস্থিতিতে একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন, কি মশাই, খালি হাতে ঢুকলেন যে বড়। বাঘ কই? মেরে খেয়ে ফেললেন নাকি?

আমি হাসলাম। প্রায় সেইরকমই। তবে আপনার মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। মাংসটা আমি খেলেও মুড়োটা আপনার জন্যে এনেছি। আপনি তো মুড়ো খেতে ভালোবাসেন। বলুন ঠিক কি না?

মিঃ চক্রবর্তী খুবই পাকা লোক। আমার ইঙ্গিত বুঝেই তিনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। মৃদু হেসে বললেন, জানতাম এ কাজ একমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব!

মিঃ চক্রবর্তী নামেই বাঙ্গালী। আচরণে পাকা সাহেব। বেলা বারোটা বাজতে না বাজতে লাঞ্চে বসতে হল। খেতে খেতে বাঘ মারার গল্পই শুরু করলাম।

তিনি বেশ উৎসাহভরেই আমার অভিজ্ঞতা শুনছিলেন। কিন্তু ভূত প্রসঙ্গ উঠতেই মুখটা তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বলেন কি মশাই ভূত আপনার ঘাড়ে চেপে বসে আছে আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আমার ঘাড়ে চাপলে তো মশাই এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতাম!

মিঃ চক্রবর্তী কথা বন্ধ করে গোগ্রাসে ঝোল মাখা ভাত গিলতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম তিনিও ভয় পেয়েছেন। তা না হলে চামচ ফেলে হাত দিয়ে হঠাৎ খেতে শুরু করবেন কেন?

খাওয়া শেষ করেই তিনি ফোন করলেন, সুন্দরবন হেলথ সেন্টারের ডাক্তার কমল বিশ্বাসকে। বললেন, এখনি একবার আসুন। একটা সিরিয়াস কেস।

ফোন রেখে এক গ্লাস জল খেলেন। আমাকে বললেন, আপনি আর ঘোরাফেরা না করে ছাদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। দেখি ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে পরামর্শ করে কি করা যায়।

তিনি যে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। অযথা আর কথা না বাড়িয়ে আমি ছাদে উঠে বেড়াতে শুরু করলাম। এ ছাড়া আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না।

ইতিমধ্যেই ডাক্তার বিশ্বাস এসে হাজির হলেন। ঘাড়ে ভূত চাপার লক্ষণাবলী সম্পর্কে তিনি দীর্ঘক্ষণ অনুসন্ধান চালিয়ে বললেন, মেডিকেল সায়েন্সে তো ভূতে ধরা বলে কোনও রোগের নাম নেই।

এটাকে আমরা পাগলামিই বলি এবং সেই মতোই চিকিৎসা করে থাকি।

মিঃ দত্তের অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, এটাকে আমরা পাগলামির পর্যায়ই ফেলব এবং তারই চিকিৎসা করব।

আমি প্রেসক্রিপসান লিখে দিয়ে যাচ্ছি। তিনঘণ্টা অন্তর একটা করে পুরিয়া আর এক দাগ করে মিকশ্চার খাইয়ে দিন। ভূত তো দূরের কথা, তার ঠাকুর্দাও যদি এসে থাকে, ওষুধের গুঁতোয় ঘাড় ছেড়ে পিট্টান দেবে।

ডাঃ বিশ্বাস চলে যাবার পরেই মিঃ চক্রবর্তী ছুটলেন ওষুধ সংগ্রহ করতে। ডাঃ বিশ্বাসের চিকিৎসার ওপর তার যথেষ্ট আস্থা ছিল।

যথাসময়েই তিনি ফিরে এলেন ওষুধ নিয়ে এবং পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। পুরিয়াটা মুখে দিতে তেমন কিছুই টের পেলাম না বটে, কিন্তু মিকশ্চার মুখে দিতেই গা পাক দিয়ে উঠলো। উঃ রাম তেতো!

বমি হয় হয়, চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটোতে তবে সে ভাব গেল।

ওই মিকশ্চার মুখে দিতে আর ইচ্ছা করল না। বললাম, লোকে এতো জিনিষ মাথায় বহে বেড়ায়, আর আমি একটা ভূত বইতে পারব না? থাকুক ও আমার ঘাড়ে! খাওয়ানো দাওয়ানোর ঝঞ্ঝাট নেই যখন তখন আর চিন্তা কি। বড়জোর মাঝে মাঝে একটু আধটু বদমাইসি করবে এইতো—করুক, আমিও কি কম বদমাইস নাকি?

মিঃ চক্রবর্তী অবশ্য আমার মতে সায় দিলেন না।

ওষুধ বাতিল করতে তিনি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, মিঃ দাট মেডিকেল সায়েন্সে যখন আপনার বিশ্বাস নেই ওঝাকেই খবর দিই, কি বলুন? ওঝা ছাড়া আপনার ঘাড়ে চড়া ভূতকে কেউ নাবাতে পারবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমি অবশ্য আপত্তি করিনি।

লম্বুদা একমিনিট নীরবতা পালন করলেন। আমরা সকলেই উদগ্রীব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, শেষ পর্যন্ত ওঝাও এলো।

ছ ফুট দীর্ঘ, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে রক্তবসন, পায়ে খড়ম, কপালে লাল চন্দনের টিপ আর হাতে একগাছা ছড়ি।

আমি ছাদের ঘরে কৌচে গা এলিয়ে তন্ময় হয়ে হেডলী চেজের লেখা একটা ক্রাইম নভেল পড়ছিলাম।

সে কিন্তু আমাকে জানান না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ল এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ প্রশ্ন করল, স্যার ঘাড়ের কোন দিকে ভূতটা চেপেছে বলে মনে হচ্ছে...

উত্তর আমায় দেবার দরকার হল না। মিঃ চক্রবর্তীই আমার হয়ে সব উত্তর দিতে

লাগলেন।

ওঝা সব কথাতেই মাথা ঝাঁকাতে লাগল। এ পর্ব শেষ হতে সে আমার দিকে কট কট করে তাকিয়ে রইল।

প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খ্যাঁক্ করে মুখে একটা শব্দ করে বললে, হুম যা ভেবেছি তাই। এ সাধারণ ভূত নয়। খুব বজ্জাত প্রকৃতির বলেই মনে হচ্ছে। আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল এই মাত্র। চিনতে পারামাত্রই জোড়া পায়ে লাথি দেখাল আমাকে।

দাঁড়াও! লাথি দেখানো বার করে দিচ্ছি! জানিস আমার পরিচয়! আমরা সাত পুরুষের ওঝা। কম্ম করে অন্ততঃ বিশ হাজার ভূত মানুষের ঘাড় থেকে ভূঁয়ে নামিয়েছি। আর তুইতো কোন ছার।

যা হোক চারঘন্টা সময় দিচ্ছি। এই বেলা নেবে যা সুড় সুড় করে ঘাড় থেকে। তা না হলে ফল কি হবে আশা করি বুঝতেই পারছিস।

ভূতকে চারঘন্টা সময় দিয়ে ওঝা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিঃ চক্রবর্তীকে ডেকে ঘাড় থেকে ভূত নাবাতে কি কি জিনিস লাগবে তার একটা ফর্দ লিখতে বসল।

যথাসময়েই ফর্দ মতো তিন মন কাঠ, ত্রিশ কিলো খাঁটি গাওয়া ঘি, দশ কিলো শুকনো ঝাল লঙ্কা আর পাঁচ কিলো মধু এসে হাজির হল। এই দিয়েই নাকি ভূত নিধন যজ্ঞ বসবে।

চারঘন্টা দেখতে দেখতেই কেটে গেল। ওঝা ঘরে ঢুকে আমায় প্রশ্ন করল, কিছু অনুভব করছেন? ভূত ঘাড় থেকে নাবল!

আমি ঘাড় নাড়তেই ওঝা আবার আমার মুখের দিকে কটকট করে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বললে, হুম্ যা ভেবেছি তাই। ব্যাটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে! এটা পালঙ্ক নাকি র‍্যা? এ্যাঁ...

ভূত অবশ্য কোনওরকম সাড়াশব্দ ছাড়াই মটকা মেরে পড়ে রইল।

ওঝা অগত্যা যজ্ঞ করতে বসল। গনগনিয়ে উঠল কাঠের আগুন। ঘি আর মধু মিশিয়ে ঢালা হল তার মধ্যে। সে হাতের ছড়িটা ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এটা চলার পরে লঙ্কা ছড়ানো শুরু হল আগুনের ওপর। লঙ্কা পোড়া গন্ধ বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কোয়ার্টারে যে যেখানে ছিল সকলেই অবিরাম হাঁচতে শুরু করে দিল।

আমি হাঁচি চাপতে পারলাম না। নাক টিপে থাকলেও রীতিমত কাঁপিয়ে কাঁপিয়েই হাঁচি আসতে লাগল।

এই এলাহি কাণ্ড করেও কাজ কিছুই হল না। দেখেশুনে ওঝাও বেশ একটু গম্ভীর

হয়ে গেল। বলল, এতেও তোর শিক্ষা হল না। এবার ঝাঁটা পেটা খাবার জন্য তৈরী হ তাহলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আপত্তি করলাম। ঝাঁটা পেটা খেতে আমি অন্ততঃ রাজী নই। কারণ ঝাঁটা কেবল ভূতের দেহেই পড়বে না, আমার দেহেও পড়বে। ভূত ছাড়বে কি না ছাড়বে, শুধু শুধু আমিই বা ঝাঁটা পেটা খেয়ে মরি কেন।

আমি আপত্তি করাতে ওঝা বেশ চটেই গেলো। বললে, ভূত তো ছানার সন্দেশ নয় যে মুখে দিলেই গলে যাবে। তাকে হজম করতে গেলে কষ্ট একটু তো করতেই হবে সাহেব।

সব এড়িয়ে যেতে চাইলে চলবে কি করে? বেশ ঝাঁঝিয়ে কথাগুলো বলে উঠল ওঝা আমাকে।

আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনো আমাকে ধমকে কথা বলতে সাহস করেনি। আর এ তো কে না কে!

ধ্যাত্তোর! ভূতের নিকুচি করেছে বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের উদ্যানে গিয়ে বসলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমার ঘাড়ের ভূত আমিই নাবাব। কারুর আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

হতাশ ওঝা বোধ হয় এই সুযোগই খুঁজছিল। আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে রাগের ভান করে সরে পড়ল সেখান থেকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসার পর আমি ঘুরে ঘুরে উদ্যানের গাছগুলো চেনবার চেষ্টা করছি হঠাৎ একটা গাছের পাতায় চোখ পড়তেই চেনা চেনা ঠেকল। বিছুটি গাছের পাতা দেখতে হুবহু এইরকমই।

আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই দুষ্ট ছেলেদের শাস্তি দেবার জন্য এই রকমের একটি গাছ পুঁতেছিলেন স্কুল বাড়ীর লাগোয়া জমিতে।

আমার অনুমানটা যাচাই করার জন্য উদ্যানের মালির শরণাপন্ন হলাম। মালি গাছটা দেখেই বললে, হাত দেননি তো। খুব সাবধান বুনো বিছুটি!

যেখানে লাগবে চুলকে চুলকে মাংস তুলে না ফেলা পর্যন্ত রেহাই পাবেন না। এই দেখুন না আমারই পায়ে একবার বিছুটি লেগে কি হাল হয়েছিল!

মালি কাপড় সরিয়ে হাঁটুর ওপর একটা নতুন ছালের অস্তিত্ব দেখাল। সব দেখেশুনে নিজের মনেই হা-হা-হা করে হেসে উঠলাম আমি। ভূতকে পুত না বানানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। লম্বুদা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন।

এটা তাঁর চিরকালের স্বভাব। তাঁর এই আকস্মিক নীরবতায় আমাদের ধৈর্যচ্যুতি

ঘটাটা কিছুই অসম্ভব নয়।

বললাম, লম্বুদা, অনুগ্রহ করে শেষ করুন। গাছে তুলে আর মই কাড়বেন না।

লম্বুদা হাসলেন। এক মিনিট চোখ বুজে বসে থাকার পর ওই হাসির রেশ টেনেই বললেন, বেশ কটা বড় বিছুটি পাতা সংগ্রহ করলাম ওই গাছ থেকে। যে ঘরটা আমার থাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন মিঃ চক্রবর্তী সেই ঘরে একটা প্রকাণ্ড আয়না ছিল। এই আয়নার সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আগে ভূতটা আমার শরীরের কোন কোন অংশ অধিকার করে হাত পা ছড়িয়ে বসেছে জেনে নিলাম তারপরই ওই বুনো বিছুটি পাতা ঘষতে শুরু করলাম তার দেহের ওপর।

এক দুই তিন—পাঁচ আর গুনতে হল না। তার আগেই কাজ শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ ঘাড়ে যে প্রচণ্ড চাপটা অনুভব করছিলাম আস্তে আস্তে সে চাপটা লাঘব হতে শুরু করল। বেশ মনে হল সাপ জাতীয় কিছু একটা আমার শরীর বেয়ে নীচের দিকে নামবার চেষ্টা করছে।

মনে মনে খুশীই হলাম। কারণ ভূত ঘাড়ে নিয়ে বাড়ী ফিরলে লোকেরা বলবে কি?

সে নাবতে নাবতে একেবারে গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত নেমে এসে সেই যে আটকে গেল আর নড়ার নাম নেই।

যে কারণে আমার পা ভারী হয়ে উঠল এবং মাটি থেকে তুলতে বেশ অস্বস্তি হতে লাগল। ওষুধ ধরেছে দেখে মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম। আবার ওই বিছুটি পাতা ঘষতে লাগলাম পায়েতে।

কাজ হল। এবার সে নড়াচড়া করতে শুরু করল বটে, কিন্তু পা ছেড়ে রেহাই দিতে চাইল না আমাকে। অগত্যা অন্য ফন্দী আঁটতে হল।

জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে পা বাড়িয়ে দিলাম এবং গায়ের জোরে লাথি ছুঁড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের লাগোয়া নর্দমাটার পচা জলে 'ঝপাং' করে একটা শব্দ হল। হঠাৎ ওই শব্দ শুনে মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর লোকেরা ছুটে এলো আমার ঘরে!

ভূতের ভয়ে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি এমন একটা আশঙ্কাই বোধহয় তাদের মনে উঁকি মেরেছিল।

ওদের সদলবলে ঢুকতে দেখে আমি হা-হা-হা করে হাসতে লাগলাম। ওরা কি ভাবল কে জানে। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

'ভূতের হাত থেকে আমি মুক্ত' একথা তাদের বোঝাতে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল বলে, লম্বুদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ভূত তাড়ানোর এই অভূতপূর্ব কাহিনী শুনে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কেউই কোন মন্তব্য করছিলাম না।

লম্বুদা আমাদের এই মৌনতা উপভোগ করতে লাগলেন। দুপক্ষই যখন নীর ইন্দ্রজিৎই হঠাৎ রসভঙ্গ করল।

লম্বুদার উদ্দেশে বললে, আচ্ছা লম্বুদা আপনি ভূতের গায়ে বিছুটি ঘষে ঘাড় থে নাবিয়েছেন বললেন। কিন্তু ভূত তো অদৃশ্য, অশরীরী। তার গায়ে বিছুটি পাতা ঘষলে কি করে জানতে পারি কি?

লম্বুদা এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। এ মিনিট ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হো-হো- করে হেসে উঠে বললেন, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। বুদ্ধি খাটালে কিনা হয়?

তিনি পুনরায় ধূমপানে মন দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ নাছোড়বান্দা। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেই বললে, লম্বুদা জানি সাগরে মতোই বুদ্ধি ঠাসা আপনার মগজে কিন্তু কি ভাবে সেটা এখানে প্রয়োগ করলে সেটাওতো আমাদের জানা দরকার, নয় কি?

রাইট, বলে লম্বুদা গোঁফের ফাঁকে একঝলক হাসলেন। সেই হাসির রেশ টেনেই বললেন, বলছ! এতোই যখন তোমাদের আগ্রহ, শোন তাহলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ভূত রয়েছে ঘাড়ে অথচ তার অস্তিত্ব টের পাব না এ কখনো হয়? ভূতের অস্তিত্ব খুঁজে বার করার জন্য কাঁধের ওপরেই একটা চিমটি কাটলাম। কোনও সাড় নেই অর্থাৎ আমি কিছু টেরই পেলাম না। ধরে নিলাম সেখানে ভূতের কোন না কোনও অঙ্গ আছে। তা না হলে আমি টের পাব না কেন।

আবার তারই পাশে এক জায়গায় চিমটি কাটতে স্পষ্টই সেটা টের পেলাম। বুঝলাম সেখানে তার কোনও অঙ্গ নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি কাঁধের সর্বত্র চিমটি কেটে ভূত আমার দেহের কোন কোন অংশ দখল করেছে চিহ্নিত করে ফেললাম। এবার তার ওপরেই ওই বুনো বিছুটি পাতা ঘষতে লাগলাম নির্মমভাবে।

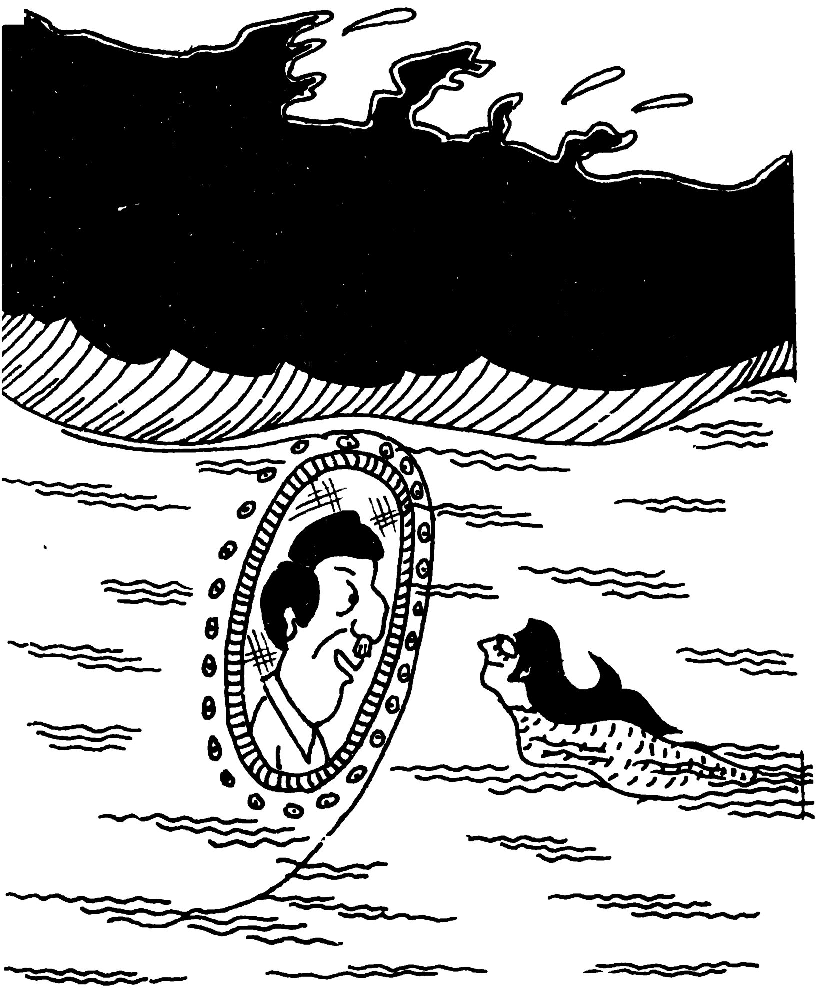
সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধ ধরল। বিছুটির প্রচণ্ড চুলকানিতে অস্থির হয়ে ভূত বাপ্ বাপ্ বলে আমার দেহ ছেড়ে পা ধরল। কিন্তু আমি তাকে পায়েও আশ্রয় দিলাম না— লম্বুদার চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

আমরা একরকম প্রস্তুত ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে 'গুরু' 'গুরু' বলে চীৎকার করে উঠলাম।

লম্বুদা মাথা নত করে আমাদের এই শিরোপা গ্রহণ করলেন।

---

# পাতালে লম্বুদা



# পাতালে লম্বুদা

সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে তাল দিয়ে যে লম্বুদা প্রত্যহ আমাদের আড্ডাঘরের চৌকাঠে পা রাখতেন, সেই লম্বুদার বিনা নোটিশে একমাস ডুব আমাদের কাছে প্রায় দুশো বছর বলেই ভ্রম হল। ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে আমরা শেষ পর্যন্ত অনতিলম্বে এই জনাকীর্ণ শহর কলকাতার বুক থেকে লম্বুদাকে খুঁজে বার করার কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম।

আমাদের এই সাধু প্রচেষ্টাকে আড্ডার অন্যতম সক্রিয় সভ্যদ্বয় তরুণ ও বিপ্লব টেবিল চাপড়ে অভিনন্দিত করল।

লম্বুদা তাঁর বাড়ীর ঠিকানা আমাদের কাছে গোপন রাখলেও, পাড়ায় তাঁর প্রতিপত্তির গল্প প্রায় করতেন। বলতেন, খাস দর্জিপাড়ায় বর্ন অ্যান্ড ব্রটাপ আমরা। দুবছর আগেও পুরো এলাকাটা আমার কড়ে আঙ্গুলের ডগায় ছিল। এখন আর কতক্ষণই বা ইণ্ডিয়ায় থাকি। টাচ্ প্রায় নেই বললেই হয়।

তবুও যা আছে ভারতের নব্বই কোটি লোকের নব্বই লাখকে অন্ততঃ এক ডাকেই হাজির করতে পারি। লম্বুদার সারামুখে গর্বের হাসি ছড়িয়ে পড়ত।

লম্বুদার সেই গর্বোক্তি অনুসরণ করেই, আমরা তাঁর খোঁজে দর্জিপাড়ায় তল্লাসী চালাবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে শুরু করে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত এই বিস্তৃত এলাকার ওপর জাল ফেলায় মনস্থ করলাম।

তিনদিন চক্কর মারলাম এই বিস্তৃত এলাকায় কিন্তু হায় কোথায় লম্বুদা!

এক বাড়ীতেতো আমাদের ছেলেধরা সন্দেহ করে প্রায় পুলিশেই খবর দিতে যাচ্ছিল আরকি।

আর এক বাড়ীতে নবজাত একটা ল্যাংটা শিশুকে কাঁথায় মুড়ে নিয়ে এসে বলল, এর নাম আমরা লেমবু রেখেছি। দেখতো বাবা তোমরা একেই খুঁজছ কিনা?

সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁকা পথ ধরলাম। এই এলাকায় যে কটা দর্জির দোকান আছে তার একটা লিস্ট করলাম। একে একে সেইসব দোকানে হানা দিয়ে, লম্বুদার আকৃতি ও প্রকৃতির মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে প্রশ্ন করলাম, হ্যাঁ মশাই এ ধরণের খদ্দেরের জামা প্যান্ট কখনও তৈরী করেছেন, যদি করে থাকেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁর ঠিকানাটা বলুন। কৃতার্থ হব।

অধিকাংশ দোকানদারই সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। দুচারজন কেবল অর্ডার বুক খুলে চোখ বুলিয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, না ভাই। ও রকম সাইজের খদ্দের আমাদের নেই। অবশ্য থাকলে ভালই হত। ডবল মজুরী আদায় করতে পারতাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

হতাশার অন্ধকারে যখন আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি, সেই সময় একদিন রাস্তায় একটা

মুচিকে মাথার টুপিতে তাপ্পি লাগাতে দেখলাম। টুপিতে তাপ্পি লাগাতে আমরা কখনও দেখিনি। বাস্তব কৌতূহল সামলাতে না পেরে ছুটে গেল সেদিক। ঝুঁকে পড়ে সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—লাইট! লাইট! হিয়ার ইজ আওয়ার বিলাভেড লম্বুদা!!

চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আমরা সদলবলে ছুটলাম সেদিকে। কিন্তু সেই ছেঁড়া টুপিটা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—লাইট কোথায় দেখলে বাবা? সামনেতো মুচি ছাড়া আর ছেঁড়া টুপি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।

বাস্তব কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। যেন শুনতেই পায়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে এগিয়ে গেল মুচির কাছে এবং তার হাত থেকে টুপিটা টেনে নিয়ে গভীর মনযোগ সহকারে কী যেন নিরীক্ষণ করতে লাগল।

বাস্তবের পিছু পিছু আমরাও সেখানে হাজির হলাম এবং তাকে ঘিরে ধরে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বাস্তব সেটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বললে, হুম, যা ভেবেছি তাই। নির্ঘাত লম্বুদারই টুপি। একদিন আড্ডায় বলেছিলেন বটে উইনস্টন চার্চিল একদিন যুক্তি তর্কে তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে মাথার টুপিটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, লোকে ইংল্যান্ডকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু চার্চিলকে ভুলবে না। চার্চিলকে ভুলে গেলেও তার মাথাকে ভুলবে না। সেই টুপিই আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। দেখ, এটি আবার ইঁদুরে কাটে না যেন। এ টুপিতেসর্বত্র ইঁদুরে কেটেছে। সেই কারণেই মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই তিনি ওই ঐতিহাসিক টুপিটিতে তাপ্পি মারতে দিয়েছেন মুচিকে।

টুপিটা হাত থেকে টেনে নিয়ে এভাবে আমাদের গবেষণায় মেতে উঠতে দেখে মুচিটা বেশ একটু ঘাবড়িয়েই গেল এবং জুল জুল করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাস্তব হঠাৎ ধমকিয়ে উঠল—এ টোপী কিস্‌কো?

মুচিটা মুখ ঘুরিয়ে সামনে গলির মধ্যে একটা বাড়ী দেখিয়ে দিল। বাস্তব টুপিটা ওকে ফেরত দিয়ে প্রশ্ন করল, বাবু ক্যায়সা, লম্বু অউর বাঁট্টু।

মুচিটা কী বুঝল কে জানে। ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত বড়া আদমি হ্যায়।

বাস্তবের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। আমাদের উদ্দেশে বললে তাহলে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। ইউ প্লিজ ফলো মি!

সেকেলে সরু গলি। গলির মধ্যে দিয়ে একজন কেউ বুক চিতিয়ে হাঁটলে বিপরীত প্রান্তের লোককে বেশ একটু কার্ণিক মেরেই হাঁটতে হয়।

বিপ্লবের নেতৃত্বে আমরা তাই লাইন বেঁধেই গলিতে ঢুকলাম।

বাড়ীটা দূর থেকে দেখেছিলাম বলেই আসল চেহারাটা ঠিক অনুমান করতে পারিনি। সামনে গিয়ে হাজির হতেই লক্ষ্য করলাম, বাড়ীর বয়েস একশও হতে পারে আবার এক হাজার বছরও হতে পারে। রঙ বলে কোনও বস্তু নেই দেওয়ালে। কোথাও সাদা কোথাও লাল কোথাও কালো আবার কোথাও শ্যাওলা ধরা সবুজ।

বাড়ীর সামনে বাগান নেই বটে কিন্তু দেওয়ালের গায়ে যে রকম বিচিত্র গাছের সমাবেশ হয়েছে এক নজরে "শূন্যে বাগান" বলে ভ্রম হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

বাড়ীর সদর দরজাটা নড়বড় করছে। দুটো কপাট ধরাধরি করে একসঙ্গে চাপ না দিলে বন্ধ হওয়াই কঠিন। বলপ্রয়োগে ঘাড়ের ওপর ভেঙ্গে পড়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

বাড়ীর চারপাশে জানালা আছে অসংখ্য। কিন্তু সবগুলো চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গাছপালায় ঢাকা। কেবলমাত্র পূর্বদিকের জানালার একটি পাল্লা খোলা রয়েছে।

কপাটের গায়ে একটা নেম প্লেট মারা রয়েছে বটে কিন্তু এনামেল উঠে যাওয়ার দরুন লিখিত বিষয় জানার কোনও উপায় নেই।

'যদি বি ওয়ার অব ডগ্ হয়! বাস্তব মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ দেওয়ালের পাশে নজরে পড়ল একটা সুইচ। তলায় লেখা আছে—পুস্!

বাস্তবের চোখে হাসির ঝিলিক খেলল। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপল বটে কিন্তু সাড়াশব্দ কিছুই নেই। বাস্তব কিন্তু নাছোড়বান্দা। বার বার পাঁচবার টেপবার পর হঠাৎ বাড়ীর ভেতর কঁক্ কঁক্ করে দুবার শব্দ হল।

শব্দটা যে কলিংবেলের সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

কয়েকমুহূর্ত পরেই ওপর থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে কে যেন বলল, উপর আ-যাও।

আমরা সকলে মিলে যাব বলেই এগুচ্ছিলাম কিন্তু বাস্তব বাধা দিল। বললে, বাড়ীর ভেতর সদলবলে যাওয়া অশোভনীয়। লম্বুদা চটে যেতে পারেন। তার চেয়ে বরং আমি আগে গিয়ে দেখা করি। তোরা পরে আয়।

প্রস্তাবটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবের কথামতই তাই আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাস্তব ফট ফট করে ভেতরে ঢুকে গেল।

মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছে। আমরা দাঁড়িয়ে নীরবে মুখ চাওয়া চাউই করছি হঠাৎ বাস্তব উস্ক খুস্ক চুলে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে এবং আমাদের পালাবার ইশারা করে ঊর্দ্ধাশ্বাসে দৌড়তে লাগল গলি ছেড়ে রাজপথে।

দেখাদেখি আমরাও দৌড়তে শুরু করলেও, কারণটা জানার জন্য সকলেই উদগ্রীব

হয়ে উঠলাম এবং বাস্তবকে ইশারায় তা ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধও জানালাম কিন্তু কে কার কথা শোনে। সে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে, উর্দ্ধশ্বাসে ধর্মতলা বরাবর দৌড়তে লাগল।

আমরা নিতান্ত বোকার মতই তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

মহাত্মা গান্ধী রোড অতিক্রম করার পরেই বাস্তব তার গতি শিথিল করলে আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম যদিও তখন সে হাঁপাচ্ছিল। আমি কানে কানে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কীরে? লম্বুদা খুব চটে গিয়েছেন নাকি?

বাস্তব আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে এক মিনিট তাকিয়ে রইল, তারপর জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল—চা-আ-আ-আ!

গলা আমাদেরও যথেষ্ট শুকিয়ে গিয়েছিল। আমরা বাস্তবকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় এক চায়ের দোকানে ঢুকলাম এবং বৃত্তাকারে এক একজন এক একটা চেয়ার দখল করে বসলাম।

হোটেল বয়টি অভ্যাস মতই চপ, কাটলেট, মামলেট, কচুরি, সিঙ্গাড়া ইত্যাদি বেশ কিছু মুখরোচক খাবারের নাম জপতে জপতে আমাদের সুমুখে এসে দাঁড়াল।

আমাদের সকলেরই পকেট প্রায় গড়ের মাঠ। এই সঙ্কট মুহূর্তে বিপ্লবই বাঁচাল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সে সাত কাপ ডবল হাফ চায়ের ফরমায়েস দিল।

ভীড় কমই ছিল। আমরা বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে চা নিয়ে এসে হাজির করল টেবিলে।

বাস্তব চায়ের কাপে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে বললে—আঃ ধড়ে প্রাণ এল।

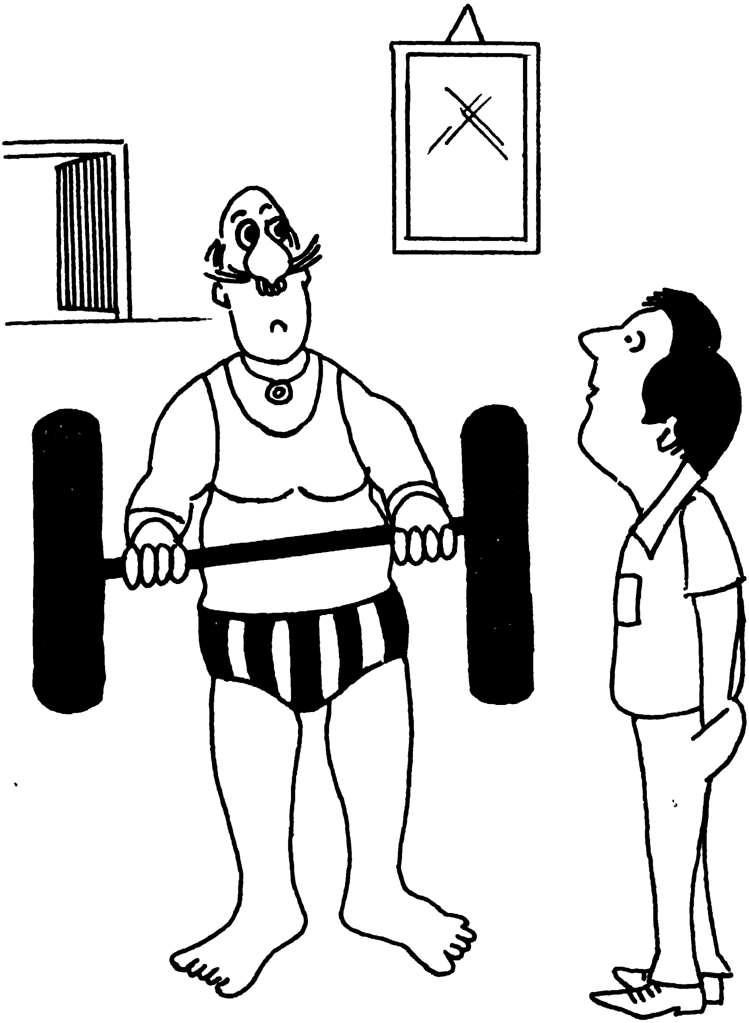
চা আস্বাদনে বাস্তবের জীবনী শক্তি পুনরুদ্ধার হতে, এবার আমরা তার গৌরচন্দ্রিকা বর্জিত অভিজ্ঞতাটুকু শোনাবার জন্য অনুরোধ জানালাম।

বাস্তব নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে এক মিনিট তাকিয়ে রইল। মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ, যা বলছিলাম—

বাড়ীর মধ্যে বার কয়েক 'লম্বুদা'-'লম্বুদা' বলে ডাকতেই, দোতলা থেকে কে যেন বললে, হাঁ উপর আ যা—

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে হিন্দী শব্দ লম্বুদা প্রায়ই ব্যবহার করতেন বলেই সন্দেহের তেমন কোনও কারণ ঘটল না। সিঁড়ি ভেঙে সোজা ওপরে উঠে গেলাম। দোতলার সিঁড়ির গায়েই একটা ঘরের মধ্যে থেকে, লোহার ভারী বারবেল ওঠান নামানোর শব্দ আসছিল। নিঃসঙ্কোচে মুখ বাড়াতেই যার সাথে আমার চোখাচোখি হল, সে লম্বুদা নয়। মাথায় কদম ছাঁটা চুল, প্রশস্ত বক্ষ, লাল ষ্ট্রাইব জাঙ্গিয়া পরিহিত জনৈক অবাঙ্গালী ব্যায়ামবীর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনমণি একটা বারবেল নিয়ে

লাফালুফি করছে। আর মাঝে মাঝে হাতের গুলী পরীক্ষা করছে!



আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই প্রশ্ন করল, 'কেয়া মাঙতা'?

এখানে লম্বুদা থাকেন নাকি প্রশ্ন করতেই স্প্রিংয়ের মত ঘাড়টা নাচাতে নাচাতে বললে, হাঁ হাঁ, হামিই জম্বু আছি।

বুঝলাম আমার প্রশ্নটা তার বোধগম্য হয় নি। ঢোক গিলে আবার ওই একই প্রশ্ন করতে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে সে বললে, কেয়া তুম কালা হো?

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম। এবং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে সবিনয়ে বললাম, লম্বুদা

বাড়ীতে আছেন না বেরিয়ে গেছেন?

এবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ওই ভারী বারবেলটা প্রায় রুটি বেলা বেলুনের মত সামনে পাতা গদির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, বল্‌তো হ্যায় হামিই জম্বু, ফি কাহে দিল্লাগি সুরু কিয়া?

দেখলাম কেস সুবিধের নয়। এত স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা সত্ত্বেও যখন নামে বিভ্রাট ঘটছে, তখন সরে পড়াই শ্রেয়। কিন্তু সরব বললেই তো আর সরে পড় যায় না।

কীভাবে আমার এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করব যখন ভাবছি, হঠাৎ সে এগিয়ে এসে খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলল। এবং মৃদু মৃদু চাপ দিতে লাগল।

আমার মনে হল যেন একটা গরম লোহার সাঁড়াশি আমার হাত চেপে ধরেছে যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া বাস্তবে দূরের কথা, স্বপ্নেও দেখা চলে না। কী বলব খুঁজে না পেয়ে আমি তোতলাতে শুরু করলাম।

সে হাতটায় একটা হালকা মোচড় দিয়ে বললে, কেয়া মতলব?

মতলবটা আমার জলের মতই সহজ, সরল এবং স্বচ্ছ। সেটা আমি ভাল করে প্রকাশ করা সত্ত্বেও যদি সে বুঝতে না পারে তারজন্য আমি অন্ততঃ দায়ী নই। বেশ একটু ঝাঁঝিয়ে উঠেই বললাম, হাত ছোড় দিজিয়ে। লম্বুদা হিয়া রতা হ্যায়কি নেই।

সে আমার মুখের দিকে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়ল ভারী ডাম্বেলগুলোর দিকে।

আমার অনুমান মিথ্যে হল না। বেছে বেছে পাঁচ পাউন্ড ওজনের ডাম্বেল দুটো মাটি থেকে তুলে নিল এবং ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

পরিণামের কথা মনে পড়তে আমি আর দাঁড়ালাম না। দশ পনেরোটা সিঁড়ি টপকে তিন লাফে নেবে এলাম নীচেতে। তারপর আরকি—

চায়ের দোকান থেকে পথে নেবে আমরা নীরবেই পথ হাঁটছিলাম। লম্বুদাকে খুঁজে না পাওয়ার ব্যথায় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর মুহ্যমান। পরস্পর মুখ চাওয়া চাউই করলেও আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী সম্বন্ধে আমরা কেউই কৌতূহল প্রকাশ করছিলাম না।

বেশ কিছু পথ এই ভাবেই আমরা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ পথের পাশে বাটা কোম্পানীর একটা জুতোর দোকানের সামনে মিনি জনতার ভীড় লক্ষ্য করলাম। ভেতর থেকে কিঞ্চিৎ চীৎকার চেঁচামেচিও ভেসে আসছে।

আমরা ঝামেলা এড়াতে চাইলেও বাস্তবের জন্য তা সম্ভব হল না। সে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে জানতে গেল ঘটনাটা কি?

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে যথারীতি অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাস্তব হঠাৎ মুখ তুলে

আমাদের উদ্দেশে 'সু-উ-উ-উ-উ-স' করে একটা আওয়াজ করল। ঘটনাটা যে মামুলি নয় সেটা আমরা সহজেই অনুমান করলাম এবং তার আহ্বানে সাড়া দিতেই এগিয়ে গেলাম দোকানের দিকে।

ভীড় কাটিয়ে দোকানের মুখোমুখি হতেই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। এই সোরগোলের মূল নায়ক আর কেউই নয় শ্রীশ্রী লম্বমান দত্ত ওরফে আমাদের দীর্ঘ কামানার ধন লম্বুদা।

ঘটনার চরিত্র না জেনে আমরা সেখানে মাথা গলানো সমীচীন মনে করলাম না। নিতান্তই দর্শকের ভূমিকা নিলাম।

কলহের বিষয় বস্তু একজোড়া কেটস্ জুতো। লম্বুদা বলছেন, অন্যসব জুতোর আপনারা রিসোলিং করে থাকেন। তাহলে আমার এই কেটস্‌েরও রিসোলিং করে দিতে হবে। আপনাদের তৈরী জুতো যখন আপনারা এ কাজ করতে বাধ্য।

দোকানের ম্যানেজার কিন্তু এ ব্যাপারে অনড়। তার মতে কেটস্ কখনই রিসোলিং হয় না। তাছাড়া পচে গলে যাওয়া এই জুতোর ক্ষেত্রে সে কথা কোনক্রমেই উঠে না।

এই নিয়ে বাদবিসম্বাদের সূচনা। লম্বুদা অবশ্য তার দাবীর যৌক্তিকতাও দেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন এই কেটস্‌টা তিনি এখনই ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারেন কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ এই কেটস্ জুতোটা পরেই নাকি তিনি পাতালের মাটি স্পর্শ করেছিলেন। এবং সেই কারণেই জুতো জোড়াটিকে সংরক্ষণের জন্য তাঁর এই কঠিন প্রয়াস।

উপস্থিত জনতা লম্বুদার এই উক্তি শুনে চমকিত হলেও তর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথা বলেনি। তারা নিঃশব্দেই এর পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করছিল।

লম্বুদার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমাদের পক্ষে বেশীক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। আমরা ভীড়ের মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে সমস্বরে চীৎকার কার উঠলাম—ইওর একসেলেন্সি এনি হেল্প ফ্রম আস।

সঙ্গে সঙ্গেই লম্বুদার দৃষ্টি আকর্ষিত হল আমাদের দিকে। প্রায় ভূত দেখার মতই তিনি চমকে উঠলেন।

চমক ভীড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার? সামান্য একজোড়া কেটস্ নিয়ে এমন হুজ্জত বাঁধিয়েছেন কেন, আপনার মত একজন বিশ্ববিখ্যাত লোকের পক্ষে কি এটা শোভা পায়? জানেন না এতে আপানর প্রেসটিজ পাঙচার হয়ে যাচ্ছে।

লব্বুদা বেশ একটু বিব্রত হয়েই জনতার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর

পকেট থেকে চুরুটের কেসটা বার করে, একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, জীবনে কখনও ঐতিহাসিক কাজ কিস্‌সু করলে না। তোমরা আর এই কেট্‌সের দাম বুঝবে কী করে?

এই কেটস্ সংরক্ষণের জন্য এখুনি যদি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়ি, লন্ডন বা আমেরিকার যে কোনও প্রখ্যাত মিউজিয়াম থেকে অফার এলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য হব না। আমাদের দেশে এই গৌরবের মূল্য না পেতে পারি কিন্তু ওরা ভাল করেই জানে দুস্প্রাপ্য জিনিসের সমাদর করতে। কিন্তু টেম্‌পারেচারের তারতম্যেই জুতোর সোলের আজ এই দুরবস্থা। তাই ভাবছিলাম জুতোটা রিসোলিং করে যদি এর মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

লম্বুদা প্রায় এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো আমাদের সকলের উদ্দেশে উচ্চারণ করে পুনরায় ধূমপান করতে শুরু করলেন এবং মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

মোটামুটি আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হতে লম্বুদা এবার বাটার দোকানের ম্যানেজারের দিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

ম্যানেজার এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করে হাত বাড়িয়ে দিল তার আহ্বানে সাড়া দিতে।

লম্বুদা তার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, ডোন্ট মাইন্ড। আমাকেতো লন্ডন যেতেই হয়। আমি আপনাদের হেড অফিস থেকেই রিসোলিঙ করে নিয়ে আসব। লম্বুদা চুরুটে একটা জোরাল টান মেরে, মৃদু হাসি মাখা মুখে বেরিয়ে এলেন ভীড়ের মধ্যে থেকে। আমাদের উদ্দেশে বললেন, চল অনেকদিন আড্ডায় যাওয়া হয়নি। আজই যাব ভাবছিলাম।

লম্বুদাকে এভাবে পথ থেকে পাকড়াও করতে পারব, স্বপ্নেও আমরা ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে পূর্বের ঘটনার পর আমরা যখন তাঁর আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়া পুরোপুরি ভাগ্যের ব্যাপার ছাড়া আর কীই বা বলতে পারি।

লম্বুদাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা হলাম আমাদের আড্ডা ঘরের উদ্দেশে। লম্বুদা তাঁর স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য নিয়েই হাঁটছিলেন। এবং ঘন ঘন চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছিলেন।

বাস্তবই প্রথম তাঁকে সরব করল বাসা প্রসঙ্গ তুলে। বললে, লম্বুদা আপনি দর্জিপাড়ার জুয়েল বলে নিজেকে জাহির করেন অথচ আমরা সারা দর্জিপাড়া চষে ফেললাম কেউই আপনাকে চিনতে পারল না। কী ব্যাপার বলুনত?

প্রশ্নটা যেন কানেই ঢোকেনি এ রকম একটা ভাব দেখিয়ে লম্বুদা ধূমপান করতে লাগলেন এবং নাক মুখ দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

উত্তরটা শুনবার কৌতূহল আমাদের সকলেরই ছিল। আমরা উদগ্রীব হয়ে লম্বুদার

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লম্বুদা সশব্দে একটা উদ্গার তুললেন।

আকস্মিক তাঁর উদ্গার কোনও রকম অর্থবহ কিনা সেই চিন্তা যখন আমাদের মনে উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে, লম্বুদা ফিক করে গোঁফের ডানায় একমুঠো হাসি ছিটিয়ে বললেন, চিনবে কী করে। ওদের কাছে আমি যে আমার ডাক নামে পরিচিত।

সে নাম বলে খোঁজ করলে, তোমাদের কজনকে ওরা মাথায় করে তুলে নিয়ে গিয়ে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে আসত। লম্বুদা সশব্দ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

কিছু পথ এগিয়েছি। সামনেই নীলকণ্ঠ কেবিন।

লম্বুদা হঠাৎ তার গতি স্তিমিত করে বললেন, কীহে হবে নাকি এক রাউন্ড।

চা তৃষ্ণা না পেলেও আমরা কোন রকম আপত্তি করলাম না। নীরবে ঘাড় নেড়ে আমাদের সম্মতি জানিয়ে দিলাম।

লম্বুদার পিছু পিছু সদলবলে আমরা নীলকণ্ঠ কেবিন দখল নিলাম। লম্বুদা আমাদের সকলে মধ্যে মধ্যমণির মতই শোভা পেতে লাগলেন। এবং গুন গুন করে একটা জনপ্রিয় কীর্তন গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন।

যথাসময়েই ফরমায়েস মত চা এল। লম্বুদা চায়ের কাপটা তুলে সড়াক করে সশব্দ একটা চুমুক দিলেন এবং পা নাচাতে শুরু করলেন।

সাময়িক নীরবতা ভঙ্গ হল। বাস্তব বলল, আচ্ছা লম্বুদা আপনি বৃন্দাবন গেছেন কখনও?

বাস্তবের এ প্রশ্নে তাঁর মধ্যে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। বেশ নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বলল, হঠাৎ এই গোঁফ খেজুরে প্রশ্ন?

বাস্তব হাসল। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই একটা আছে। কিন্তু তার আগে আপনার উত্তরটা শোনা যে একান্তই প্রয়োজন—

'ওঃ' লম্বুদা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। চুরুটটা ঠোঁটের কোনায় চেপে ধরে বললেন, যাইনি বললে মিথ্যা কথাই বলা হবে। তবে হ্যাঁ, কতবার গিয়েছি যদি প্রশ্ন কর, তাহলে বলব একটা ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তোমাদের যোগাড় করে দিতে হবে। কারণ যোগফল স্মরণ রাখবার মত অত পাওয়ারফুল স্মৃতিশক্তি বর্তমানে আমার নেই।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম শুনে, বিস্ময়ে আমাদের চোখ প্রায় কপালে ওঠার যোগাড় হল। ন্যূনপক্ষে বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকা মূল্যের ওই মেসিন এখুনি পাই কোত্থেকে।

শেষ পর্যন্ত আমাদেরই নতি স্বীকার করতে হল। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, আচ্ছা লম্বুদা বৃন্দাবনে ময়ূর পাওয়া যায় কথাটা কি সত্য?

'কাকের মতই' লম্বুদা বিড়বিড় করে বললেন তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে,

তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন।

'কাকের মত' ময়ূর উপমাটা আমাদের কারুরই বোধগম্য হল না। আমি বললাম, লম্বুদা সব ময়ূরই সুন্দর এ কথাটা নাও মানতে পারি। কিন্তু কাকের মত কুৎসিত হয় বলতে কখনও শুনিনি।

আপনি বোধহয় আমদের প্রশ্নটা ভালভাবে না শুনেই উত্তর দিয়ে ফেলেছেন।

লম্বুদার কপালে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চুরুটটা দুপাটি দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরে বললেন—নেভার। আই নেভার স্টুড সেকেন্ডইন মাই লাইফ। কাজেই যেখানে যেটুকু শুনি, দেখি, সবটুকুই আমি কাজে লাগাই। তবে আমি জানি—

কী জানেন?

তোমাদের বুদ্ধির দৌড় কতটা।

প্রসঙ্গটা পালটাতে দেখে আমরা অল্প বিস্তর সকলেই বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, অ-র্থা-ৎ?

লম্বুদা এক মিনিট নীরব থেকে বললেন, ময়ূরকে কাকের মত দেখতে আমি বলিনি। বলছিলাম কাকের মতই ওখানে ময়ূর উড়ে বেড়ায়। অবশ্য প্রথমবার আমিও ঠকে ছিলাম, বলে লম্বুদা হাসতে লাগলেন।

লম্বুদার সঙ্গে আমাদের আলাপ দীর্ঘ দিনের। তিনি কখনও ঠকেছেন বলে আমরা শুনিনি! আকস্মিক তার এই স্বীকারোক্তিতে আমাদের মধ্যে রীতিমত বিস্ময়ের সঞ্চার হল। সকলেই উসখুস করতে লাগল লম্বুদার এই ঠকার কাহিনীটা শোনার জন্য। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত কেউই তা মুখ খুলে প্রকাশ করতে পারল না। সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউই করতে লাগল।

সকলের মনের আশা পূরণ করে আমি বললাম. আপনার মত চৌকস লোকের পক্ষে ঠকা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। এ ঘটনা শোনার কৌতূহল যদি আমাদের একান্তই জেগে ওঠে সেটাকি আপনি অস্বাভাবিক বলবেন?

লম্বুদা আমার কথা শুনে শূন্য দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলেন। পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখের ওপর বুলোতে বুলোতে বললেন, না আমি নিজেও যতবার সে ঘটনা ভাবি অবাক হয়ে যাই। সে রকম একটা দুর্বল মুহূর্ত কী করে এসেছিল আমার জীবনে এখনও রহস্যজনক হয়ে আছে।

অবশ্য তার জন্য আমি ঠিক দায়ী নই। দায়ী আমার রাত জেগে বই পড়ার নেশা। সে নেশা না থাকলে বোধ হয়—

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় সৃষ্টি করলেন এবার লম্বুদা। রাত জেগে বই পড়ার সঙ্গে ময়ূরকে কাক ভ্রম করার কী সম্পর্ক থাকতে পারে, আমাদের কারুরই সহজ বুদ্ধিতে তা এল না।

বললাম, লম্বুদা গ্রীজ একটু ঝেড়ে কাশুন। জানেনইতো আমরা চিরকাল বিলো স্ট্যান্ডার্ড—অত তাড়াতাড়ি সব কথা বুঝে উঠতে পারি না।

লম্বুদা একটু আশ্বস্ত হয়েই বললেন, এ আর এমন কী কথা। ইচ্ছেটা আগে প্রকাশ করলেই তা পারতে। আজ পর্যন্ত আমি কোন ইচ্ছেই তোমাদের অসম্পূর্ণ রাখিনি। এতে আর নতুনত্ব কী আছে—

লম্বুদা চোখা বুজিয়ে বসে কারখানার চিমনীর মত নাকের দুটি ছিদ্র দিয়ে ভর ভর করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। বেশ খানিকটা ধোঁয়া খারিজ করার পর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তখন বৃটিশের রাজত্ব। একজন চৌকস স্পোর্টসম্যান হিসাবে তখন আমার বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

সাহেবদের যত বদগুণই থাকুক না কেন, গুণের অভাবও ছিল না।

ভারতীয়দের তারা ঘৃণার চোখে দেখত ঠিকই, কিন্তু সকল ভারতীয়দের বললে ভুল বলা হবে। জ্ঞানী গুণীদের তারা যোগ্য সম্মানই করত।

আর এই কারণেই আমার সাহেব ভক্তের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। গাড়ী ছাড়া পথে বেরুলে আর রক্ষা নেই, করমর্দন করতে করতে হাতের শির ঝনঝন করত। শুধু কি তাই, হাতের নুন ছাল উঠে যাওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

একদিন বনি বোম্বার্ট নামে আমার একজন আমেরিকান ভক্ত এসে ছিল দেখা করতে। সোজাসুজি আমেরিকা থেকে আসছে, স্বভাবতঃই আমাকে একটু বেশী আদিখ্যেতা করতে হল। বললাম, হ্যালো বনি কী খেতে ইচ্ছে করছে বল?

বনি একমুহূর্ত চিন্তা করে বললে, এনি ডিস তবে—

—তবে কি?

—শুনেছি তোমাদের এখানকার কচ্ছপের মাংস খুব সুস্বাদু। আমি অল্প বিস্তর সব রকমের মাংসই চেখেছি কিন্তু কচ্ছপ খাওয়া হয় নি! যদি অসুবিধা না হয় একদিন কচ্ছপের মাংস খাওয়ালে খুবই খুশী হব।

বনির এই আরজি আমি এড়িয়ে যেতে পারলাম না। অল রাইট বলে বললাম তোমাকে কথা দিলাম খাওয়াব। একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ লোকাল মার্কেটে যে কচ্ছপ পাওয়া যায় সেগুলো ঠিক রেওয়াজি নয়।

বনি ঘাড় নেড়ে বলল, দ্যাটস নো ম্যাটার। আমি এখনও এক মাস আছি এখানে।

মথুরার কচ্ছপের একটা আলাদা স্বাদ। মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। শুধু তাই-ই নয় সেই নিদারুণ স্বাদ কমপক্ষে সাতদিন লেগে থাকে জিবেতে।

এই সুযোগে সেটা পরীক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলাম এবং আমার অন্যতম সহপাঠী তৎকালীন মথুরার পুলিশ সুপার বংশীলাল তেওয়ারীকে এই মর্মে একটা খবর পাঠালাম। এই খবর পেয়ে তেওয়ারী এতই খুশী হল, নিজের হাতে চাঁদ পেলেও

বোধ হয় সে এত খুশী হত না। টেলিগ্রামের জবাব দিল—তোমার পদধূলি পড়বে এখানে এ যে অচিন্তনীয়। অবশ্য ইতিমধ্যেই আমাকে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। সেদিন যে মুহূর্তে তোমার টেলিগ্রাম এসে আমার হাতে পড়ে, সেই দিনই আমি মৃদু স্ট্রোকে আক্রান্ত হই। বর্তমানে শয্যাশায়ী। তবে দশপনেরো দিনের মধ্যেই সেরে উঠব আশা রাখি।

তুমি নির্বিবাদে চলে এস। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যথাসময়েই বনিকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় পৌঁছলাম। প্রায় ভি. আই পির মত মর্যাদা দিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে মিঃ তেওয়ারী আমাকে নিয়ে গেল স্টেশন থেকে তার কোয়ার্টারে এবং ভূরিভোজে আপ্যায়ন করল।

আমাকে খাতিরের বহর দেখে বনিতো অবাক। কানে কানে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার মশাই আপনি কী মন্ত্রীটন্ত্রী নাকি?

আমি ঘাড় নাড়লাম। স্যরি, ওসব ঠুনকো মোহ্ আমার কোন কালেই নেই, থাকবেও না। কুইন এলিজাবেথের প্রস্তাবই আমি প্রত্যাখ্যান করলাম আর এত—

বনি 'কঁক' করে একটা ঢোঁক গিলে বললে, ডোন্ট মাইন্ড!

তেওয়ারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জমে উঠতে, তেওয়ারী কাঁচুমাচু হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, আপ তো রাজাকা জাত। হামরা কুটির মে আপ আয়া ইয়ে মেরা সৌভাগ্য হ্যায়।

তেওয়ারীর ন্যাকামিটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগল না। তার মন্তব্যে বাধা দিয়ে বললাম, তোমার বিনয়টা অপচয় হল তেওয়ারী। রাজার স্বজাতি মাত্রই যদি রাজা হয় তাহলে আমাদের বিদ্যাসাগরের স্বজাতিরা সকলেই বিদ্যাসাগর। কিন্তু সত্যিই কী তাই হয়েছে? দেশত ডোবা আর খাল বিল লেকেই ভর্তি। কী তাই নয়? খোঁচাটা বনি হজম করল বটে কিন্তু তার বকফুলের পাপড়ির মত কান দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠল। জোর করে হো-হো-হো হেসে উঠে বললে, আসুন আমরা এ আলোচনা পরিহার করি। দিস ইজ নট্ গুড!

আমি সানন্দেই সম্মতি জানালাম তাতে। তেওয়ারী আমার কানে কানে বলল, ঘরে পাকানো খানা খাবেনত নাকি গাড়ি পাঠিয়ে আগ্রা হোটেল থেকে খানা আনাব?

আপত্তি জানিয়ে বললাম, না না আগ্রাই খানা খাওয়াবার জন্য ওকে এখানে আনিনি। এনেছি তোমাদের এখানের রেওয়াজী কচ্ছপের মাংস খাওয়াতে। যদিও তোমাদের এখানে কচ্ছপ খাওয়ার প্রচলন নেই। তাহলেও এটা একটা বিশেষ প্রয়োজন ধরে নিয়েই আশা করি ব্যবস্থা করবে।

তেওয়ারী প্রথমে মাথার টাক চুলকোলেও, পরমুহূর্তে গোঁফ পাকাতে পাকাতে বললে, কই বাত নেই। হো যায়গা—

তেওয়ারী কথা রেখেছিল বটে। মাংসের ওপরের কথা ছেড়েই দিলাম, ভেতরে চর্বি থিক থিক করছে। আর কিছুদিন ওকে রাখলে ওর ওপরের কঠিন আবরণটা পর্যন্ত চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত।

তেওয়ারী পুরো কচ্ছপখানা রোষ্ট করে এনে টেবিলে শুইয়ে দিয়ে বললে, শুরু কিজিয়ে। পয়লা নম্বর চীজ!

নুন আর মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম তার ওপর। তারপর ছুরি তুলে ভোজের উদ্বোধন করলাম।

খেতে খেতে এক জায়গায় ছুরি আটকে যেতে বাধ্য হয়েই আমাকে হাত লাগাতে হল। কিন্তু এমনই চর্বি লেগে গিয়েছিল আঙ্গুলেতে, এখনও সে দাগ ওঠেনি। হলুদ প্রলেপ পড়া তর্জনিটা তুলে লম্বুদা আমাদের মুখের সামনে নাচাতে লাগালেন।

আমরা যে লুকিয়ে মাঝে মাঝে একটু আধটু ধূমপান করি লম্বুদার সে খবর সম্ভবতঃ জানা ছিল না। কাজেই লম্বুদার আঙ্গুলের ওই রঙ আমাদের কাছে কোনই কৌতূহল সৃষ্টি করল না।

আমরা যখন হাসি চেপে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওই করছি, লম্বুদা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন এবং পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজতে আরম্ভ করলেন। এটা যে অঘোষিত ইনটারভাল সেকথা বুঝতে আমাদের কারুরই অসুবিধা হল না। আমরাও তাই নীরবেই লম্বুদার পুনরায় সরব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। এবার আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

আমি বললাম, লম্বুদা কিছু একটা হারিয়েছেন মনে হচ্ছে।

রাইট! দশখানা দশ টাকার নোটের বান্ডিল নিয়ে বেরিয়েছিলাম এখন দেখছি মাত্র একখানা পড়ে রয়েছে। নাইন পিকপকেট। ট্রামে-বাসেত উঠিনি, কিছুক্ষণ আগে একবার ঝোড়ো বাতাসের মুখে পড়েছিলাম বটে। নোট হাল্‌কা তো, যদি বাতাসে উড়ে গিয়ে থাকে।

ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে যাওয়ার খবরে অভিনবত্ব না থাকতে পারে, কিন্তু পকেট থেকে অজান্তে নোট উড়ে যাওয়ার ঘটনা যে অভিনবতম সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমরা সে খবর মেনে নিয়েই বললাম, লম্বুদা টাকাতো আপানার হাতের ময়লা। ও নিয়ে আর অযথা মাথা না ঘামিয়ে এখন আপনি বরং আপনার কাহিনীটা বলা শুরু করুন।

লম্বুদা পরপর পাঁচবার চুরুটে টান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, খাওয়া দাওয়া শেষ হলো এবার শোবার পালা। তেওয়ারী তার বেড রুমখানা ছেড়ে

দিল আমাদের দুজনের রাত্রি যাপনের জন্য।

খাওয়াটা বেশ জব্বরই হয়েছিল ফলে ঘুমটা বেশ ভালই হল। অভ্যাসমত আমার যখন ঘুম ভাঙ্গল, বনি তখন ঘুমে অচেতন।

বনিকে আর আমি বিরক্ত করলাম না। দাঁত ব্রাশ করতে করতে ঘরের সংলগ্ন অলিন্দ থেকে গাছপালা পরিবেষ্টিত মথুরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে লাগলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল পূর্ব প্রান্তে কালো পিচে মোড়া পথের মাঝখানে একখানা সুদৃশ্য কার্পেট পড়ে আছে।

আশাপাশ থেকে অনেকেই তা প্রত্যক্ষ করলেও, কার্পেটখানা কুড়িয়ে আনার ব্যাপারে কারুরই উৎসাহ নেই।

কার্পেটের মূল্য সেখানে খুবই সুলভ এই ধারণা করেই আবার আমি আমার কাজে মনোনিয়োগ করলাম। কিছুক্ষণ পরেই তেওয়ারী আমাদের প্রাতঃকালীন শুভেচ্ছা জানাতে সেখানে এসে হাজির হল।

আমি করমর্দন করে বললাম, মিঃ তেওয়ারী কার্পেট কি এখানে গাছে ফলে নাকি?

মিঃ তেওয়ারী আমার প্রশ্নের অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে মৃদু হেসে বললে, কার্পেট কী ফ্রুট যে গাছে ফলবে!

আমি বললাম, সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। তা না হলে অমন সুন্দর কার্পেটখানা কী রাস্তায় পড়ে থাকে!

তেওয়ারী বোধ হয় আমার মন্তব্যের ঠিক অর্থ উদ্ধার করতে পারল না। ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল রেলিঙের ধারে।

স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করার পর হঠাৎ তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল এবং হা-হা-হা-হা করে হাসতে শুরু করল।

সে কী হাসি! হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল রেলিঙের ওপর।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে কয়েক মিনিট আমি থ মেরে রইলাম। তেওয়ারী যখন দমের অভাবে গোঙাতে শুরু করল, তখন আর অমি নীরব থাকতে পারলাম না। বললাম, হোয়াটস্ ম্যাটার মিঃ তেওয়ারী? প্লীজ স্পিক্ সামথিং—

তেওয়ারীর কানে আমার কথা প্রবেশ করলেও কাজের কাজ কিছুই হল না। পূর্বের মতই সে মুখে শব্দ করতে লাগল।

একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ ছাড়া আর কীই বা করা যেতে পারে। অগত্যা তার আচরণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষাই করতে হল।

আমি সেদিকেই তাকিয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ তেওয়ারী এগিয়ে এসে আমার কানে

ফিস ফিস করে বললে, লম্বু তুমি একটা ব্লান্ডার করে বসে আছ। তুমি যেটাকে কার্পেট বলে ভেবেছ, ওটা আদৌ কার্পেট নয়।

এক ঝাঁক ময়ূর! পেখম মেলে বসে ভোজ খাচ্ছে।

ম-য়ূ-র। বলকি। চিড়িয়াখানা কী কাছাকাছি কোথাও নাকি?

তেওয়ারী মুচকি হেসে বললে, না না চিড়িয়াখানা এখানে কোথায়। এরা সব পথের ময়ূর। নিশ্চয়ই কেউ বাক্স প্যাঁটরা ঝেড়ে আরশুলা ফেলেছে পথে। ওরা পেখম মেলে বসে খিদে মেটাচ্ছে। আর বলেন কেন। ময়ূরদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। সরকারকে অনেক নালিশ করেও কোনও সুরাহা হয়নি।

তেওয়ারী কথা শুনে আমি তাজ্জব। অবশ্য সাগরে একরকম ময়ূরের ঝাঁক আমি অনেক দেখেছি বলে লম্বুদা হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন!

লম্বুদার ময়ূর উপখ্যান শুনে ইতিমধ্যেই আমরা কিছুটা বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম এবং চারদিকে ময়ূর ওড়া দৃশ্যটা কিরূপ হতে পারে সে দিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছিলাম।

এই মুহূর্তে লম্বুদার মুখে সাগুরে ময়ূরের নাম শুনে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় সঞ্চার হল। জলের মধ্যে ময়ূর সজ্ঞানে এই প্রথম শুনলাম।

যথারীতি চায়ের পেয়ালার ঠুংঠাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। সকলেরই কাপ প্রায় শূন্য। শেষ চুমুকটার জন্য কেউ কেউ এখনও অপেক্ষা করছে।

আমি কাপ সমেত ডিশটা ঠেলে রাখতে রাখতে বললাম, লম্বুদা সাগুরে ময়ূরের ব্যাপারটা সত্যিতো, না আমাদের বাগে পেয়ে গুলগাপ্পি ছাড়ছেন?

প্রশ্নটা শুনে লম্বুদা যে খুব খুশী হলেন না সেটা তার মৌখিক অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ পেল। গোঁফ জোড়া ছুঁচলো করে, মুখে চিড়িক চিড়িক করে তিনবার শব্দ করে বললেন, তোমরা কূপমণ্ডুকের দল। বহিঃর্বিশ্বের খবরাখবর তোমাদের কাছে বলা এখন বিড়ম্বনা দেখছি।

তোমাদের ওই সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠির রাজকুমার ও রাজকন্যার গল্প বলাই ভাল। হাঁ করে শোন আর 'আহা' 'আহা' কর। যুগ অনেক এগিয়ে গিয়েছে বলে লম্বুদা গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং নীরবে ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন।

লম্বুদার যুক্তিটা যে অকাট্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সত্যিই বহিঃর্বিশ্বের খবরাখবর আমরা কতটুকুই বা রাখি। এক রকম কিছুই না অনায়াসেই বলতে পারি। যদিও লম্বুদার কথার ওপর আমরা নির্ভরশীল মোটেই নয়। তাঁর গরু যত তাড়াতাড়ি গাছে চড়ে ঠিক তত তাড়াতাড়িই গাছ থেকে মাটিতে নামে।

তাই আমরা নীরব রইলাম।

এবার লম্বুদা কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করলেন। আমাদের কৃতিত্ব তিনি শুনতে না

চাইতে পারেন, কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব তিনি আমাদের কাছে ফাঁস না করা পর্যন্ত শা[illegible] পাবেন না।

আমাদের অনুরোধেব ঝুঁকি না নিয়ে অকারণ মুচকি হেসে তিনি বললেন, সাগু[illegible] ময়ূর অবশ্য সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের ব্যাপার আলাদা। আম[illegible] জলের পোকা বলতেই পারি। তা না হলে কী আর লাইফ রিস্ক করে ওই মর[illegible] সাগরে ঝাঁপ খেতে যাই। অবশ্য সে সব গৌরবোজ্জল ইতিহাস তোমরাই বা জান[illegible] কি করে?

তোমরাতো জান খালি নিজের ড্রাম পেটাতে আমি কোন কালেই ভালবাসি না[illegible] অবশ্য এখন মনে হয় ভুলই করেছি। আর কিছু লাভ হোক আর না হোক, ভারতভূষ[illegible] সরকারী খেতাব খানাওতো ঘরে বসেই পাওয়া যেত। লম্বুদা নীরব হয়ে ধূমপান কর[illegible] শুরু করলেন।

লম্বুদা যে আজ যথেষ্ট তৈরী এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইল না কারও। আমরা অবশ্য এই সুযোগেরই সন্ধানী। আজকের এই মুহূর্তগুলো উপভোগ করার যে সুযোগ এসেছে, তা পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্যই বললাম, লম্বুদা আম[illegible] বাগানে নিয়ে গিয়ে আর আঁকশি কেড়ে নেবেন না। অনুগ্রহ করে সমুদ্র ময়ূর সম্পর্কে দুচার কথা বলুন। আমাদের শূন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হোক।

লম্বুদা হা-হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, বটেইতো বটেইতো। তোমরা এই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি না করলেও পারতে।

যাহোক ভুলে যখন একান্তই করে ফেলেছ, আমি তোমাদের হতাশ করছি না।

লম্বুদা চোখ বুজে কী যেন ভাবতে শুরু করলেন।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, সাগুরে ময়ূর নামে ময়ূর হলেও যথার্থ ময়ূরের জাতে পড়ে না। লম্বুদা তার গোঁফের ডানা দুটোর মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে গোঁফের গভীরতা পরীক্ষা করলেন তারপর মৃদু হেসে বললেন, এদের এক রকমের পোকাই বলতে পার।

এদের পেখমগুলো খুবই বৈচিত্রপূর্ণ। জলের ভেতর এদের বাস বলেই বোধ হয় উজ্জ্বলতা সাধারণ ময়ূরের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী। রূপসীদের হাটে তাই এদের কদর অনেক।

তবে এরা গভীর জলে থাকতে পারে না। সমুদ্রের ধারে বালিপূর্ণ অগভীর জলের মধ্যেই এরা বাসা গড়ে। ওপরের দিকে খাড়া ও ছড়ান পাখনার সাহায্যেই ওরা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এই পাখনার রঙ খুবই বৈচিত্রপূর্ণ।

মাঝখানে থাকে বিন্দু বিন্দু রঙীন গোলাকার বৃত্তি। ধরা এদের বড্ড কঠিন। ধরতে

লেই পাখনা গুটিয়ে ওরা নিমেষের মধ্যে সরে পড়ে কাঁকড়ার মত বালির গর্তের মধ্যে।

এরা অবশ্য স্থলের ময়ূরের মতই নাচতে পারে। সারবেঁধে যখন তারা একসাথে নাচে গোটা সমুদ্রতীর তখন এক অবর্ণনীয় সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করে।

সে দৃশ্য দেখা অবশ্য খুব কম লোকের ভাগ্যেই হয়। আমরারই কী হত নাকি যদি না ওই দুঃসাহসিক পাতাল অভিযানে অংশ গ্রহণ করতাম।

লম্বুদা নীরব হয়ে গিয়ে দুপা নাচাতে লাগলেন। এবং মুহুর্মুহুঃ নাক চোখ ও মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

চায়ের দোকানের মালিক বসে কাগজে কী সব আঁকজোক কাটতে ব্যস্ত থাকলেও চোখ এবং কান দুইই সজাগ রেখেছিল এদিকে।

এক কাপ চায়ের বিনিময়ে আড্ডাটা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতমে যেতে দেখে আশঙ্কিত হয়ে এক নতুন চাল ছাড়ল। জনৈক বয়কে ডেকে ফিস ফিস করে কানে কী সব মন্ত্রণা দিতেই, সে কাঁধ থেকে তোয়ালেটা তুলে শূন্যে আস্ফালন করতে করতে আমাদের সুমুখে এগিয়ে এক গাল হেসে বললে, বাবু গরম কাটলেট একখানা করে দিই।

কাটলেটের নামেই আমাদের সকলের জিব সড়সড়িয়ে উঠল। যদিও পকেট সকলেরই গড়ের মাঠ।

আমরা সকলেই লম্বুদার জবাব শোনার জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এ ধরনের একটা বোম্বাই চালের মুখোমুখি হবার জন্য লম্বুদা বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বয়টির দিকে পাঁচ মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলেন তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, মেনুকার্ড নিয়ে এস।

বয়টিও কম ধূর্ত নয়। লম্বুদার চালের ওপর চাল মেরে বলল, ছাপতে গেছে। কাল পাবেন।

হোপলেস! এই জন্যই ছোট দোকানে আমি সচরাচর ঢুকি না। লম্বুদা স্বগতোক্তি করে, গুণ গুণে করে কী একটা গানের সুর ভাঁজতে শুরু করলেন।

লম্বুদার ভাব সাব দেখে যখন আমরা প্রায় নব্বই ভাগ কাটলেট খাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছি, লম্বুদা আবার মুখর হলেন। প্রশ্ন করলেন, একখানা কত?

বয়টা হেসে বলল, দশটাকা বারো আনা ইচ্।

তার মানে টেন হানড্রেড অ্যান্ড সেভেনটি ফাইব পয়সি। নাথিং!! ন্যুইয়র্কে দশ টাকা পঁচাত্তর পয়সায় খালি কাঁচের ডিস আর কাঁটা চামচ দেয়!

লম্বুদার কথা শুনে বয়টি খুবই খুশী হল। একগাল হেসে বললে, তাহলে বারোখানা

কড়ায় ছাড়ি?

লম্বুদা যেন শুনতেই পাননি এমন ভাব করে বসে রইলেন।

বয়টি কিন্তু তাঁর নির্বিকারভাবকে গ্রাহ্য না করে পা পা এগুতে লাগল।

লম্বুদা আড়চোখে তা প্রত্যক্ষ করে সরব হলেন। বললেন, শোন শোন দশটাকা পঁচাত্তর কেন, একশ টাকা পঁচাত্তরও দিতে পারি যদি—

তার কথা শুনে বয়টি থমকে দাঁড়াল।

লম্বুদা ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ ঠিক তাই। টাকাটা কোনও ফ্যাকটারই নয়, আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যদি মনোমত উত্তর পাই তবেই, নচেৎ নয়।

সে ম্লান হেসে বললে, বলুন—

লম্বুদা এবার সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। অর্থাৎ উপস্থিত সকলে লম্বুদার এই কীর্তি লক্ষ্য করেছে কী না সেটা জানাই তার উদ্দেশ্য।

মোটামুটি সে ব্যাপারে খুশী হতে গম্ভীর হয়ে বললেন, কিসের মাংস?'

কেন পাঁঠার!

বয়স কত?

বয়টি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, আজ্ঞে বার্থ সার্টিফিকেট তো দেখিনি। তবে বছর তিন চারতো হবেই।

'হুম' বলে লম্বুদা এক মিনিট কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কাটবার সময় কতবার ডেকেছিল?

বয়টি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, গলায় কোপ মারার আগে বেয়াল্লিশ বার কাটার পর দেড়বার।

দেড়বার! ভেরী নাইস ভেরী নাইস। সাধারণতঃ একবার ডেকে থাকে। আর একবার ডাকবার চেষ্টা করেছিল তাহলে।

বাবা মায়ের স্বাস্থ্য কীরকম ছিল জান নাকি?

বয়টি বিরক্ত হয়ে বললে, আপনার এ প্রশ্নের অর্থ? আমাকেও কী পাঁঠা ঠাওরাচ্ছেন নাকি?

লম্বুদা ভ্রূ কুঁচকে পিট পিট করে তাকিয়ে বললেন, নো নো মাইডিয়ার বয়। তুমি পাঁঠা হতে যাবে কেন? মাংসটা যেহেতু আমাদের পেটে ঢুকবে, পাঁঠার বংশ পরিচয় কিছু জানার প্রয়োজন আছে বৈকি। বাপ মা রুগ্ন থাকলে, ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ রুগ্নই হয়ে থাকে।

আর সেই কারণে এই কৌতূহল। তোমার যদি এ খবর জানা নাও থাকে, আশাকরি খবরটা সংগ্রহ করে পাঁচমিনিটের মধ্যে আমায় জানাবে।

এই খবর পেলেই আমি অর্ডার প্লেস করব, বুঝলে ছোকরা।

লম্বুদা কথাটা উচ্চারণ করে আবার যথারীতি ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন।

দোকানের মালিক সম্ভবতঃ চেয়ারে বসে শুনছিলেন সব। লম্বুদার শেষ মন্তব্য শুনে উঠে এল চেয়ার ছেড়ে। গম্ভীর হয়ে বলল আপনি বোধহয় এটাকে নাট্যশালা ভেবে ভুল করেছেন।

লম্বুদার প্রশ্ন শুনে আমরা ইতিমধ্যেই অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। চায়ের দোকানের মালিকের এই উষ্মা প্রকাশে তাই খুব বেশী বিস্মিত হলাম না। অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা ধরে নিয়েই লম্বুদার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

লম্বুদার মধ্যে কিন্তু কোনও রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। বেশ সহজভাবেই তিনি আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন, মহাশয় কি কখনও বুদাপেস্টে গিয়েছেন?

আগন্তুক বেশ একটু থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইল লম্বুদার মুখের দিকে। সম্ভবতঃ কাটলেটের সঙ্গে বুদাপেষ্টের কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেই চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লম্বুদা বোধহয় এটাই চাইছিলেন। হঠাৎ হা-হা-হা-হা- করে হাসতে হাসতে বললেন, যাননি নিশ্চয়ই। গেলে আমাদের এরকম অপদস্ত হতে হতনা বা আপনিও এমন বে-আইনী কাজ করতেন না।

আগন্তুক বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে লম্বুদার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। লম্বুদা ঘাড় নেড়ে বললেন, একজ্যাক্টলি। বুদাপেস্টের যে কোনও রেস্তোরাঁয় যান, দেখবেন যে পাঁঠাটি সেদিন সেখানে রান্না হয়েছে, তার দাদু ঠাকুমার থেকে শুরু করে সকলের স্বাস্থ্য, ওজন, ফ্যাটের পরিমান, রূপ, গুণ ইত্যাদি সবকিছুই বোর্ডে লিখে টাঙান আছে।

অর্থাৎ যারা মাংসের চপ কাটলেট ইত্যাদি খেতে ইচ্ছুক, তারা পাঁঠার সবিশেষ পরিচয় জেনে তবেই হোটেলে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করে আর কিছুই প্রশ্ন করা চলবে না।

এতে উভয় পক্ষের সুবিধা, কী বলেন? লম্বুদা আগন্তুকের দিকে ঘুরে তাকালেন।

আগন্তুক এমনভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে সেখান থেকে সরে পড়ল, খবরটা আদৌও তার মনপূতঃ হল কিনা কিছুই বোঝা গেল না।

লম্বুদার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। তাঁর এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি আদায় করবার জন্যই বোধহয় আমাদের দিকে তাকালাম।

আমরা প্রায় একবাক্যেই চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম 'টপ' বলে, ভাগ্য ভাল মুখ ফুটে বেরিয়ে আসার মুখে ঠোঁটে আটকে আমাদের মুখ রক্ষা করল।

বুদাপেস্টে না যাওয়া পর্যন্ত যে লম্বুদার ঘাড় ভেঙ্গে চপকাটলেট খাওয়া যাবে না

সেটা মুহূর্তের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের মধ্যে। আর সেখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। রেস্তোরাঁ ছেড়ে অগত্যা আমরা রওনা দিলাম আমাদের আড্ডাঘর অভিমুখে।

পথে অবশ্য লম্বুদা তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য রক্ষা করেই চলছিলেন।

আমরা নিজেদের মধ্যে টুকিটাকি যেসব কথা বিনিময় করছিলাম লম্বুদা তাতে অংশ গ্রহণ না করলেও কান তাঁর এদিকে সজাগই ছিল।

বেশ কিছু পথ হাঁটার পর বাস্তব একখানা মিনিবাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল লম্বুদার। বললে, অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। চলুন মিনি বাসে যাই। ষোলজনের সীট আছে। যেতে আমাদের কোনই অসুবিধা হবে না।

লম্বুদা আড়চোখে বাস্তবের দিকে তাকালেন। একমিনিট নীরবে তার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন, এখানে মিনিবাসের ভাড়া কীরকম হে?

বাস্তব বলল, চড়লেই একটাকা ষাট নয়া। এমন কিছুই বেশি নয়।

ওনলি! নাথিং অ্যাট অল!! বেচুয়াল্যান্ডে মিনিবাসের যা ভাড়া একখানা গাড়ী কেনা যায়। প্রথমদিন মিনিবাস চড়ে যা বেকুব বনে গিয়েছিলাম, লম্বুদা ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে মুখে চিড়িক করে একটা শব্দ করলেন।

নিজদের দেশের গাড়ীভাড়ার খবরই আমরা রাখি না। বেচুয়া ল্যান্ডের গাড়ী ভাড়ার হার আর আমরা জানব কী করে?

তাঁর মুখ থেকে এখবর শুনে আমরা বেশ কিছুটা অবাক হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লম্বুদা আবার আড়চোখে আমাদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখবুলিয়ে নিয়ে বললেন, আর ইউ ইন্টারেস্টেড? যদি ইন্টারেস্টথাকে আমি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারি।

তামাম পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু তোমাদের অবস্থাতো শোচনীয় বলেই বলছি।

লম্বুদা আমাদের শোনাতে চান অথচ আমরা শুনব না এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসের যে কোনও শ্রেষ্ঠ ঘটনারই সামিল। আমরা খুশী মনেই আমাদের সম্মতি জানিয়ে দিলাম লম্বুদাকে।

পরিণাম কিন্তু ভালই হল। অর্থাৎ খুশীতে ডগমগিয়ে উঠলেন এবং চুপিচুপি ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে শুরু করলেন।

খুশী হওয়া মানেই আমরা ধরে নিলাম কাহিনী এখুনিই শুরু হবে। শুনতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, আমরা সকলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে পথ চলতে শুরু করলাম।

পুনরাবৃত্তি যে তিনি পছন্দ করেন না একথা সকলেরই অল্প বিস্তর জানা ছিল

তাই সকলেই নিজের নিজের স্থান দখলে তৎপর হয়ে উঠল।

আমাদের কাণ্ড কারখানা লম্বুদা শত অন্যমনস্কতার মধ্যেও লক্ষ্য করছিলেন। আমরা প্রস্তুত হতে লম্বুদা বললেন, আমার মাসতুতো বোনের পিসতুতো ভাই রাকেশ একবার বেচুয়ালাণ্ড থেকে লিখল, দাদা তোমায় কতদিন দেখিনি। আমরাতো যা চাকরী এক পাও নড়ার উপায় নেই। তুমিতো সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছ। একবারটি এখানে পায়ের ধুলো দাও। খুব খুশী হব।

রাকেশের চিঠি পড়ে মনে হল, না, একবার যাওয়া দরকার। অনেক দিন ধরেই লিখছে। ওর অনুরোধের একটা মূল্য দেওয়া উচিত বৈকি।

দিলামও। সুযোগমত একবার বেরিয়ে পড়লাম বেচুয়ালাণ্ডের উদ্দেশ্যে।

যথাসময়ে পৌঁছলাম এয়ারপোর্টে। সেখানে নেমে শুনলাম তিন দিন ধরে ট্র্যাফিক জ্যামে সমস্ত গাড়ীঘোড়া আটক রয়েছে।

টার্মিনাসে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু ঘোড়ার পায়ে বাতের ব্যথা বাড়ার জন্য সে এক পা-ও নড়তে নারাজ।

গাড়ীর গাড়োয়ানকে অনেক লোভ দেখালাম। কিন্তু কোনই কাজ হল না। বললে, স্যার আপনি কী আমায় গাড়ী টানতে বলছেন!

এবার আমি অপ্রস্তুতে পড়লাম। বললাম, সার্টেনলি নট।

কী আর করব। অসহায়ভাবে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। ঘড়ির কাঁটাও যথারীতি ঘুরে চলেছে। দেখতে দেখতে তিন ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু আমার সমস্যার কোনও সুবাহা হল না। ধৈর্য আমার টঙে উঠেছে হঠাৎ দূরে হর্নের আওয়াজ শোনা গেল।

মনে মনে খুশীই হলাম এবং সাগ্রহে তারজন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

গাড়ীটা এসে পৌঁছতে দেখলাম, ওপরে লেখা আছে—মিনিবাস সার্ভিস।

কনডাকটারকে জিজ্ঞাসা করলাম, গিলগিল মার্কেটে যাবে?

সে একগাল হেসে বললে, নিশ্চয়ই যাব। উঠে পড়ুন।

এতবড় একটা দুর্ভাবনার এত সহজ সমাধান হয়ে যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এক মুহূর্ত আর দেরী না করে বাসে লাফিয়ে চড়ে বসলাম এবং মনের আবেগে একটা গান ধরলাম।

লম্বুদা থেমে গিয়ে ধূমপান শুরু করলেন।

পল্লব হঠাৎ সরব হয়ে উঠল। বললে, কোন গানটা গেয়েছিলেন আপনার খেয়াল আছে নাকি?

লম্বুদা কোনও উত্তর দিলেন না। তেমনি নীরবেই ধূমপান করতে লাগলেন।

তাঁর এইরূপ আচরণে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। প্রশ্নটি করা আদৌ উচিত হল কী না, এই চিন্তায় যখন আমরা দ্বিধাগ্রস্ত, হঠাৎ তিনি তাঁর

গোঁফের ডানায় একটু হাসি ছিটিয়ে গুণ গুণ করে একটা বাংলা গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন।

আমরা গভীর উৎসাহে সে গানটিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। রবীন্দ্র সঙ্গীত। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

লম্বুদা এলোমেলো গান করেন বটে কিন্তু এত দরদ ভরে তাকে কোনও দিনই গাইতে শুনিনি। আমাদের সকলেরই সন্দেহ হল, এই গানের উদ্দেশ্য নিয়ে।

আশংকা নিরর্থক নয়। লম্বুদা হঠাৎ গানটা থামিয়ে বললেন, বলতে পার এটা কী গান?

আমরা সবাই প্রায় এক বাক্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত বলতে, তিনি চোখ বুজে বললেন, কারেক্ট।

বিদেশের মাটি বলেই হয়ত, এই গানখানা আমার ঠোঁটের ডগায় এগিয়ে এসেছিল। অবশ্য গানটাও আমার খুব ফেভারিট, লম্বুদা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

আমাদের আর অনুরোধ করার প্রয়োজন হল না। লম্বুদা এবার নিজেই শুরু করলেন।

ড্রাইভার বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল সেখানে। কিন্তু ওই রুটের যাত্রী আর পেল না। সম্ভবতঃ পথ অবরুদ্ধ জেনেই কেউ আর সেদিন বাড়ী থেকে বেরোয় নি।

অগত্যা বাস ছেড়ে দিল।

বাসে ঘণ্টা দেওয়া মাত্রই ইঞ্জিনটা ঘরঘর করে গর্জে উঠল এবং ছুটে চলল গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে।

হু হু করে গাড়ী ছুটে চলেছে। শহরটা বেশী বড় না হলেও বেশ সাজান গোছান। অন্ততঃ আমাদের দেশের মত অত নোংরা নয়।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছি। এয়ার পোর্টের পথ বলেই, ছোট ছেলেমেয়েরা রুমাল নেড়ে আমাকে স্বাগত জানাছে।

আমি হাত নেড়ে তাদের শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলাম।

গাড়ীর গতিবেগ ইতিমধ্যে বাড়তে বাড়তে দ্রুততম পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমি একটা চুরুট ধরালাম। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে ধূমপানটা বেশ ভালই লাগতে লাগল।

গাড়ীর গতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল তোমরা হলে অনেকেই গাড়ীর দারজা খুলে চলন্ত গাড়ী থেকেই বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়তে কিন্তু আমিতো আর সে পাত্তর নই। ঘণ্টায় একশ মাইল গতিবেগে গাড়ী চালানোই আমার চিরকালের অভ্যাস। চুরুট টানতে টানতে প্রশ্ন করলাম, এটাই কী আপনার সর্বোচ্চ গতি নাকি?

ড্রাইভার ভেবেছিল আমি হয়ত বা ঘাবড়ে গিয়ে, এত দ্রুত না চালানোর জন্যই

তাকে অনুরোধ করব কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখে সে সরাসরি আমার দিকে তাকাল না বটে, কিন্তু সুমুখের আয়নার দিকে তাকিয়ে আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি না হলেও, সে যে কট্ কট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সেটা আমি অকারণ মাথা চালাচালি করেই বুঝে নিলাম। কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করলাম না। আধবোঝা চোখে মুক দিয়ে অনর্গল চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম।

ক্রমশঃ এয়ার পোর্টের চত্বর ছেড়ে গাড়ী রাজপথে নেমে মার্কেট প্লেসের দিকে এগুতে লাগল।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে রাজপথে। আমাদের কলকাতার হাওড়া ব্রীজ বা শিয়ালদা জ্যাম হলে হ্যারিসেন রোডে যেমন গাড়ীর মেলা বসে।

আর কিছুপথ এগুতেই জ্যামের পূর্ণরূপ চোখে পড়ল। শুধু গাড়ী আর গাড়ী। তা মাইল দুয়েক পথতো হবেই।

এতবড় জ্যাম অবশ্য কখনও চোখে দেখিনি। আমাদের এখানে পাঁচখানা গাড়ী গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে গেলেই এবং পেছনের গাড়ীর হর্নে সামনের গাড়ী একচুল না নড়লে সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে খবর চলে যায় এবং স্বয়ং কন্ট্রোলার সাহেব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন। কিন্তু ওরা দেখলাম নির্বিকার।

ধৈর্য ধরার একটা প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে।

আমাদের গাড়ীর ঠিক গায়েই একটা লরীতে লক্ষ্য করলাম রান্নার আয়োজন চলেছে। তিন রাত তাদের সেখানে কেটেছে। আরও কত রাত যে তাদের সেখানে কাটাতে হবে তার ঠিক নেই।

কাজেই তারা আর হোটেলের ওপর নির্ভর না করে সরাসরি লরীর ওপরেই রান্না খাওয়া শুরু করে দিয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করলেও আমার কিন্তু চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। স্থানীয় লোকেরাই যদি এই পথ ধরে আমাদের মত পর্যটকদের কীইবা হাল হবে! তাছাড়া তখন আমার পাঁচ সাত মিনিট অন্তর প্রোগ্রাম সেট হয়েছে সেখানে। এভাবে মিনিবাসে বসে হাওয়া খেলেই কী চলবে?

ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এ ব্যাপারে। বললাম, সাহেব জ্যাম জেনে শুনেও এ পথে এলে কেন। আর কি পথ ছিল না?

ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে একটা সিগারেট ধরাল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকেতো বিদেশী বলেই মালুম হচ্ছে। আপনার নাম ধাম জানতে পারি কী?

লম্বুদা মৃদু হেসে বললেন, অযথা আর কথা না বাড়িয়ে আমার একখানা ভিজিটিং

কার্ড বাড়িয়ে দিলাম। ড্রাইভার পকেট থেকে নিকেল ফ্রেমের চশমাখানা বার করে চোখে পরল এবং ঝুঁকে পড়ল কার্ডের ওপর।

নাম পড়েই একগাল হাসি। হাতখানা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। করমর্দন সেরে বলল, সত্যই আজ আমি খুব ভাগ্যবান বোধ করছি নিজেকে। আপনার ছবি দেখেছি অনেকবার কিন্তু এমন সামনা সামনি দেখতে পাব কোনদিও আশা করিনি। বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?

আমি আপাততঃ গন্তব্যস্থলে পৌছান ছাড়া আর কিছুই চাইছি না। তুমি যদি কোনওরকমে সে কাজটা করতে পার তাহলেই খুশী হব।

ড্রাইভার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির আড়ালে একটু মুচকি হেসে সীটের তলায় হাত দিয়ে একটা বোতাম টিপতেই দরজার দুপাশ থেকে দুখানা ডানা বেরুল ঘটাং করে এবং থর থর করে কাঁপতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সাঁকরে উড়ে গেল শূন্যে।

ড্রাইভার মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ফর ভি. আই. পি'জ ওনলি!

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম অজস্র গাড়ীর স্রোত। গাড়ীর মাথায় কেউ বা হাত পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে, কেউবা বই পড়ছে, আবার কেউ কেউ দলবেঁধে তাস পিটছে। একজন অত্যুৎসাহী এক গাড়ীর মাথা থেকে আর এক গাড়ীর মাথায় জোড়া পায়ে লাফ মেরে লঙ জাম্প অভ্যাস করছে।

একটা গাড়ীর মাথায় একজোড়া ছেলে মেয়ে পশ্চিমী ঢঙে অঙ্গভঙ্গী করে টুইস্ট নাচছে আর আশে পাশের গাড়ীর মাথায় দাঁড়িয়ে দর্শকেরা তা উপভোগ করছে। এমনতর অনেক বৈচিত্রপূর্ণ দৃশ্য দেখতে দেখতে জ্যাম পেরিয়ে গেলাম।

'গঁক' করে একটা গোঁততা মেরে হঠাৎ মিনিবাসটা নেমে এল পথেতে এবং যথারীতি গন্তব্যস্থলের দিকে এগুতে লাগল।

রাকেশের বাড়ীটা একটা গলির মধ্যে। গলির মুখেই ড্রাইভার আমাকে ছেড়ে দিল।

ড্রাইভারটা ইংরেজী বুঝত। কপয়সা প্রশ্ন করতেই সে হেসে লুটিয়ে পড়ল সীটের ওপর। গড়াগড়ি খেতে খেতে বললে, তুমি একজন পৃথিবী বিখ্যাত জিনিয়াস। তুমি ভাড়া না দিলেও কিছু এসে যায় না। বরং সেটা আমাদের সৌভাগ্যই বলতে পার।

কিন্তু তাই বলে ভেবোনা এটা কালকুত্তু।

এটা বেচুয়াল্যাণ্ড। ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে তোমাকে একহাজার পাঁচশ সাতানব্বই টাকা সাঁইত্রিশ নয় পয়সা দিতে হবে।

শুনেত আমার চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। আমাদের এখানে এইটুকু পথ যেতে বড়জোর দশ টাকা লাগে। তার জায়গায়—

নবাগত পেয়ে যে আমায় ঠকাচ্ছে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে

আমি ওর হাতে পঞ্চাশ টাকা গুঁজে দিতেই ও আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তারপর আমাকে ডেকে নিয়ে গেল গাড়ীর সামনে।

চাকা দুটো দেখিয়ে বললে, একটু ভাল করে লক্ষ্য করুন তো।

গাড়ীর চাকা যেমন হয় এ দুটো তেমনই। বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। আমি একবার চাকা দেখতে লাগলাম আর একবার ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

সে হেসে বললে, ধরতে পারেন নি মনে হচ্ছে। আঙ্গুল দিয়ে চাকাটা টিপুন তাহলেই মালুম পাবেন।

তার কথা মত চাকা টিপতেই আঙ্গুল বসে গেল তার মধ্যে বেশ কিছুটা।

সে হেসে বলল, এতক্ষণ হাওয়া টাইট ছিল। আপনি যা ভাড়া দিতে চাইছেন, শুনে হাসতে হাসতে ওর দম ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই চাকার ওই অবস্থা।

তার এই জোক শুনে আমি যেমন খুশী হলাম তেমনি আবার লজ্জিতও হলাম।

অবশ্য ভারতের সুনাম রক্ষার্থে আমি ওই পরিমাণ টাকাই ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম বলে লম্বুদা হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন। এবং শূন্যে বড় বড় ধোঁয়ার রিঙ ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার কাণ্ড সকলের চোখ এড়ালেও আমার এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছনদিকে তাকিয়ে দেখলাম, যে মিনিবাসটায় চড়বার জন্য আমরা লম্বুদাকে পাকড়েছিলাম সেটা এত ব্যবধানে চলে গিয়েছে, ধরতে গেলে এখন হেলিক্যপটার ছাড়া গত্যন্তর নেই।

লম্বুদার মিনিবাস চড়ার অভিজ্ঞতা হঠাৎ বলতে শুরু করা এবং অনর্থক দীর্ঘ করার কারণ আমাদের কাছে জলের মতই পরিষ্কার হয়ে উঠল।

এদিকে দেখতে দেখতে আমরা আড্ডাঘরে এসে গেলাম। লম্বুদা প্রায় চোখ বুজেই ঘরে প্রবেশ করলেন। চুরুটটি যথারীতি তার ঠোঁটের কোণায় ঝুলতে লাগল।

মিনিবাস না চড়লেও আমাদের অসুবিধা হয়নি কিছুই। লম্বুদার সাহচর্যই তার প্রধান কারণ। তাঁর গল্প শোনার ফাঁকে এতখানি পথ যে কীভাবে পেরিয়ে এসেছি তার কিছুই খেয়াল নেই আমাদের।

লম্বুদা চুরুটটি জুতোর সোলে চেপে নেভালেন। এবং সযত্নে পকেটে রেখে দিলেন। জলের কুঁজোটা মাটি থেকে তুলে নিলেন শূন্যে। ঝাঁকিয়ে জলের পরিমাণটা অনুমান করে নিয়ে হোস পাইপের মতই জল ঢালতে লাগলেন মুখের মধ্যে।

যে পরিমাণ জল তার জঠরদেশে প্রবেশ করল, অন্নপ্রাশন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ততো জল খেয়েছি কীনা সন্দেহ। বাস্তব লোভ সামলাতে না পেরে কী যেন একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল কিন্তু চমকের ইশারায় সে নিবৃত্ত হল।

চমক মুখটা তার কানের কাছে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললে, তোর আমার মত এ ডালডা পোরা মাথা নয়।

খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ঠাসা মাথা। অত আঁচ লাগলে স্টীম হয়ে উবে যাবে।

বাস্তব চমকের অনুরোধ রাখল।

লম্বুদা জল খাওয়া শেষ করে চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসলেন এবং চুরুটটা ঠোঁটের কোণায় টিপে ধরে গুণ গুণ করে একটা ইংরিজী গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন।

লম্বুদার জলপান দেখাদেখি অনেকেরই তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠল। যেটুকু জল লম্বুদার চন্নমেত্তর হয়ে কুঁজোতে পড়েছিল, তারা সেইটুকুই নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল এবং নিমেষের মধ্যে কুঁজো নিঃশেষ করল।

যারা তা থেকে বঞ্চিত হল, তারা একটি করে ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মাত্র। বাইরে থেকে জল এনে তৃষ্ণা মেটানোর মত আগ্রহ কারুরই ছিল না।

তবে এ ঘটনা মাত্র কয়েকমিনিটের। তিনি যথারীতি আমাদের গুলতানি শুনলেও, মাথা গলালেন না। আপন মনেই চুরুটের ধোঁয়া দিয়ে শূন্যে নানারকমের খেলা দেখাতে শুরু করলেন।

আমরা পারস্পরিক কথোপকথনে ব্যস্ত থাকলেও, সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। আমরা আড়চোখে তা প্রত্যক্ষ করে বেশ আনন্দই পেতে লাগলাম।

কার্তিক এতক্ষণ উসখুস করছিল। হঠাৎ লম্বুদার দিকে ফিরে বলল, যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে একটা প্রশ্ন করব।

লম্বুদার কর্ণকুহরে প্রশ্নটা প্রবেশ করল, কেবলমাত্র তাঁর চোখ বুজিয়ে মুচকি হাসি দেখেই বোঝা গেল। তিনি প্রায় এক মিনিট এই হাসির রেশ টেনে রেখে, অবশেষে মুখ খুললেন। বিড় বিড় করে বললেন, প্রশ্ন করবে তার জন্য অনুমতি চাইছ। স্ট্রেঞ্জ!

আমাদের যা বয়েস, এখন কোন কাজকর্ম নয়। খালি, প্রশ্নোত্তরই দেব। তাহলে আর নেক্সট জেনারেশনকে অজ্ঞতার অন্ধকারে পস্তাতে হবে না। যাহোক, পরের কথা পরে। এখন তোমার প্রশ্নটা কী শুনি?

কার্তিক অবশ্য তৈরী হয়েই বসেছিল। বললে, আপনার জীবনের রোমাঞ্চকরতম ঘটনাটা কী জানতে পারি?

কার্তিকের প্রশ্ন শুনে সাপের গায়ে পা পড়ার মতই লম্বুদা চমকে উঠলেন। তার মুখের দিকে এক মিনিট নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, কী যেন ভাবলেন তারপর ঘরের সিলিঙের উদ্দেশে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

সাময়িক নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা ছোটখাটরকমের ধৈর্য পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। আমরা কৌতূহল চেপে রেখে, লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লম্বুদা শূন্যে সাতখানা বড় বড় ধোঁয়ার রিঙ ছেড়ে বললেন, বিশ্বের গভীরতম স্থান ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের নাম শুনেছ? এই ট্রেঞ্চে নামা এবং তার তলদেশের মাটি স্পর্শ করাই আমার জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা বলা চলতে পারে। অবশ্য এ ঘটনার ইঙ্গিত তোমরা আগেই জেনেছ!

ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের নাম আমাদের সকলের কাছেই অল্পবিস্তর পরিচিত। গুয়ান দ্বীপের দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে সাঁইত্রিশ হাজার আটশ ফুট জলের তলায় এগারো কিলোমিটার বিস্তীর্ণ অন্ধকারময় অঞ্চলই ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ নামে খ্যাত।

সংক্ষেপে তাকে মরণ গুহাও বলা যেতে পারে। ইদানীং কালে সেখানে অভিযান অবিশ্বাস্য নাও হতে পারে কিন্তু লম্বুদা যে যুগের কথা বলছেন সে যুগে এ অভিযান সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমরা সকলে হতবাক হয়ে যখন লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, তখন তরুণ সরব হল। বললে, লম্বুদা ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের প্রথম সফল অভিযানকারী হিসাবে আপনি নিজেকে দাবী করছেন বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ এ তথ্যে কিছু ত্রুটি আছে। আমি ভাল করেই জানি সুইজারল্যান্ডের পিকার্ড পরিবারভুক্ত জ্যাকস পিকার্ড ডন ওয়েলসকে নিয়ে প্রথমে এই দুর্ভেদ্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। এবং কৃতকার্যও হয়েছিলেন। এ সংবাদ আমি আপনাকে ছাপা আকারেও দেখাতে পারি।

তা সত্ত্বেও আপনি যদি প্রথম সফল অভিযানকারী বলে নিজেকে দাবী করেন আমাদের পক্ষে হাসা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকবে না।

তরুণের কথায় লম্বুদা রেগে যাবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য তিনি রাগলেনত নাই বরং তাঁর মুচকি হাসিটি আরও স্পষ্ট করে তুললেন।

তাঁর এই অভিনব চালটা কী ধরণের আমরা কেউই অনুমান করতে পারলাম না। গভীর কৌতূহলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ তিনি ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, হ্যাঁ কী নাম বললে যেন?

আমি তরুণের হয়ে উত্তর দিলাম, জ্যাকস্ পিকার্ডের নাম শোনেন নি?

তিনি কালক্ষেপ না করেই প্রথমে এক ঝলক হাসলেন। তারপর হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হা-হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

উনি যতক্ষণ হাসলেন আমরা অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

থামতে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনার এত হাসির কারণ কি ঘটল?

আমার প্রশ্ন শুনে লম্বুদার কিন্তু কোনও রকম ভাবান্তর ঘটল না। বরং আরও জোরেই হাসতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, জ্যাকস, পিকার্ড বললে কী না, তাই ফলো করতে পারিনি।

আমিত ওকে 'জুকা' বলেই ডাকি। ওর ভাল নাম আর জানার সুযোগ কোথায়।

আমিতো ওর পেছনে ঘুরিনি। ওই চিরকাল আমার পেছনে ঘুরেছে।

লম্বুদা বেশ গর্বের সঙ্গেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন এবং ঘনঘন নাক ও মুখ দিয়ে ধূম উদ্‌গীরণ করতে লাগলেন।

কার্তিক বলে উঠল, লম্বুদা আমাদের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও আমরা পেলাম না। জ্যাকস্ পিকার্ডকে আপনি 'জুকা' বলে সম্বোধন করুন আর 'হুকা' বলে সম্বোধন করুন, তার সঙ্গে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ বা মরণগুহা জয়ের সম্বন্ধ কী?

জ্যাকস পিকার্ডের কৃতিত্বটাতো আপনার ঘাড়ে চাপি দেওয়া যায় না। তাহলেতো ইতিহাসই মিথ্যা হয়ে যাবে। আপনি কী তাই চান বলুন তাহলে—

না-না-না লম্বুদা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। দর্জি পাড়ার লম্বমান দত্ত ইতিহাসকে কোনও দিনই পরোয়া করে না। সে ইচ্ছা যদি তার কোনও দিনও থাকত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের অর্ধেক চ্যাপটার তার ক্রিয়া-কলাপ ও কৃতিত্বেই ভাস্বর হয়ে থাকত।

ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতবর্ষ বলতে চিনত কেমন লম্বুদাকেই। কিন্তু সে রকম উদ্দেশ্যাতো আমার কোন কালেই ছিল না। আমি চাই তারা লম্বমান দত্তকেও যেমন চিনবে, তেমনই চিনবে এই দেশের মহান মানুষদের।

তবেইতো তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে। এবং সে গৌরবের অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই থাকা উচিত, বলে লম্বুদা সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। এবং নির্বাক হয়ে ধ্যানস্থ হলেন।

ধ্যানভঙ্গ হল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। এবং এক অনুপম অনুভূতিতে ভরে গেল তাঁর মুখ।

চরকির মত চোখের মনি দুটো সকলের মুখের ওপর কয়েকবার ঘোরানোর পর সরব হলেন। পৃথিবীর পয়লা নম্বর চৌকস মানুষ হিসাবে উনিশশো ষাট সালে সুইস অ্যাওয়ার্ড পেলাম, আমাকে যেতে হল সেখানে। সশরীরে উপস্থিত থেকে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে গ্রহণ করার জন্য।

যথারীতি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করে বেরিয়েছি, হঠাৎ ভীড়ের ভেতর থেকে জুকা বেরিয়ে এসে, আমাকে জাপটে ধরে বললে, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন।

আমি বললাম, ডেফিনেটলি। অনুরোধ রাখব না এটা কী একটা কথার কথা হল, অবশ্য যদি আমার ক্ষমতার বাইরে না হয়।

জুকা বলল, আপনি হোটেলে উঠতে পারবেন না। আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনি আমাদের আতিথ্য স্বীকার করবেন। আমরা স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাব।

জুকা এই আমন্ত্রণ জানানোর পর, সুইজারল্যান্ডের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ

থেকে ওই একই ধরণের আমন্ত্রণ আসতে শুরু করল।

কিন্তু যেহেতু জুকা প্রথম এসে আমায় এই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আমি সানন্দেই ওদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। কারণ পদমর্যাদায় যে যত বড়ই হোক না কেন মানুষ হিসাবে সকলেই আমার কাছে সমান। এবং সে মর্যাদা আমি সকলকে সব সময়েই দিয়ে থাকি।

আমার এই ঔদার্যে জুকা অবশ্য খুবই আনন্দিত হল। বাঘা বাঘা লোকদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে আমি যে ওর আমন্ত্রণ রাখব ও বোধহয় স্বপ্নেও তা ভাবতে পারে নি।

প্রায় হাজার খানেক অটোগ্রাফ দিয়ে আমি যখন ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম, তখন অল্পবিস্তর ক্লান্ত হয়েই পড়েছি। জুকা অবশ্য গাড়ী দাঁড় করিয়েই রেখেছিল বাইরে।

কুতূহলী জনতার ভেতর থেকে আমি একরকম লাফ মেরেই উঠে পড়লাম গাড়ীতে। জুকা স্টার্ট দিয়েই রেখেছিল। গাড়ীতে পা দেবামাত্রই নিমেষের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে।

জুকার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটলেও তার বাড়ীর লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনও সুযোগ ঘটেনি তখনও। তাই বেশ সঙ্কোচেই ঢুকলাম। কিন্তু ওদের ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং আবিষ্কারে সদিচ্ছা আমাকে মুগ্ধ করল।

আদর আপ্যায়ন খুবই পেলাম। রাতের ডিনার শেষ করে আমি লনে একটু পায়চারি করছি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ঘরে বসে জুকা খুব নিবিষ্ট মনে একটা প্রকাণ্ড বেলুন সামনে রেখে কী যেন চিন্তা করছে।

কৌতূহলবশতঃ তার অনুমতি না নিয়েই ঢুকলাম ঘরেতে। আমাকে দেখে জুকা সসব্যস্ত হয়ে উঠল এবং আমাকে কীভাবে খাতির করবে ভেবে না পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

আমি ওর ব্যস্ততা দেখে কিঞ্চিৎ বিব্রতই হলাম। ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, না না, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বেলুনটা দেখেই ঘরে ঢুকেছি। এটা তোমার কী কাজে লাগবে শুনলে খুশী হব।

জুকা মৃদু হাসল। নেহাতই ছেলেমানুষী হাসি। চাঁদে যেতে হলে বেলুনটা কী ভাবে কাজে লাগান যায় সেইকথাই চিন্তা করছি।

খানিকটা সময় কাটানোই বলতে পারেন।

জুকা কিন্তু যত সহজে কথাগুলো উচ্চারণ করল, এরপর এ ব্যাপারে আর কোনও প্রশ্ন করা আমার পক্ষে সমীচীন বলে মনে হল না।

এক ফোঁটা দুধের বাচ্চার কাছে এর বেশী আর জানতে চাওয়া যায় কী করে? একটা প্রেসটিজ আছে তো! বরং গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলাম, এনি ডিফিক্যালটি?

জুকা বলল মোটামুটি কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু বায়ুস্তর অতিক্রম করার সময় আগুন ধরে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বেলুন তো!.

আর আগুন ধরে যাওয়া মানেই বুঝতে পারছেন। সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। স্বল্প খরচে এই বিপর্যয় বাঁচাবার মত আর কোনও হাতিয়ার পাচ্ছি না! তাই ভাবছি এই মুহূর্তে বেলুন আকাশে ছাড়া উচিত হবে কী না।

জুকার সুবিধা অসুবিধা পুরোপুরিই উপলব্ধি করে বললাম, তুমি আধঘন্টা অপেক্ষা করতে পারবে?

সে আমার মুখের দিকে এক মিনিট নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, কেন বলুনতো? আপনার কী লাভ হবে তাতে?

প্রশ্ন শুনে আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, অপেক্ষা করতে বলছি তোমারই স্বার্থে, আমার নয়। অর্থাৎ তুমি যদি আধঘন্টা অপেক্ষা করতে পার, আমি তোমার বেলুনখানা নির্বিবাদে ফিরে আসার ব্যবস্থা করতে পারি।

সত্যি? বলে সে আমার হাতখানা চেপে ধরল। এবং মুখটা আমার কানের কাছে এনে ফিস ফিস করে বলল, আপনি যদি সত্যিই পারেন, আমি সারাজীবন আপনার ক্রীতদাস হয়ে থাকব।

আমি ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, না না তার প্রয়োজন নেই। তুমি বীরের মতই বাঁচ—একজন বরেন্য বীর রূপে, আমি সেই কামনাই করি। জুকা মাথা নীচু করে আমায় অগ্রিম কৃতজ্ঞতা জানাল।

ঘাড় বাড়িয়ে দায়িত্ব তো নিলাম। কী ভাবে সে দায়িত্ব পালন করব সেই চিন্তাই মাথার মধ্যে কটকট করতে লাগল।

অবশ্য এ অস্বস্তি সাময়িক। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা খেলতে শুরু করলে, আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, প্রবলেম সলভড্। আর কোনও চিন্তা নেই।

আমার আশ্বাসবাক্য বোধহয় ওর মনঃপুত হল না। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল যেমন—

আমি বললাম, এই বেলুনটাকে শূন্যে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আর একটা বেলুন তৈরী কর। দেখ যেন চারপাঁচ ফুটের বেশী ব্যাস না হয়।

বেলুন তৈরী করার প্রস্তাব শুনে সে ফ্যাল ফ্যান করে আমার মুখের দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে বললে, তা না হয় করলাম। কিন্তু তাতে কী লাভ হবে?

আমি হেসে বললাম, বৈজ্ঞনিক হতে গেলে ধৈর্য চাই। ধৈর্য ধরেই শোন যা বলি।

এই যে বেলুনটা তৈরী হবে এর মধ্যে অগ্নি নিরোধক গ্যাস ভরা হবে। তারপর

আলপিনের সাহায্যে সারাগায়ে ফুটো করে দিতে হবে। এবার তোমার বেলুনের মাথায় বেঁধে ছেড়ে দাও—ব্যাস্ কাম ফতে।

বড় বেলুন ওঠার আগে ছোট বেলুন গ্যাস ছাড়তে ছাড়তে ওপরে উঠবে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে বড় বেলুনের সঙ্গে বায়ুস্তরের যতই সঙ্ঘর্ষ হোক না কেন, মাথার ওপরে অগ্নি নির্বাপক গ্যাস থাকায় তখুনি তা নিভে যাবে।

চাঁদে পৌঁছানোর পথে আর কোন বাধাই থাকবে না।

বাজী ফেলে পান্তুয়া খাওয়ার মতই জুকা আমার কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিল। আমি নীরব হতে আমার হাত ধরে বললে, কী অসাধারণ প্রতিভা আপনার। আপনি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালালেন না কেন। সাতাশ লাখ টাকার নোবেল প্রাইজখানা ওরা আপনার বাড়ীর কড়া নেড়ে পৌঁছে দিত এতদিন।

শুনে আমি না হেসে পারিনি। বললাম, টাকার লোভ আমায় দেখিও না ব্রাদার। শুধু বিজ্ঞানে কেন ইচ্ছে করলে আমি সাহিত্য শিল্পকলাতেও নোবেল পুরস্কার পেতে পারতাম। কিন্তু টাকার মোহ আমার কোনকালেই নেই। তাই ওসব ব্যাপারে বড় একটা মাথা ঘামাইনি।

লম্বুদা হুঁ বলে মুচকি হাসলেন এবং সকলকে শুনিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, টকার লোভ থাকলে এতদিনে টাকার কুমীর হয়ে যেতে পারতাম, হুঁ।

আমার পরিকল্পনা মতই জুকা বেলুন ছেড়েছিল। বেলুন একনাগাড়ে তিপান্ন হাজার ফুট ওঠার পর হঠাৎ মূল বেলুনের গায়ে বড় ছেঁদা সৃষ্টি হতে তারপক্ষে আর ওপরে ওঠা সম্ভব হয়নি। সে বেলুন ফিরে এল মাটিতে।

এই ঘটনার পর থেকে জুকার অগাধ বিশ্বাস জন্মাল আমার ওপর। আমাকে সে একজন টপ বৈজ্ঞানিক ভেবেই আমার সঙ্গে তার পরবর্তী অভিযানের ব্যাপার পরামর্শ করতে চাইল। সিরিয়াসলি বলল, মহাকাশে পাড়িতো দিলাম এবার অতল সাগরে পাড়ি জমাবার কথা ভাবছি।

শুনে আমি আনন্দ প্রকাশ না করে পারলাম না। পিঠ চাপড়ে বললাম, একসেলেন্ট আইডিয়া। এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কেউ মাথা ঘামায়নি। তুমি যদি সফল হতে পার অ্যাডভেঞ্চারের ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। উঠে পড়ে লেগে যাও আমার মন বলছে তুমি সফল হবেই।

আমার কাছ থেকে ভরসা পেয়ে খুশীতে সে ডগমগ হয়ে উঠল। চট্ করে আমার সামনে মাথা নত করে বললে, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আপনার নির্দেশ সফল করতে পারি।

আমি মাথায় হাত রেখে বললাম, মে গড ব্লেস ইউ।

জুকা আমার পা থেকে ধুলো নিয়ে মাথায় রাখল।

আমি যথারীতি দেশে ফিরে এলাম। জুকা সাগর অভিযানের তোড়জোড় চালা[illegible] লাগল।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে জুকার কোনও সাড়াশব্দ নেই। চিঠির উত্ত[illegible] পেতে বিলম্বের কারণ নির্ণয় করতে খুব একটা অসুবিধা হল না। বড় রকমের কোন[illegible] কাজে এ ধরণের ভুল ত্রুটি হতেই পারে।

আমার অনুমান মিথ্যা হল না। কদিন পরেই চিঠি এল তার। লিখল, গুয়া[illegible] দ্বীপের দুশো পঞ্চাশ মিটার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে সাঁইত্রিশ হাজা[illegible] আটশ ফুট জলের তলায় এগারো কিলোমিটার বিস্তীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানই পৃথিবী[illegible] বিখ্যাত অজেয় ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

এই ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে অভিযান চালাবার মত দুঃসাহস এখনও কারও হয়নি[illegible] আমি স্থির করেছি, পাতালে যদি অভিযান চালাতেই হয়, এখানেই চালাব। হয়ত [illegible] এতে আমার জীবন হানির আশঙ্কা থাকবে, তা থাক, তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠি[illegible] নই।

আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা পেলে, আমি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবই।

তবে এই অভিযানে পাড়ি দেবার জন্য যেটা একান্ত এবং এখুনি প্রয়োজন সেটা হল একটা ডুবোযান। বর্তমানে এই ধরণের একখানি ডুবোযান নির্মাণে আমি ব্যস্ত আছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উত্তর দিলাম। তোমার অভিযান যে যথেষ্ট দুঃসাহসিক এবং গৌরবমণ্ডিত এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আমার এক কণা সাহায্যও যদি তোমার প্রয়োজন হয় তুমি কিন্তু জানাতে ইতস্ততঃ কর না। একটা কথা মনে রেখ—আমি তোমার সাফল্য লাভের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে পারি।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। হাজার কাজের চাপে আর খবরাখবর নেওয়া হয় নি।

সেদিন সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট করতে বসেছি হঠাৎ ফোন বেজে উঠল ঝন ঝন করে। রিসিভার তুলতেই এক্সচেঞ্জ থেকে অপারেটর জানাল ওভারসীজ ট্রাঙ্ককল আছে।

ওভারসীজ ট্রাঙ্কল মানে বুঝতেই পারছ। আমেরিকা, লন্ডন, রাশিয়া ইত্যাদি কোনও না কোনও স্থান থেকে সরাসরি ফোন মারফৎ কেউ কথা কইতে চাচ্ছে।

শুনে তোমরা স্টাচু হয়ে যেতেও পার। আমার কাছে কিন্তু কিছুই নতুন নয়। মর্তমান কলাটায় কামড় বসিয়ে ফোন ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অপ্রত্যাশিত। সুইজারল্যান্ড থেকে জুকার বউ মিসেস ইলিউচি ফোন করছে।

স্বাগত জানিয়ে বললাম, হ্যালো কী সমাচার। কর্তা কোথায়?

ইলিউচি ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। বলল, ভেরী স্যাড!

আমি একটু ঘাবড়িয়েই গেলাম। ফোনে এধরণের ঘটনার জন্য আমি ঠিক তৈরী ছিলাম না।

একটু আশ্বস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন কিছু বিপদ ঘটেছে নাকি?

ইলিউচি ধরা গলায় বিড় বিড় করে কী যেন বলল। আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। ঘটনাটা কি?

ইলিউচি ধরা গলায় বললে, না কিছু এখনও ঘটেনি। ঘটতে যাচ্ছে!

যেমন—

ইলিউচি জবাব না দিয়ে আবার ফোঁপাতে লাগল.....

আমি প্রায় বার তিরিশেক হ্যালো হ্যালো বলার পর, ইলিউচি বললে, জুকা একটা ডুবোযান তৈরী করেছে গভীরতম সাগরে অভিযান চালানোর জন্য।

এই দুঃসাহসিক অভিযান আমার কাছে খুব ভাল ঠেকছে না। এই ডুবোযান জলের তলা থেকে আদৌ উঠে আসতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আপনি যদি কাইন্ডলি ওকে এই পাগলামি থেকে নিবৃত্ত করেন তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

তার এই অনুরোধে বিব্রত হলাম। আমি চিরকাল দুঃসাহসিক কাজের ভক্ত হয়ে কী করে অপরকে নিবৃত্ত করি।

এদিকে ইলিউচির অনুরোধও ঠেলবার নয়। আমার কোনও কাজের জন্য আমার দেশ কারুর চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবে, এ যে আমার স্বপ্নেরও বাইরে।

দেশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। একটা কিছু ফয়সলা করতে।

সেখানে পৌছে শুনলাম জুকা বাড়ীতে অনুপস্থিত। বিশেষ কাজে সে ফ্রান্সে গিয়েছে। ফিরতে কিছুদিন দেরী হবে।

ইলিউচি আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, জুকা যে রকম জিদ ধরেছে, কারো ক্ষমতা নেই ওকে আটকায়। জলের তলায় গিয়ে ও নির্ঘাত হাঙরের পেটে যাবে। জেনে শুনে ওকে কী করে ছাড়ি আপনিই বলুন না কেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সবইত বুঝেছি কিন্তু তাকে অনুরাধ করার বেশী আর কীই বা করতে পারি। আর বললেই বা সে কথা রাখবে কেন।

ইলিউচি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যেন আমার কোন কথাই তার কানে ঢুকছে না। অমি থামতেই সে আবার তার পুরানো জিদে ফিরে গেল।

এদিকে জুকার কথাও আমার কানে বাজছে। 'বীরেরা একবারই মরে, কাপুরুষেরা সহস্রবার। তবে আর আমি মিছিমিছি ভয় পেতে যাব কেন। আমিত হাজার বার

মরে বেঁচে থাকতে চাই না।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন দুনৌকাতেই আমাকে পা রাখতে হবে। দুনৌকাকেই বাঁচানো আমার কাজ।

আমি এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললাম, অল রাইট। এক কাজ করা যাক বরং জুকা এখানে নেই। ফিরতেও যখন তার বিলম্ব হবে, এই অবসরে আমি নিজে পৃথিবীর গভীরতম তলদেশটা একবার চক্কর দিয়ে আসি। যদি দেখি তেমন বিপজ্জনক তাহলে আর জুকাকে নাবতে দেব না। আর যদি না হয়—

ইলিউচি আমার মুখের দিকে এক মিনিট তাকিয়ে থেকে কী চিন্তা করল। তারপর হঠাৎ আমার হাত ধরে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে বলে উঠল, সত্যি! কী মহানুভব আপনি। এমন মহানুভবতা আমি আজন্ম দেখিনি।

পঞ্চাশ ফুট লম্বা ও বারো ফুট চওড়া 'ট্রিসটি' নামে যে ডুবো যানটা জুকা তৈরী করেছিল দেশবাসীর কাছ থেকে সংগৃহীত টাকায়, সেটা বাঁধা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে একটা বয়ার সাথে।

ডুবোযানের ইঞ্জিন ঘরের চাবি চাইতেই ইলিউচি চক্ষু ছানাবড়া করে বললো, সত্যিই আপনি যাবেন? আচ্ছা আপনার একটুও ভয় করছে না?

আমি হাসি সামলাতে পারলাম না। হা-হা-হা করে হেসে উঠে বললাম, এটা কোন অ্যাডভেঞ্চারই নয়। চাঁদে বা সূর্যে যাওয়াটাকেই আমি অ্যাডভেঞ্চার বলে ভাবি না আর এত ছেলের হাতে মোওয়া। এর যা গভীরতা তাতে ডুব সাঁতার কেটেই আমি নেবে যেতে পারতাম কিন্তু গত সপ্তাহে মাইল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ায় একটু ভয় পাচ্ছি এই আর কি।

ইলিউচির চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বলে উঠল, আপনি কী তাহলে একাই যাবেন?

একা যাবনাতো কী সঙ্গে সৈন্যবাহিনী নেব। লম্বুদা হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

দমফাটা হাসি বেশ খানিকটা হেসে লম্বুদা আবার ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন এবং ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে ফেললেন।

ধোঁয়ার কুজঝটিকায় পরস্পরকে চেনা দুস্কর হয়ে পড়ল। আমরা নাম ধরে ডেকে কথা বলা শুরু করলাম।

আমাদের গুলতানি যখন অল্প বিস্তর জমে উঠেছে, হঠাৎ লম্বুদা সরব হলেন।

হ্যাঁ, যে কথা তোমাদের বলছিলাম, একমুহূর্ত আর সময় নষ্ট না করে প্রাথমিক কর্মাদিতে মনোনিবেশ করলাম।

আসা যাওয়ায় দু দিন লাগলেও আমি পনের দিনের মতই খাবার দাবার, ওষুধপত্র এবং সাজপোষাক ইত্যাদি সংগ্রহ করে ডুবো যান বোঝাই করতে লাগলাম।

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বোঝাই করে পরের দিন ভোর রাত্রে, ট্রিসটি চড়ে বহু ত্যাশিত ঐতিহাসিক পাতাল অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলাম। ট্রিসটিতে উঠে আমি তিমধ্যেই তার কলকব্জা পরীক্ষা করে রেখেছিলাম। কাজেই ওদিকে আমি প্রায় শ্চিন্তই ছিলাম। যদিও তেমন কোনও ভয় আমার ছিল না। সাঁতারে আমার অনেব াতীয় রেকর্ড আছে।

নিশ্চিন্ত হতে আমি স্টিয়ারিঙ ধরে সেলফ স্টার্টারে মৃদু চাপ দিলাম। সঙ্গে ঙ্গেই ট্রিসটি গর্জন করে উঠল। এবং ধীরে ধীরে নীচে নাবতে শুরু করল।

আমার মুখের সামনেই কাঁচের জানালা। জানালা এমনভাবে তৈরী, খুললে জল চ্ছন্দে ঢোকবার কোনও উপায় নেই। ধাক্কা। খেয়ে তবেই ভেতরে কিছু জল ঢুকতে ারে।

আর মাত্র এই ইঞ্চি বাকী। এক ইঞ্চি ডুবলেই ট্রিসটি মানুষের চোখের আড়ালে লে যাবে।

সাময়িক এক অজানা আশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেও যথেষ্টই কৌতূহল অনুভব করতে লাগলাম।

হঠাৎ চ্যাঁক চ্যাঁক করে দুবার শব্দ হল। শব্দের চরিত্র এবং তার উৎপত্তি নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু শব্দটা বাইরে থেকে আসার ফলে কোনও প্রকারেই বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখা সম্ভব হল না। দুশ্চিন্তা যখন মনের ওপর ছায়াপাত করতে শুরু করেছে, হঠাৎ কাঁচের জানালার বাঁদিকে দৃষ্টি পড়তেই চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ডিউজ বলের মত দুটো গোল গোল লাল চোখ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অন্য কেউ হলে হয়ত নির্ঘাত সেখানেই মূর্চ্ছা যেত আমি বলেই ঘাবড়ালাম না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চোখের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত সে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। আকস্মিক লেজ গুটিয়ে সে ঘুঁৎ করে ডুব মারলো জলের মধ্যে। বৃহদাকার লেজটা দেখে বুঝলাম ওটা তিমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অভিযানের সূচনায় অভিজ্ঞতাটা ভালই হল। এদিকে ট্রিসটিও ধীরে ধীরে নীচে নাবতে লাগল। গতিবেগ তখন প্রায় প্রতি সেকেন্ডে তিন ফুট।

কাঁচের মত স্বচ্ছ নীল জলের ভেতর তখন সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

নানা জাতের জলজ উদ্ভিদের মধ্যে রং-বেরঙের মাছেরাও মনের আনন্দে খেলা করছে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। সাপের মত লম্বা একটা মাছ হঠাৎ বড় হতে শুরু করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিগুণ আকার ধারণ করল।

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য ঠেকতে, চোখ দুটো দুহাতে ভাল করে রগড়ে নিলাম। কিন্তু কোনও রকম দৃশ্যান্তর ঘটল না। বরং দ্বিগুণ আকার প্রাপ্ত সাপটাকে অবাধেই সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম।

সাপের কীর্তিটা যখন মোটামুটি বোঝবার চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে ট্রিসটি আরও খানিকটা তলিয়ে গেল জলের তলায়। এবং জলের ভেতরকার স্বচ্ছতা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

বাইরে দৃষ্টি রাখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি ভেতরের যন্ত্রপাতির প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। সব কটি মেশিনই ঠিক ঠিকমত চলছে।

মাঝে মাঝে ঘড়িও দেখছি।

নীল বর্ণের একটা মাছ এসে সামনের কাঁচে মুখ ঘষতে লাগল। মাছটা দেখতে খুব সুন্দর। গায়ের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে তার চোখের রঙ।

তার নীল চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমি কেমন সম্মোহিত হয়ে গেলাম। কীভাবে মাছটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অ্যাকুইরিয়ামে পোরা যায় সেই চিন্তায় কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

অন্যমনস্কতার জন্য অবশ্য আমার সতর্কতায় কোনও রকম শৈথিল্য আসেনি। এই ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের ভেতরটা আমার কাছে সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। ছোটখাট পাহাড় বা শিলাজাতীয় কঠিন কিছু যদি সাগর গভীরে থেকে থাকে এবং আমার অসাবধানতার জন্য ট্রিসটি যদি তার প্রচণ্ড বেগ নিয়ে তাতে ধাক্কা মারে শুধু ট্রিসটিই গুড়িয়ে যাবেনা, আমার জীবন সংশয়ও ঘটতে পারে।

আমার ডানদিকে আর একটা জানালা ছিল বটে, কিন্তু সেটা কেবলমাত্র জরুরী অবস্থার জন্য। ওপরে কিছু লেখা না থাকলেও লাল লাইটে তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

নীল মাছটা ধরার আশা যখন প্রায় বারো আনাই ছেড়ে দিয়েছি হঠাৎ নীচে কাঠের পাটাতনে চিড়িক করে একটা শব্দ হল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আঁতকে উঠলাম।

আমার পায়ের ঠিক নীচেই বেশ কিছুটা জায়গা চিড় খেয়েছে।

একটু যে ভয় না হল তা নয়। তবে যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক মত কাজ করার জন্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা সামলিয়ে নিলাম।

ফাটলের ওপর থেকে চোখ ফেরাতেই আবার বিস্ময়ের পালা। নীল যে মাছটা এতক্ষণ চোখের সামনে সাঁতার কাটছিল সেটা আর নীল নেই। রঙ পালটিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে।

সমুদ্রের মাছেরা রঙ পালটায় শুনেছি। পড়েছিও। কিন্তু চোখের সামনে তা দেখবার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত ঘটেনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম মাছটার দিকে। রঙ পালটিয়ে আবার কী রঙ ধরে।

প্রকৃতির এই অভূতপূর্ব খেয়ালীপনা সত্যিই বিস্ময়কর। মাছ ধরার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম ধীরে ধীরে।

অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম লোকচক্ষুর অন্তরালে এদের কর্মকাণ্ড।

ট্রিসটি এদিকে বেশ কিছুটা নেমে যাবার ফলে সামুদ্রিক জীব জন্তুর সংখ্যা ক্রমশ বিরল হয়ে পড়তে লাগল। নিঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল ইঞ্জিনের গর্জনই কানে এসে ধাক্কা মারছে।

আমি স্টিয়ারিং ধরে দৃঢ় চিত্তে বসে আছি। ঘড়িতে যথারীতি কাঁটা ঘুরছে। হিসেব করে দেখলাম প্রায় আটশ ফুটের মত নীচে নেমে গিয়েছি।

বসে বসে অনেক কথাই ভাবছি। পৃথিবীর বড় বড় আবিষ্কারকদের নামগুলো একে একে মনে পড়ছে। তাদের অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপের মধ্যে এমন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কত লুকিয়ে আছে!

কতক্ষণ যে কেটে গিয়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ পাশের রুদ্ধ জানালায় দুম দুম করে ধাক্কা মারার শব্দ হল। কোনও সামুদ্রিক প্রাণীর সঙ্গে সংঘর্ষই যে শব্দের উৎস সেটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হল না। এ ছাড়া আর কীই বা হতে পারে। আর এক বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ডই জলে ভেসে এসে এই কাণ্ড করতে পারে। সবটাই কি রকম যেন রহস্যময় ঠেকল। কিন্তু ভেবেই বা লাভ কি।

শব্দটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনিই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এবং আর একটা নতুন চুরুট ধরালাম।

যথারীতি ট্রিসটি নাবছে। যন্ত্রপাতিও ঠিক মত কাজ করে চলেছে। গতি অবশ্য প্রয়োজনানুসারে কখনও কমছে আবার কখনও বাড়ছে। বেশ কিছু পথ এইভাবেই অগ্রসর হতে হতে আবার সেই শব্দর পুনরাবৃত্তি ঘটল।

এইবার মনে একটু খটকা লাগল। পূর্বে যেটা অনুমান করে ছিলাম সেটা বোধ হয় ঠিক নয়। তা হলে এই কিছু সময় নিঃশব্দ থাকত না।

নিশ্চয়ই কিছু একটা অনুসরণ করছে ট্রিসটিকে। এ শব্দ তারই সৃষ্টি!

অবশ্য বিশাল এই সাগরে কোনও জীবজন্তুর পক্ষে এ কাজ করা তেমন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাদের শান্তির রাজত্বে ট্রিসটির মত এক বিদঘুটে যন্ত্রের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক কারণেই ক্ষোভের কারণ হতে পারে। এবং তার পরেও যদি তারা বাধাদান করে বা ভয় দেখায়, তাতে অবাক হবার মত কিছুই নেই।

আমি যে এবার একটু ঘাবড়ে না গেলাম তা নয়। কিন্তু করারই বা কী আছে? শুধু মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া।

মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি আর আমার অগ্রগতির হিসাব রাখছি। মাঝে মাঝে সামনের কাঁচের জানালা দিয়ে চোখে পড়ছে রঙ-বেরঙের মাছ ও সামুদ্রিক জীবজন্তু।

অভিযানে আত্মনিমগ্ন হবার পথে আমার আপাততঃ আর কোনও বাধা নেই। শুধু সময় আর গতির হিসাব নিকাশ করে কটা নাগাদ পৃথিবীর অন্তিম গভীরে পৌঁছা সেই চিন্তাই মাথায় পাক খাচ্ছে।

মাঝে মাঝে কেবল যন্ত্রপাতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি সেগুলো ঠিক ঠিকমত কাজ করছে কী না। যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ যদি আমার এই অভিযান পরিত্যক্ত হয়, তাহলে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

স্পীড মিটারের কাঁটাটা হঠাৎ থেমে গিয়ে কাঁপতে শুরু করাতে সে দিকে মনযোগ দিয়েছি, সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটল। তবে আগে যেমন টিমেতালে শব্দ হচ্ছিল এখন বেশ দ্রুত হতে শুরু করল। অর্থাৎ শব্দটা যেই করুক না কেন এখন যে সে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত সেটা শব্দের চরিত্রেই ধরা পড়ল।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গেলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর এক রাউণ্ড চা হোক। ব্রেনটা জ্যাম হয়ে গিয়েছে।

যদিও মাত্র একঘন্টা আগে চা খাওয়া হয়েছে, তাহলেও লম্বুদার এই আবদারকে আমরা অস্বীকার করতে পারলাম না। যে গল্প তিনি ফেঁদেছেন তাঁর পক্ষে এখন দু-চার বালতি চা খাওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

লম্বুদার জন্য তাই স্পেশ্যাল এক কাপ চা আনানোর ব্যবস্থা হল।

লম্বুদা গম্ভীর হয়ে বললেন, ট্রিপল হাফ হয় যেন।

ডবল হাফ চা আমরা অনেক খেয়েছি। কিন্তু ট্রিপল হাফ চা হয় বলে কখনও শুনিনি। স্বভাবতই তাই কিছুটা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, লম্বুদা সেটা আবার কী পদার্থ?

লম্বুদা ভ্রূ কুঁচকে আমাদের মুখের দিকে একমিনিট তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বললেন, ট্রিপল হাফ ইনডিয়ান্ ফরমূলা নয়। ফরাসীরা ট্রিপল হাফের খুব ভক্ত।

একভাগ লিকার, একভাগ গরুর দুধ আর একভাগ মোষের দুধ—ট্রিপল হাফ। ট্রিপল হাফে শুধু ব্রেন সক্রিয়ই হয় না, রীতিমত লাফাতে আরম্ভ করে।

লম্বুদা আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং ধূমপানে মন দিলেন।

চায়ের দোকানের লোকটা কেটলিতে লিকার এবং ভাঁড়ে দুধ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল এবং টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, গরুর দুধ, মোষের দুধ, গাধার দুধ, হাতীর দুধ, ইঁদুরের দুধ অত রকম আমরা সাপ্লাই করতে পারব না মশাই। এই চায়ের লিকার আর গোরুর দুধ রইল। এ থেকে যা খুশী বানিয়ে নিন।

লোকটার মন্তব্য শুনে লম্বুদা বেশ একটু বিরক্তই হলেন। বললেন, স্বাধীন হয়েছি কিন্তু চিন্তাধারায় আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পড়ে আছি।

এতই যদি আমাদের পুরাতন রীতিনীতির প্রতি মোহ, এক চামচ চায়ের পাতা চিবিয়ে

সঙ্গে এক কাপ গরম জল খেয়ে নিলেইতো ল্যাটা চুকে যেত। তাতেতো ঐতিহ্য আরও বাড়ে। কী দরকার এত আড়ম্বরের।

গজগজ করতে করতেই লম্বুদা কেটলি থেকে লিকার ঢাললেন কাপে এবং তাতে মাত্রানুযায়ী দুধ মিশিয়ে এক চুমুক গলাধঃকরণ করে বললেন, আঃ......

এক কাপ চা পান করতে লম্বুদা প্রায় বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করলেন। পুরো একঘণ্টা বিশমিনিট ধরে এক কাপ চা খেয়ে, নতুন আর একটি চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে, টিপে টিপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, হ্যাঁ কতদূরে যেন পৌঁছেছি—

আমরা সবাই উন্মুখ হয়েই ছিলাম। তাই ধরিয়ে দিতে বিশেষ অসুবিধা হল না।

লম্বুদা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, এবারের শব্দ আমাকে যথেষ্টই ভাবিয়ে তুলল। সামুদ্রিক অনেক জীবজন্তুর কথা শুনেছি যাদের দেহে তীক্ষ্ণ এমন শলাকা থাকে, যা দিয়ে তারা অনায়াসে ছোটখাট নৌকা বা স্টিমার ছেঁদা করে ডুবিয়ে দিতে পারে। সে রকম কোনও কিছুর পাল্লায় পড়লে নেহাতই মৃত্যু বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শব্দটাও যে পাশে হচ্ছে অস্বচ্ছ আবরণ থাকায় সেদিকে দেখা যাচ্ছে না। জরুরী প্রয়োজনে বাইরে যাবার একটা পথ আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে ঢোকাই দুষ্কর। অনামনস্ক হলে মাথা ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। তাই বেমালুম চেপে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখলাম না।

ঘন ঘন ধূমপান করতে লাগলাম। ট্রিসটি অবশ্য যথারীতি তার গতি অব্যাহত রাখল।

ভিসটান্স মিটারে চোখ পড়তেই টানটান হয়ে বসলাম। উনত্রিশ হাজার ফুট ইতিমধ্যে নেমে গিয়েছি সাগরের মধ্যে। কোথায়ও আলোর নামগন্ধ নেই। কবরখানার মতই চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ! সাঁইত্রিশ হাজার আটশত ফুট পৃথিবীর গভীরতম তলদেশ স্পর্শ করতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী।

আলোর স্বল্পতা হেতু এবার একটু অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম। এই মুহূর্তে যদি যন্ত্রপাতি বিগড়ে যায়, ইলিউচির কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না।

অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে খুবই অসহায় মনে হতে লাগল। ধাক্কার শব্দও ওদিকে বাড়ছে। আলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই সুইচটা চারদিকে হাতড়াচ্ছি হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। জলের ভেতর কিছু অংশ হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আলোর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা ঈল মাছ। মাছটাকে কিসে যেন তাড়া করেছে। ঈল মাছটা শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য দেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করছে এবং সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে গভীরতম সাগরদেশ।

লম্বুদা মুহূর্তের জন্য থামলেন।

আমরা মুখ চাওয়া চাউই করতে লাগলাম। বিদ্যুৎ তরঙ্গ থেকে আপনা আপনি আলোকপাত সম্ভব নয়। অন্ততঃ বিজ্ঞান তাই বলে। লম্বুদাকে প্রশ্ন করা সমীচীন হবে কিনা এই প্রসঙ্গে যখন আমরা ইশারায় মুখ চাওয়া চাউই করছি, লম্বুদা আমাদের মনের কথাটা বুঝে ফেললেন।

মৃদু হেসে বললেন, ঈল মাছের দেহ বিচ্ছুরিত আলোয় হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। ফুটফুটে সুন্দরী দুটি মৎস্যকন্যা ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে আমাকে দেখিয়ে কী যেন বলাবলি কবতে আরম্ভ করল।

মৎস্যকন্যা নিয়ে গল্প অনেক পড়েছি কিন্তু স্বচক্ষে যে কখনও তা দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। সত্য কিনা যাচাই ও উপলব্ধি করার জন্য, দেহে কটা চিমটি কাটলাম। না, অনুভূতি আমার অটুটই রয়েছে।

ঈল মাছটা ইতিমধ্যে কিছু সরে যাওয়াতে আবার আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে সুবর্ণ সুযোগ পৃথিবীর মুষ্টিমেয় কজন লোকের ভাগ্যে জুটেছে তা যে আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছে, আমি আর কী করে বুঝব। অন্ধকার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

ট্রিসটির অভিযান অবশ্য সেজন্য কোনও রকম ব্যাহত হয় নি। সে হিসেব মতই অগ্রসর হচ্ছিল তার লক্ষ্যের উদ্দেশে।

আবছা অন্ধকারে বসে আমি কেবল সেই পরমাসুন্দরী মৎস্যকন্যা দুটির রূপের কথা ভাবতে লাগলাম।

মেঘের মত ঘন কাল চুল। পটল চেরা চোখ। বাঁশীর মত নাক। আঙ্গুরের মত টুকটুকে লাল ঠোঁট। আপেলের মত লাল ফুলো গাল। আর গুড়ের মতই মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

আহা যদি মৎসকন্যা না হয়ে মানুষ হয়ে জন্মাত এতদিন কোনও না কোন রাজপ্রাসাদে রাণী হয়ে থাকত।

এলোমেলো এমন অনেক কিছুই ভাবতে ভাবতে নীচে নামছি—নেমেও গিয়েছি অনেকখানি হঠাৎ 'ছপছপ' করে জল কাটানোর শব্দ হল।

মৎস্য কন্যাদ্বয়ের প্রথম আবির্ভাবের সময়েও এমন শব্দ শুনেছিলাম। পুনরাবৃত্তি ঘটতে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম তারাই আবার আমায় অনুসরণ করছে।

এতক্ষণ আনন্দ হচ্ছিল। এবার একটু চিন্তা হতে লাগল। এদের কোনও কু-মতলব নেইত? দল বেঁধে যদি ট্রিসটিকে জলের মধ্যে টানতে থাকে, তাহলে জলের তলায় থেকেই পরলোক যাত্রা করতে হবে। বাইরে বেরুবার বা ওপরে ওঠার কোন পথই থাকবে না।

অবশ্য ওরা কী উদ্দেশ্যেই বা আমাকে অনুসরণ করবে? কীই বা লাভ এতে ওদের?

এদিকে ট্রিসটি প্রায় জমি বরাবর এল। ট্রিসটি থেকে মাটির ব্যবধান আর মাত্র ৩০০ ফুট। প্রায় নাগালের মধ্যে বলা চলে।

এখন মৎস্যকন্যাদের নিয়ে অযথা মাথা ঘামান নেহাতই মূর্খের কাজ। তাড়াতাড়ি টি. এন. টি চার্জ করে কৃত্রিম আলো সৃষ্টি করলাম এবং নীচের মাটি বরাবর কোনও রকম বাধা বিপত্তি আছে কীনা দেখে নিলাম।

নিশ্চিন্ত হয়ে সুইচ টিপতেই ট্রিসটির ম্যাগনেটিক নোঙর ডানা মেলল এবং ধীরে ধীরে মাটির ওপর চেপে বসল।

পৃথিবীর গভীরতম অন্তস্থল'স্পর্শ করে আমার যে তখন কী আনন্দ হয়েছিল কী বলব। আমি প্রায় গৌর নিতাই হয়েই কেবিনের মধ্যে নাচতে শুরু করে দিয়েছিলাম। কতক্ষণ যে নেচেছি খেয়াল নেই, হঠাৎ ট্রিসটির চকচকে দেওয়ালে ছায়া পড়তেই লজ্জিত হলাম।

নাচ থামিয়ে আমার ঝোলার মধ্যে থেকে পতাকা সমেত লোহার শিকটা বার করলাম। তারপর জানালাটা কিঞ্চিৎ সরিয়ে হাত বাড়িয়ে সেটা গেঁথে দিলাম পাতাল পুরীর মাটির মধ্যে। যদি কোনও দিন জুকা এখানে পৌঁছতে পারে, দেখতে পাবে তার প্রত্যাশিত গৌরবে ইতিমধ্যেই একজন ভাগ বসিয়ে বসে আছে। তোমরা কেউ যদি সাহস করে এখন নামতে পার, পতাকাটা দেখতে পাবে বলে লম্বুদা মুচকি হাসতে লাগলেন।

লম্বুদার গৌরবময় কাহিনীর যবনিকাপাতে যখন আমরা 'ব্রেভো' বলার জন্য প্রস্তুত হঠাৎ লম্বুদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। চুরুটে একটা জোরাল টান দিয়ে বললেন, ম্যাগনেটিক নোঙর তুলে নিয়ে যখন ওপরে ওঠার জন্য স্টার্ট দিয়েছি আবার সেই শব্দ!

মুখ ফেরাতেই দেখি পেছনে একপাল মৎস্যকন্যাসহ পূর্বের সেই সুন্দরী মৎস্যকন্যা দুটির একটি হাসি মুখে জানালা দিয়ে উঁকিঝুকি মারছে।

প্রথমবার ঘাবড়ে গেলেও এবার আর ঘাবড়ালাম না। বরং কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠলাম ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য।

কিন্তু কথা বলার কোনও উপায় নেই। আমার কথা বুঝবেই বা কী করে। অথচ একটাকেও যদি কোনও রকমে ভজিয়ে ভাজিয়ে ডাঙ্গায় টেনে আনতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসের একটা অধ্যায় অন্ততঃ আমার নামে নির্ঘাত উৎসর্গ হবে।

চেষ্টার ত্রুটি রাখি কেন। ইশারায় প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার হঠাৎ সদলবলে। কিছু বলব।

আমার প্রশ্ন উপলব্ধি করতে ওদের কোনও বেগ পেতে হল না। সেই মৎস্যকন্যাটি মুখ খুলতেই ভেতরে বিগ সাইজের কয়েকটি মণিমুক্তো চিকচিক করে উঠল। ইঙ্গি তেই বলল, এই যৎসামান্য রত্নরাজি তোমায় উপহার দিতে চাই!

উপহারের ওপর উপহার। তবে এ উপহারের চেয়েও আমি মৎস্যকন্যাটিকে উপহার হিসাবে পেতেই আগ্রহী বেশী। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফন্দীও খেলে গেল মাথায়।

গোপন জানালার ভেতর দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম ঠিক আছে, তোমার উপহারগুলো দাও আমার হাতে।

মৎস্যকন্যাটি লেজের ঝাপটা মারতে মারতে এগিয়ে এল ট্রিসটির সেই ক্ষুদে জানালার দিকে। এবং সেগুলো আমার হাতে তুলে দেবার জন্য হাতের নাগালে চলে এল।

আমি তৈরী ছিলাম। হাত বাড়িয়ে তাকে খপ করে ধরে ফেললাম। তুলোর মত তুলতুলে নরম তার দেহটা আমার হাতের মধ্যে কুঁকড়ে গেল।

ইশারায় বললাম, তোমাকে আমি এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।

মৎস্যকন্যাটির মুখের অনাবিল সেই হাসি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কট কট করে আমার মুখের দিকে এক মিনিট তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল চোঁ য়া-ক! চোঁ-য়া-ক!!

'চোঁয়াক' শব্দটি যে আপত্তিকর সেটা উপলব্ধি করলাম কিন্তু ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম দেখার মোহে ওর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই ওকে ধরে রইলাম।

মৎস্যকন্যাটি এবার পিছু ফিরে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল 'হিচিকচু' 'হিচিকচু' 'হোঁয়াচে' 'হোঁয়াচে'!!

তার এই শব্দ কটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে জলে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার অনুসরনকারী এক ঝাঁক মৎস্যকন্যা সাঁতার কাটতে কাটতে সেখানে এসে জমায়েত হতে শুরু করল।

এরা অবশ্য ওর মত অতটা সুন্দরী নয়। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ বেঁটে কেউ লম্বা, কারুর গাল ফোলা কারুর গাল চেপ্টা, কারুর নাক লম্বা, কারুর নাক চেপ্টা।

ওরা সকলে এগিয়ে আসতে মৎস্যকন্যাটি কাকুতি মিনতি জানিয়ে কী যেন বলতেই, ওরা হঠাৎ পেছন থেকে ওকে চেপে ধরল এবং সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে আমার হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা শুরু করল।

অতগুলো মৎস্যকন্যার দৈহিক শক্তি নেহাৎ কম নয়। অন্য কেউ এই অবস্থায় পড়লে নির্ঘাত একটা অঘটন ঘটত। হুঁ আমি বলেই সে ধাক্কা সামলে নিলাম।

লম্বুদা এক মুহূর্ত থেমে একটু দম নিলেন। মৃদু হেসে বললেন,—ওরা কখনও আমার সঙ্গে পারে। কতটুকুই বা ওদের দম!

ধীরে ধীরে ওরা যখন হার স্বীকার করতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ ট্রিসটির ইঞ্জিনের ভেতর 'ঘটাং ঘট', 'ঘটাং ঘট' করে একটা শব্দ হতে শুরু করল

ইঞ্জিন বিগড়ানোর আভাসে আমি যথেষ্ট আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এই আটত্রিশ হাজার ফুট জলের নীচে যদি আটকা পড়ে যাই, জীবনের অনেক পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।

একটা মৎস্যকন্যার জন্য আমি অতখানি ত্যাগে প্রস্তুত। স্বেচ্ছায় তাই মুক্তি দিলাম তাকে।

মুক্তি পেয়ে তারা ছুটে পালালেও, মণিমুক্তোগুলো আমি হাত ছাড়া করলাম না। অবশ্য সেগুলো সবই বিলিয়ে দিয়েছি বন্ধু বান্ধবদের। একটা মুক্তোয় আংটি তৈরী করেছি। তোমরা সেটা দেখতে পার বলে লম্বুদা তাঁর আংটি সমেত হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন আমাদের মুখের সামনে।

লম্বুদার আঙ্গুলে আংটি রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা সাচ্চা মুক্তোর কিনা বলা খুবই শক্ত। এ ধরণের আংটি ফুটপাথে আট আনা এক টাকায় বিক্রী হয়।

আমরা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে লম্বুদা হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাত গুটিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন—আমার এই ঐতিহাসিক অভিযান কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই। থাকবেই বা কি করে আমিতো জুরুার স্বার্থেই পাতাল অভিযানে পা বাড়িয়েছিলাম।

তবে লোকসান কিছু হয় নি। না গেলে পাতালের এই মাটিই পেতাম কোত্থেকে। লম্বুদা জামার ভেতর পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি বার করে ছিপিটা খুললেন এবং কালচে রঙের একপ্রকার চূর্ণ পদার্থ সকলের হাতে একটু একটু করে দিতে লাগলেন।

ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল। লম্বুদা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। চুরুটে পর পর কটা সুখটান দিয়ে বললেন—উঠি কেমন। আজ রাতেই সুন্দরবনে যেতে হবে। ফরেস্ট অফিসার গৌরহরি ভট্টাচার্য ফোন করেছে একটা বাঘ নাকি বড্ড উৎপাত করছে। মোটা গরু, ভেড়া, মোষ দেখলেই পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দিয়ে যাচ্ছে।

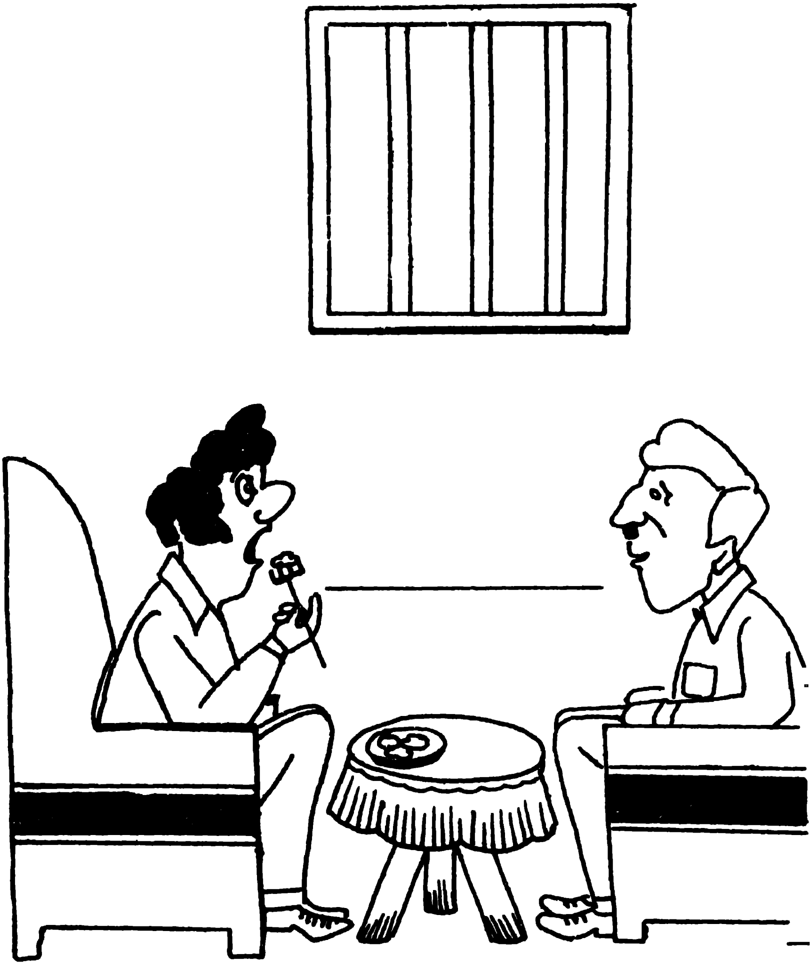
দেখি রাইফেলের গুলি দিয়ে বাঘের সামনের দাঁত কটা ফেলে দিতে পারি কিনা। লম্বুদা গট গট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাস্তব পাতালের মাটি নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ হ্যাঁচচো-হ্যাঁচচো-হ্যাঁচচো তিনবার হেঁচে উঠল।

শব্দটা লম্বুদার কানে পৌঁছতেই তিনি যেন আরও দ্রুত গতিতে হাঁটতে শুরু করলেন।

আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

# গোয়েন্দা লম্বুদা



# চোর

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

এই বৃষ্টির মধ্যে একে একে সকলে হাজির হলেও, আড্ডার চূড়োমণি লম্বুদা তখনও এসে হাজির হন নি। আমরা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিলাম, এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় লম্বুদা আজ আর আসছেন না। নির্ঘাত কাঁথামুড়ি দিয়ে বাড়িতে ঘুমোচ্ছেন।

আমাদের অনুমান যখন প্রায় বারো আনাই সত্যি হতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে ইংরিজী গানের সুরে একটা তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ ভেসে এল। লম্বুদার মুখে ইংরিজী গান আমরা অনেক শুনেছি কিন্তু তাকে শিস দিতে কখনও দেখি নি। কিঞ্চিৎ সন্দেহের দোলায় যখন আমরা সকলেই দোদুল্যমান, ঠিক সেই মুহূর্তে রঙচটা একটা পুরনো লেডীজ ছাতা মাথায় দিয়ে যিনি এসে দরজায় দাঁড়ালেন, তিনি আর কেউ নন আমাদের পরমপ্রিয় লম্বুদা। লম্বুদা সেখান থেকেই একবার সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তারপর লেডীজ ছাতাটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, ভাগ্যিস এই লেডীজ ছাতাটা সঙ্গে ছিল, তাই যাহোক কোনও রকমে পৌঁছতে পারলাম। বৃষ্টির যা ছাট, আমাদের ইন্ডিয়া মেড ছাতা হলে ছাতা তো ঝাঁজরা হতই সেই সঙ্গে মাথার চাঁদি ও ঝাঁজরা হয়ে যদি ব্রেনটা ভিজে যেত তাহলেও খুব আশ্চর্য হবার কিছুই থাকত না।

· লেডীজ ছাতা দেখে আমাদের পূর্বেই কৌতূহল হয়েছিল। বিলেতী শুনে আমরা আরও খুঁটিয়ে ছাতার মালমসলা নিরীক্ষণ করতে শুরু করলাম। মামুলি বাঁশের বাঁটের কালো কাপড়ের ছাতা। অবশ্য কাপড়ের রঙ যে কালো এখন আর তা বোঝবার কোনই উপায় নেই। একমাত্র খাঁজখোঁজ অনুসন্ধান করলেই তবে সে হদিস মেলে।

বিলেতী ছাতার ছিরি দেখে আমাদের সকলের প্রায় ভিরমি যাবার যোগাড় হল। সকলেই যখন হাসি চাপতে ব্যস্ত, আমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলাম, লম্বুদা এই বিলেতী লেডীজ ছাতাটা কিনতে আপনার কত খরচ পড়েছিল মনে আছে?

খ—র—চ! লম্বুদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। চেয়ারে বেশ জাঁকিয়ে বসে, পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে নাচাতে বললেন, ইংলন্ডেশ্বরী কুইন এলিজাবেথের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। এটা তাঁরই পার্সোন্যাল ছাতা। তাঁর জন্মদিনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্বর্গত কেনেডি এটা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। ইংলন্ডে বেড়াতে গিয়ে যেবার আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ড্যাডিয়ান ডেঙ্গুর মুখ রক্ষার জন্য, কুইনের টাকা চুরির কিনারা করে দিয়েছিলাম, কুইন খুশি হয়ে আমাকে তাঁর স্বাক্ষরিত একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক

দিতে চেয়েছিলেন। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তা প্রত্যাখান করাতে, তিনি তখন এদিক সেদিক চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ তাঁর এই ছাতাটা টেনে নিয়ে, আমার হাতে দিয়ে বললেন, লেডীজ ছাতা দিলাম বলে কিছু মনে করো না। লেডীজের কাছ থেকে লেডীজ জিনিস উপহার পাওয়াই শোভনীয়।

কুইনের আন্তরিকতা দেখে আমি আর মুখ ফুটে না বলতে পারলাম না। সাগ্রহেই কুইনের হাত থেকে এই উপহারটা গ্রহণ করেছিলাম বলে লম্বুদা নীরব হয়ে গেলেন এবং পকেট থেকে একটা কোমর ভাঙা কাঁচি সিগারেট বের করে, তাতে অগ্নিসংযোগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সিগারেটে ভিজে হাওয়া লাগার দরুন, লম্বুদাকে অনেক বেগ পেতে হল। বেশ কবার নিভে যাবার পর যখন সিগারেটটা ধরল, লম্বুদা পর পর বেশ কটা বাজখাই টান মেরে মুখে বেশ কিছু ধোঁওয়া সঞ্চয় করে নিলেন। তারপর ছুঁচলো মুখে সেটুকু শূন্যে ছুঁড়ে নানা রকমের রিঙের খেলা দেখাতে শুরু করলেন।

লেডীজ ছাতাটার পেছনে যে ছোটখাট একটা ইতিহাস আছে সেটা অনুমান করতে আর আমাদের অসুবিধে হল না। আজকের এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে আড্ডাটা বেশ ভালই জমবে ভেবে যখন আমরা সকলেই নড়েচড়ে বসেছি, লম্বুদা আড়চোখে সেটা প্রত্যক্ষ করে হঠাৎ বলে উঠলেন, ঠাণ্ডার দিনে এক রাউণ্ড চা খেলে হয় না? মেজাজটা বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে।

লম্বুদা বিলেতী ছাতার দৌলতে বৃষ্টিতে ভেজার হাত থেকে রেহাই পেলেও আমাদের মধ্যে অনেকেই ভিজে গিয়েছিল। তাই লম্বুদা গরম চা খেয়ে খেয়ে মেজাজ ম্যাজম্যাজানি ভাঙবার প্রস্তাব করামাত্রই সকলেই হৈ হৈ করে উঠে বলল, নাইস্— না-ই-স্!

স্বাদে গন্ধে বর্ণে চা-এর কোনও আকর্ষণ না থাকলেও, কেবলমাত্র মেজাজ পুনরুদ্ধারের তাগিদে চা-টা বেশ ভালই লাগতে লাগল। বিশেষ করে লম্বুদা চোখ বুজিয়ে বেশ তারিফ করেই চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

চার চুমুকে চাটুকু গলাধঃকরণ করে লম্বুদা 'আঃ— আ-আ' বলে একটা ছোট্ট উদ্গার তুললেন তারপর একটা নতুন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

প্রথম সুখটান দিয়ে লম্বুদা যখন সেটা আস্বাদন করতে ব্যস্ত হঠাৎ বিপ্লব মুখর হয়ে উঠল। খালি ভাঁড়টা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বলল, লম্বুদা আপনার পুরস্কার প্রাপ্তির পেছনে ঐতিহাসিক কাহিনীটা দয়া করে আজ আমাদের শোনাবেন কি? অবশ্য যদি কোনও আপত্তি না থাকে—

আ-পা-ত্তি! লম্বুদা আড়চোখে তাকালেন বিপ্লবের মুখের দিকে। গোঁফের দুটি ডানায়

দুষ্টাক হাসি ছিটিয়ে বললেন, আপত্তি থাকবে কেন আমি কি ছাতাটা চুরি করে এনেছি যে তোমাদের কাছে বলতে ভয় পাব! বরং উলটোটাই ধরতে পার। অর্থাৎ চোর ধরে দিয়েই কুইনের কাছ থেকে এই মূল্যবান উপহারটা আদায় করে এনেছি। এ কাহিনী তো ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে বলা উচিত। লম্বুদা মুচকি হাসতে লাগলেন।

অযথা আর সময় নষ্ট না করে আমি বললাম, তাহলে শুরু করে দিন। বৃষ্টি-বাদলার আমেজ কেটে গেলে, মেজাজ ম্যাজম্যাজানি আবার শুরু হয়ে যেতে পারে। তখন হয়তো—

'রাইট ইউ আর' বলে লম্বুদা সিগারেটে আর একটা জব্বর টান দিলেন। তারপর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে টিপে টিপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, বলছ, বেশ শোন তাহলে।

লম্বুদা আড়মোড়া ভেঙে চেয়ারে বসে, হাতের আঙুল দশটা একসঙ্গে মটমট করে মটকাতে মটকাতে বললেন, স্পোর্টস্ ওয়ার্ল্ডে আমার ইন্টার-ন্যাশনাল রেপুটেশনের কথা তোমরা ভাল ভাবেই জান। আশা করি আর নতুন করে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটবার প্রয়োজন নেই।

এই রেপুটেশনের প্রভাবেই দেশবিদেশের অনেক খ্যাতনামা লোকের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম হয়েছিল। তারা যখন কাজে-কম্মে ইন্ডিয়ায় আসত, আমার বাড়িতেই আতিথ্যগ্রহণ করত। আবার আমি যখন ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরোতাম, আমার থাকার জায়গার কোনও অভাব হত না।

গত বছর মার্চ মাসে স্কট্ল্যান্ডে গোয়েন্দা বিভাগের মুখ্য অধিকর্তা ও আমার প্রাণের বন্ধু ড্যাডিয়ান ডেঙ্গু ট্রাঙ্ককলে আমার সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগ করে বলল, লাম্বু তুমি কি খুব ব্যস্ত নাকি?

আমি বললাম, কেন বল তো?

ড্যাডিয়ান বলল, আগামী মাসে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্টম্যাচ শুরু হচ্ছে নিশ্চয়ই শুনেছ। তুমি তো ক্রিকেট-পাগল দেখবে নাকি? যদি রাজী থাক তো, প্যাভিলিয়নে তোমার জন্য একটা আসন রিজার্ভ করে রাখি।

মে মাসে আমার সুইজারল্যান্ডে যাবার প্রোগ্রাম ছিল। ভাবলাম ড্যাডিয়ান যখন এতই আগ্রহ দেখাচ্ছে, না বলা ভাল দেখাবে না। হাজার হোক আন্তরিকতার একটা অনার আছে তো!

খেলা দেখেই না হোক রওনা হয়ে যাব সুইজারল্যান্ডের পথে। তাতে রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাই ড্যাডিয়ানকে জানিয়ে দিলাম, ইন্ভিটিশন অ্যাক্সেপ্ট করলাম।

দেখতে দেখতে যাবার দিন এগিয়ে এল। অতীতে স্কটল্যান্ডেআমি তা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশবার গিয়েছি। কোন্ রাস্তায় কটা কাঁকর পড়ে আছে তাও আমার কণ্ঠস্থ। জিনিসপত্তর বলতে তাই সঙ্গে কিছুই নিলাম না।

মিসেস্ ড্যাডিয়ানের জন্য সাতশ টাকা দামের মুর্শিদাবাদ সিল্কের একখানা শাড়ি কিনে রওনা হয়ে গেলাম স্কটল্যান্ডের পথে।

পাইলটের পেট ব্যথা করে ওঠার জন্য, মাঝপথে বেশ ক ঘন্টা লেট হয়ে গেল। ফলে স্কটল্যান্ড এয়ারপোর্টে পৌঁছে ড্যাডিয়ানের আর দেখা পেলাম না। প্লেন পৌঁছতে অসম্ভব দেরি করছে দেখে সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

আমার আসতে বিলম্ব দেখে ড্যাডিয়ান অবশ্য নির্বিকার হয়ে বসে থাকে নি। ছেলে কটলেটের সঙ্গে টুইস্ট নাচ প্র্যাকটিস্ করছিল। আমি গিয়ে কলিংবেল টিপতেই হুড়মুড় করে সে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে নেমে এল এবং হ্যা-ল্-ল্-ল্-ল্-ও বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে টুইস্ট নাচতে লাগল। যত বলি ড্যাডি ছাড় কোমরে লাগছে ততই ড্যাডি বাড়ায়। শেষ পর্যন্ত মিসেস্ ড্যাডিয়ান এসে উপস্থিত হল সেখানে। ড্যাডির উদ্দেশ্যে বলল, কী ব্যাপার বল তো? হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে বেচারি এল, কোথায় দুদণ্ড বিশ্রাম করতে বলবে তা না টুইস্ট নাচতে শুরু করলে। লম্বু তো এখুনি পালাচ্ছে না। পরে নাচলে হ-ত-না!

বউ-এর কাছে বকুনি খেয়ে ড্যাডির মুখটা কুঁচকে কিচমিচ হয়ে গেল। নাচ থামিয়ে আমার কানে কানে বলল, চিকি বড্ড বদমেজাজি। কথা না শুনলে লাইফ রিস্ক হতে পারে। চল ঘরে গিয়ে বসা যাক।

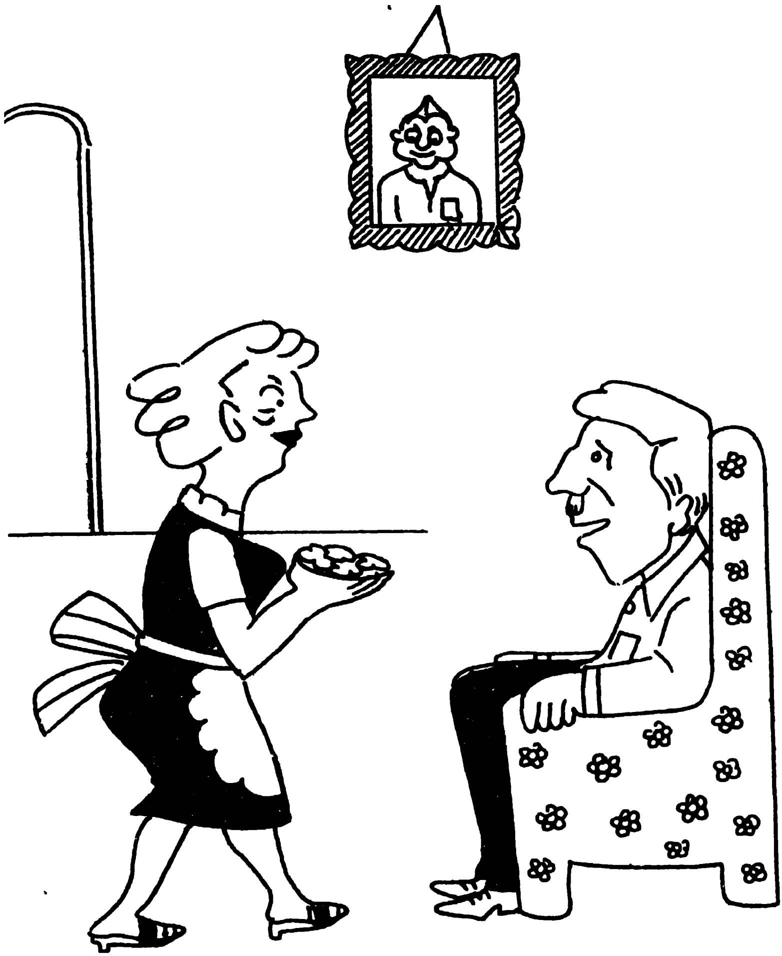
লম্বুটা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন এবং মৃদু পা নাচাতে শুরু করলেন।

লম্বুদার এই অপ্রত্যাশিত বিরতি আমাদের কারুরই মনঃপূত হল না। চমক বলল, দোহাই লম্বুদা, এভাবে রসভঙ্গ করবেন না। বলুন তারপর কি হল?

লম্বুদা বোধ হয় এর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। চমক অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, ড্যাডির বৈঠকখানায় বসে আমি, ড্যাডি ও মিসেস্ ড্যাডি তিনজনে কফি খেতে খেতে লপ্প করছি, হঠাৎ ফোনটা ঝনঝন্ করে বেজে উঠল। ড্যাডি মিসেস্ ড্যাডির দিকে তাকাতে সেই-ই গিয়ে ধরল ফোনটা।

মাত্র কসেকেন্ডের মধ্যেই মিসেসের চোখ দুটো পান্তুয়ার মত গোল গোল হয়ে উঠল। রিসিভারটা টেবিলে রেখে ড্যাডিকে বলল, শীগ্‌গির এস। রাজবাড়ি থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছে।

রাজবাড়ির নাম শুনে ড্যাডি ফুট দশেকের মত একটা লঙজাম্প দিয়ে এগিয়ে গেল ফোনের দিকে। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে কথাবার্তা বলার পর, রিসিভারটা



যথাস্থানে রেখে দিয়ে, চেয়ারে এসে বসল এবং ঘন ঘন কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল।

কিছু যে একটা ঘটেছে সেটা তার চোখের ভাষাতেই ধরা পড়ল। ইশারায় প্রশ্ন করলাম, এনিথিং রঙ? ড্যাডি ঘাড় নেড়ে বলল, আর বল কেন? কুইন এলিজাবেথের প্রিয় সখী টুনি স্মিথ ফোন করেছিল। রাজবাড়িতে কিছু চুরিচামারির ব্যাপারে কুইন এখুনিই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। অতএব এখুনি আমায় লন্ডনে ছুটতে হবে। না গেলে বুঝতেই পারছ। রাজরাজড়ার ব্যাপার। গর্দান থেকে মুণ্ডুটা নেমে গেলেও কিছু আশ্চর্য হবার থাকবে না।

মিসেস্ ড্যাডিয়ান কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ড্যাডি আর তাকে সে সুযোগ দিল না। কফিটা কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলে চটপট কাপড়জামা পরে নিল তারপর কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে, বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।

মিসেস্ ড্যাডিয়ান খাস লালমুখো ইংরেজ মহিলা হলেও, বাঙালী মেয়েদের মতই রকমারি রান্নায় ভীষণ সখ। রন্ধন-প্রণালী কিনে পড়ে পড়ে, দেশী-বিদেশী হেন রান্না নেই যে তার জানা নেই। আমি যাচ্ছি শুনে আগে থেকেই সব প্ল্যান ঠিক করে রেখেছিল। আমাকে বলল, আপনি বসুন আমি আপনার জন্য কিঞ্চিৎ জল-যোগের বন্দোবস্ত করি।

খিদেতে আমার পেটের মধ্যে গঁ-গঁ-গঁ শব্দ হচ্ছিল। তাই কোনওরকম সৌজন্য প্রকাশ না করেই আমি টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসলাম এবং সুইচ টিপে দিলাম। মিসেস্ ড্যাডিয়ান রান্না ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস্ ড্যাডিয়ান এক প্লেট গরম পেঁয়াজি নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমার হাতে প্লেটটা দিয়ে বলল, নিন খান। বেঙ্গলীরা তো এর ভীষণ ভক্ত, কি ঠিক বলি নি?

স্কটল্যান্ডে বসে, টেলিভিশান দেখতে দেখতে পেঁয়াজি খাব এ আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি নি। অযথা আর সময় নষ্ট না করে, পেঁয়াজি গলাধঃকরণে মনোনিবেশ করলাম। দুটো খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথার ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত সমস্ত দেহটা হুহু করে জ্বলতে শুরু করল। দেহের যেখানে যত জল আছে সব এসে ভিড় করল চোখে, যা যে-কোনও মুহূর্তেই বিপদসীমা অতিক্রম করে আমার জামা-কাপড় ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারে।

ইতিমধ্যে মিসেস্ ড্যাডিয়ান আবার ঘুরে এল রান্নাঘর থেকে। আমার চোখের মণিতে জলোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে বলল, কী ব্যাপার লাম্বু, পেঁয়াজি দেখে কি বাড়ির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে নাকি?

নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম, 'রাইট ইউ আর'। মনে হচ্ছে যেন আমার ঠাকুমার হাতের ভাজা খাচ্ছি। আমার মন্তব্য শুনে মিসেস্ ড্যাডিয়ান কি ভাবল কে জানে! একরকম প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মিনিট দশেক পরে আর এক প্লেট পেঁয়াজি ভেজে নিয়ে এসে আমার মুখের সামনে ধরে বলল, আপনার যখন এতই ভাল লেগেছে, আর এক প্লেট খান। আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

মিসেস্ ড্যাডিয়া... খুশি করতে গিয়ে যে এমন বিপদগ্রস্ত হতে হবে একথা স্বপ্নেও ভাবি নি। অথচ খাব না বলবারও উপায় নেই। মনে হল পেঁয়াজির থালা হাতে নিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদি।

মিসেস্ ড্যাডিয়ান আর এক রাউন্ড কফি করার জন্য রান্নাঘরে গেল। আমি দেখলাম এই সুবর্ণ সুযোগ। পেঁয়াজিগুলো রুমালে বেঁধে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাবৎ পকেটে পুরে ফেললাম।

মিসেস্ ড্যাডিয়ান কফি নিয়ে ঘর ঢুকে বলল, আমি কিন্তু এতটা সাকসেস্ফুল

ছব স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আজ আমার জীবনে সত্যিই একটা স্মরণীয় দিন।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, তা সত্যি কথাই বলেছেন।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে বারোটা একটা দুটো তিনটে বাজতে চলল, কিন্তু তখনও ড্যাডিয়ানের পাত্তা নেই। আমি চিন্তিত হয়ে উঠলেও, মিসেস্ ড্যাডিয়ানের মধ্যে কোনওরকম চিন্তাভাবনা দেখলাম না। বরং আমার ছটফটানি দেখে মিসেস্ ড্যাডিয়ান বলল, এ তো ড্যাডির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জীবনে তো কখনও গোয়েন্দাগিরি করলেন না জানবেন কি করে! অবশ্য আপনার বন্ধুর মত টপ গোয়েন্দা হতে গেলে, সাতজন্ম তপস্যা করা দরকার।

মিসেস্ ড্যাডিয়ানের মন্তব্য শুনে আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কেবল একটু মুচকি হাসলাম মাত্র।

বিকেল হব হব হঠাৎ বাইরে থেকে কলিংবেল বেজে উঠল। আমি চেয়ারে বসে বই পড়ছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খিল খুল দিলাম। ড্যাডি হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেও, তাকে যথেষ্ট বিমর্ষ দেখাতে লাগল।

আমি তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেস খুলে ওকে একটা সিগারেট অফার্ করে বললাম, টু টায়ার্ড মনে হচ্ছে। খুনখারাপির ব্যাপার নাকি?

ড্যাডি হা-হা-হা-হা করে হাসতে হাসতে বলল, খুনখারাপি হলে তো বেঁচে যেতাম। ওতে কি আর আমরা ভয় পাই নাকি? কিন্তু এ যে তার চেয়েও সাংঘাতিক!

ড্যাডির কথা শুনে কিছু আঁচ করতে না পেরে, আমি বললাম, ঘটনাটা কি শুনতে পারি? ইতিমধ্যে মিসেস্ ড্যাডিয়ান দুকাপ কফি নিয়ে এসে হাজির হল। ড্যাডি ধূমায়িত কাপে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে, মুচকি হেসে বলল, আর বল কেন ব্রাদার, টুনি স্মিথের ফোন পেয়ে তো হাজির হলাম রাজবাড়িতে। টুনি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। আমি যেতেই আমাকে নিয়ে গেল কুইনের বসবার ঘরে। কুইন তাঁর সহচরীদের সঙ্গে লুডো খেলছিলেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

আমি বললাম, ইওর ম্যাজেস্টি, বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

কুইনের ইশারায় সহচরীরা ঘর থেকে চলে যেতে, কুইন দরজা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর আমার সামনে বসে বললেন, শুনুন তাহলে ঘটনাটা বলি। গতকাল সন্ধ্যেবেলায় আমি বৈঠকখানায় দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে উঠে আসবার সময় আমার ভ্যানিটিব্যাগটা টেবিলের ওপর ভুলবশতঃ ফেলে রেখে এসেছিলাম। ভ্যানিটিব্যাগের মধ্যে আমার হাজার পাউন্ডের নোট ছিল। পরে যখন আমি ব্যাগ ফেরত পেলাম, দেখলাম কে বা কারা তার মধ্য থেকে নশো পাউন্ডচুরি করে নিয়েছে। ঘটনাটা খুব গর্হিত হলেও, আমি মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারলাম না। কারণ

ইংলন্ডেশ্বরীর পক্ষে সমান্য নশো পাউন্ড নিয়ে হৈচৈ করা মোটেই শোভা পায় না তাছাড়াও এটা যে আমারই প্রাসাদের কোনও না কোনও ভৃত্যের কাজ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বাইরের লোকের এখানে আবাধ প্রবেশাধিকার নেই যখন। এক্ষেত্রে কোনওরকম হৈচৈ না করেই আমি চোর আবিষ্কারের পক্ষপাতী। অর্থাৎ এই শ্রীমান্‌টি কে, কেবল সেইটুকুই জানতে চাই এবং তার শ্রীমুখ দর্শন করতে চাই।

এবার আপনার মত বিশ্ববিশ্রুত গোয়েন্দার স্মরণাপন্ন হওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আমি চাই গোপনে তদন্ত করে আপনি অপরাধীটিকে খুঁজে বের করে দেবেন। এর জন্য যা পারিশ্রমিক চাইবেন আমি দেব।

কুইনকে বললাম, অল্‌রাইট, আপনার কেস আমি টেক আপ করলাম। আপনি এখন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাতে পারেন।

কুইন মুচকি হেসে বললেন, জানতাম, পৃথিবী জুড়ে এই জন্যেই তো আপনার এত সুনাম!

ড্যাডি হঠাৎ থেমে গিয়ে বাকি কফিটুকু গলাধঃকরণ করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে পর পর কটা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল তারপর মুচকি হেসে বলল, আমাদের ছকে বাঁধা নিয়মমতই তদন্ত শুরু করে দিলাম। যে ঘরে চুরি গিয়েছিল, সেই ঘরে ঢুকে চোখ বোলাতে লাগলাম, অপরাধী কোনও সূত্র রেখে গিয়েছে কিনা কারণ সেরকম কিছু পেলে আমার আড়াই সেকেন্ডও লাগবে না তাকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু কোথাও তেমন কিছু চোখে পড়ল না। পুরো ঘরখানাই ঝকঝক তকতক করছে। একগাছা চুল পর্যন্ত কোথাও পড়ে নেই। অবশ্য তাই বলে আমি দমবার পাত্র নই। ভ্যানিটিব্যাগটা যখন অপরাধী স্পর্শ করেছিল, এর কোথাও না কোথাও সে তার হাতের ছাপ রেখে গিয়েছে, আমি নিশ্চিত ছিলাম। ভ্যানিটিব্যাগটা তাই আমি আলতো করে কাগজে মুড়ে নিয়ে, রওনা হয়ে গেলাম ফরেনসিক ল্যাবরেটরির উদ্দেশ্যে।

উলটেপালটে যথারীতিই ব্যাগটাকে পরীক্ষা করা হল। এমন কি ব্যাগের মধ্যে যে একশো পাউন্ডের নোট পড়েছিল, সেগুলোও আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। যদি নোটের গায়ে ছাপটাপ কিছু থাকে। কিচ্ছু নেই। নোটগুলোর দুপিঠই চকচক করছে।

গোয়েন্দাদের অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও শব্দ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে তাই যোগাযোগ করলাম বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে। তাদের আমার পরিচয় দিতেই, তারা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, বলুন আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?

আমি কুইনের নাম আর উল্লেখ করলাম না। বললাম, এত নম্বর থেকে এত নম্বর পর্যন্ত নোট খোয়া গিয়েছে। কাইন্ডলি ক্যাশিয়ারদের বলে দিন এই নমবরের

নোট কেউ ভাঙাতে এলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে আটকে রাখা হয় এবং আমাকে ফোনে খবরটা দেওয়া হয়।

সকলেই আমার অহ্বানে সাড়া দিয়ে বলল, ধন্যবাদ! এখুনি আমাদের সমস্ত শাখায় জানিয়ে দিচ্ছি। কিছু চিন্তা করবেন না।

ফোন সেরে আবার রাজবাড়িতে ফিরে গেলাম। কুইন ভাবলেন আমি বোধ হয় হিললে করেই ফিরেছি। একগাল হেসে বললেন, 'মে আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, স্যরি ম্যাডাম। এত তাড়াতাড়ি কি আর হদিস মেলে! সবে চার ফেলে এলাম। এখন ফাঁদে পা না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

কুইনের মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, চোরের ফাঁদে পা দিতে দিতে আমি আবার পটল তুলব না তো?

আমি বললাম ইওর ম্যাজেস্টি, এই মুহূর্তে আপনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন, পৃথিবীর অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ড্যাডিয়ান ডেঙ্গুর সঙ্গে আপনি কথা বলছেন।

আপনি আমায় তিনদিন সময় দিন। তিনদিনের মধ্যে আমি অপরাধীকে হাজির করবই।

কুইন কয়েক মিনিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, জানি বলেই তো আপনার সাহায্য চেয়েছি। পৃথিবীতে কি আর গোয়েন্দার অভাব আছে!

ড্যাডি বোধ হয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মিসেস্ ড্যাডিয়ান আর তাকে সে সুযোগ দিল না। লাঞ্চ এনে হাজির করল টেবিলে।

ড্যাডির আর তর সইল না। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার জন্য তোমারও খেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই। 'নাউ লেট আস্ স্টার্ট।'

পরের দিন সকাল থেকে ড্যাডির আর পাত্তা নেই।

সারাদিন টইটই করে ঘোরে। রাতে খাবার টেবিলে যখন দেখা হয়, গম্ভীর হয়ে বলে, 'লাম্বু ইটস্ এ গ্রেট চ্যালেঞ্জ টু মি।' যেভাবেই হোক এ চোরকে আমায় খুঁজে বের করতেই হবে। তা না হলে কুইনের কাছে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

আমি অবশ্য তখন সাহস যোগাই। ভরসা দিয়ে বলি, 'ডোন্ট ওরি'। চেষ্টা করলে হয় না এমন জিনিস পৃথিবীতে নেই।

দুদিন খুব উৎসাহভরে দৌড়াদৌড়ি করলেও, তৃতীয় দিনের দিন দুপুরবেলা ড্যাডি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কোয়াইট ইম্‌পসিবল্। কুইনের যা শর্ত, তাতে চোর ধরা সম্ভব নয়। চোরের মত অত চুপি চুপি কি আর চোর ধার যায়! আর তো মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি। আমি কোনই আশাভরসা দেখতে পাচ্ছি না। কি যে করি ছাই—অথচ

পুরোপুরি একটা প্রেসটিজের ব্যাপার।

ড্যাডির দুশ্চিন্তার প্রত্যুত্তরে আমি কেবল ঘাড় নেড়ে তা বটে তা বটে বলতে লাগলাম।

মাথায় হাত দিয়ে বেশ কয়েক মিনিট বসে থাকার পর, ড্যাডি হঠাৎ আমার কানে ফিসফিস করে বলল, একটা অনুরোধ করব, রাখবে?

ড্যাডির কথা শুনে আমি মুচকি হেসে বললাম, যে-ম-ন!

ড্যাডি বলল, তুমি তো নিজেকে একজন পৃথিবীর অন্যতম চৌকস লোক বলে জাহির কর, এ ব্যাপারে তুমি তোমার সে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার?

আমি হেসে বললাম, ইয়র্কি করছ না সিরিয়াস্‌লি বলছ?

ড্যাডি মুখ তুলে বলল, ধর সিরিয়াস্‌লি—

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, চেষ্টা করে দেখতে পারি। তার বেশি নয়। তবে একান্তই যদি আমাকে এ দায়িত্ব নিতে হয়, দুটো জিনিস আমাকে দিতে হবে।

ড্যাডি আমার মুখের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, বল কি শুনি?

আমি বললাম, তেমন কিছুই নয়। একখানা গাড়ি আর একখানা আমার পরিচিতি-পত্র।

ড্যাডি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে বলল, একখানা কেন আমি একশোখানা গাড়ি দিচ্ছি আর পরিচিতি-পত্র যতগুলো দরকার—

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, ধন্যবাদ। একটা, একটা পেলেই আমার চলবে।

ড্যাডিয়ান তখুনি গিয়ে ফোন ধরল এবং তার পি-এ-কে গাড়িখানা নিয়ে চলে আসবার নির্দেশ দিল।

ড্যাডির কাছে আমার পরিকল্পনা কিছুই ফাঁস করলাম না। গাড়ি এসে পৌঁছতেই আমি সেখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্কট্‌ল্যান্ড জু-গার্ডেনের উদ্দেশ্যে।

জু-এর ডাইরেক্টার মিঃ স্কচ্ ওয়ার্ল্ডকে ড্যাডির দেওয়া পরিচিতি-পত্র দেখাতে, সে খুব খাতির করেই আমাকে বসাল এবং দামী পানীয় দিয়ে আমাকে আপ্যায়ন করল।

আমি কেবলমাত্র নিয়মরক্ষে করে বললাম, হ্যাঁ, যে জন্যে আসা। এখুনি আমার একটা আফ্রিক্যান কাঁকড়াবিছে দরকার। আপনি কি দিতে পারবেন?

মিঃ স্কচ্ ওয়ার্ল্ড বোধ হয় তার চাকুরির জন্মে এমন অনুরোধ কখনও শোনে নি। ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর কোনও কথা না বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শিশির মধ্যে কালো রঙের একটা তেজি কাঁকড়াবিছে এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, মাত্র তিনদিন আগে জঙ্গল থেকে এসেছে। হুলের আস্ফালন দেখলেই মোটামুটি বুঝতে পারবেন এ কামড়ানোর পরিণতি কি!

শিশিটা হাতে নিয়ে আমি একবার ঝাঁকুনি দিতেই কাঁকড়া-বিছেটা চটে লাল হয়ে গিয়ে খটাস্ খটাস্ করে শিশির কাঁচের গায়ে বার কয়েক হুল ফোটানোর চেষ্টা করল। আমি অবশ্য এমন জিনিসই চাইছিলাম। মিঃ ওয়ার্ল্ডকে বেশ কয়েকবার ধন্যবাদ জানিয়ে কাঁকড়াবিছেটা নিয়ে রওনা হলাম রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

কুইন বসে তখন আপেলের আচার খাচ্ছিলেন। পরিচিতি-পত্র দেখামাত্রই তিনি ডেকে পাঠালেন আমাকে। আমি টুনির সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হতেই, তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, তুমি ভারতের লম্বমান দাট্। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে সত্যিই আমি খুব খুশি। বল তোমার অভিপ্রায় কি?

আমি বললাম, ড্যাডিয়ান ডেঙ্গু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পেট কনকনানির জন্য বিছানা থেকে একেবারেই উঠতে পাচ্ছে না। ও আমার ওপরেই আপনার চোর ধরে দেবার দায়িত্ব দিয়েছে।

কুইন চোখে কিঞ্চিৎ সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে বলল, তাই নাকি? ভেরি স্যাড্! বল, এখন তুমি কি করতে চাও?

আমি বললাম, আপনার যে ভ্যানিটিব্যাগের মধ্যে থেকে হাজার পাউন্ড চুরি গিয়েছিল, সেই ব্যাগটায় আবার হাজার পাউন্ডের নোট ভর্তি করে আমায় দিন এবং আমি যা যা বলি সেইমত ব্যবস্থা করার জন্য আপনার ভৃত্যদের নির্দেশ দিন।

কুইন এক টুকরো আপেল নিয়ে এগাল ওগাল করতে করতে বললেন, তার মানে?

আমি বললাম, মানে নিয়ে এখন অযথা গবেষণা করে কোনও লাভ নেই। যাতে মানে তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

কুইন এবার একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'রাইট ইউ আর'। এ ব্যাপারে অযথা আমার নাক গলান উচিত হয় নি। আমি এখুনি টুনিকে বলে দিচ্ছি, তোমাকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করার জন্য।

পরিকল্পনা মতই নিঃশব্দে চোর ধরার ফাঁদ পেতে আমি কুইনের সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি নিশ্চিন্তে আপেলের আচার খান। চোর ধরা পড়লে আমাকে জানাবার প্রয়োজন নেই। ড্যাডিয়ানকে খবর দিলেই হবে।

আমি আর বাড়ি ফিরলাম না। ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম সিনেমা হলে। ইভনিং শো-এর একটা টিকিট কেটে বসে গেলাম ছবি দেখতে।

ফিরলাম যখন রাত তখন দশটা। ঢুকে দেখি ড্যাডি ব্যস্ত হয়ে ঘরে পায়চারি করছে। হাসিমুখে আমায় ঘরে ঢুকতে দেখে বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, চোর ধরতে গিয়ে কি কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

কি জবাব দেব ভাবছি, হঠাৎ ঝনঝন করে ফোনটা বেজে উঠল। ড্যাডি আর

আমার জবাব শোনবার জন্য অপেক্ষা না করে দৌড়ল ফোন ধরার জন্য।

একমিনিট কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ ড্যাডি ফোনের রিসিভারটা রেখে দিয়ে, আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং আমার গালে বেশ কয়েকবার তার খোঁচা খোঁচা দাড়িসুদ্ধ গালটা ঘষতে ঘষতে বলল, কন্‌গ্র্যাচুলেশন! চল, কুইন এলিজাবেথ এখুনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমিও তৈরীই ছিলাম। ড্যাডি তৈরী হয়ে নিতে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে এবং যথাসময়ে কুইন এলিজাবেথের রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম।

কুইন আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আমরা পৌঁছতে কুইন আমাদের ভূরিভোজে আপ্যায়ন করলেন।

ভোজনপর্ব শেষ হতে, কুইন আমার হাতে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বললেন, তুমি যখন পেশাদার ডিটেকটিভ নও, একটা পুরস্কার তোমার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। এই চেকটা দিলাম, তোমার খুশিমত টাকা বসিয়ে নাও।

আমি বললাম, ধন্যবাদ! টাকার লোভে আমি এ কাজ করি নি। তবে যদি আপনি একান্তই ইচ্ছা করেন, প্রীতি-উপহার স্বরূপ কিছু দিতে পারেন।

আমার প্রস্তাবে কুইন খুশিই হলেন এবং এদিকে সেদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ তার ছাতাটা পেড়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, লেডীজ ছাতা বলে কিছু মনে করো না। লেডীজের কাছ থেকে লেডীজ জিনিস উপহার পাওয়াই শোভনীয়।

লম্বুটা হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন এবং সিগারেটের শেষাংশটুকু সদ্ব্যবহার করার জন্য নানা কৌশলে সেটা ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ছাতার ইতিহাস শুনে আমরা যখন বড় বড় চোখ করে লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ বাস্তব সরব হয়ে উঠল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বলল, আপনার লেডীজ ছাতার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তো শুনলাম কিন্তু কি করে নীরবে এবং ওই কয়েকঘন্টা সময়ের মধ্যে চোর ধরলেন সেটা কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার হল না।

'ওয়েট এ বিট্' বলে লম্বুদা একটু মুচকি হাসলেন। আর একটি নতুন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, দুখানা পর পর সুখটান দিয়ে বললেন, চোরদের ধর্মই হল যেখান থেকে তারা চুরি করে তার আশেপাশে ঘুরঘুর করা অর্থাৎ ব্যাপারটি লক্ষ্য রাখা।

এক্ষেত্রে কুইন এলিজাবেথ যখন তার চুরির ব্যাপারে কোনওরকম হৈচৈ করেন নি তখন চোর যে ঘুরে ফিরে সেখানে আবার আসবে আমি মোটামুটি নিশ্চিতই ছিলাম।

কুইনের ওই ভ্যানিটিব্যাগে নোট ভর্তি করে আমি সেই নোটের মাঝখানে কাঁকড়াবিছেটা ঢুকিয়ে দিলাম এবং সেটা টেবিলের ওপর পূর্বের মতই রাখলাম। যাতে

চোরটা নোট চুরি করবার জন্য আবার ব্যাগে হাত ঢোকালেই কাঁকড়াবিছেটা তার হাতে হুল ফুটিয়ে দিতে পারে।

আমার ফন্দি বিফল গেল না। রাত সওয়া নটা নাগাদ কুইন ডিনার খেয়ে শুতে যাবেন হঠাৎ তাঁর অন্যতম ভৃত্য লয়েল 'গড সেভ মি' 'গড সেভ মি' বলে করুণভাবে চিৎকার করতে শুরু করল।

এই চিৎকারের কারণ নির্ণয় করতে কুইনের আর মোটেই অসুবিধে হল না। জানালার পাখি তুলে কুইন বাছাধনকে দেখে নিয়ে মুচকি হাসলেন মাত্র তারপর ফোনের রিসিভার তুলে—, লম্বুদা নীরবে সিগারেট ফুঁকতে শুরু করলেন।

লম্বুদার অসামান্য গোয়েন্দা প্রতিভায় যখন আমরা অল্পবিস্তর বিস্মিত, লম্বুদা আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিউমার্কেট থেকে মর্তমান কলা কেনার ছুতো করে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

# টিকি

লম্বুদা বড় একটা কামাই করেন না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, বন্যা হোক, ভূমিকম্প হোক, এমন কি কার্ফু অর্ডারের মধ্যেও লম্বুদা তার শ্রীমুখখানা আমদের কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখিয়ে গিয়েছেন। এহেন লম্বুদার পঁচিশ দিন নিঃশব্দ ডুব আমাদের কাছে যথেষ্টই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আমরা সকলেই যখন লম্বুদার ভালমন্দ নিয়ে অল্পবিস্তর চিন্তিত, বাস্তব বলল, ঘরে বসে গুলতানি করে কোনও লাভ নেই। এখুনি আমাদের লম্বুদার বাসায় গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া উচিত। মানুষ যখন অসুখ-বিসুখ স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে এবং আমার মনও তাই বলছে।

বাস্তবের কথা শুনে বিপ্লব হিহি করে হেসে উঠল। বাস্তবের দিকে তাকিয়ে বলল, লম্বুদার অসুখ করবে বলিস কিরে! পঞ্চান্ন বছর তিন মাস আঠার দিন বয়সের মধ্যে লম্বুদা মাত্র একবার একমিনিট কান কটকটানির ওষুধ খেয়েছিলেন। তাছাড়া নাকি তার পাকস্থলীতে আর ওষুধই পড়ে নি। তোরা যদি বলতিস কোনও সিংহের শিং গজিয়েছে সেটা আমি সহজেই বিশ্বাস করতে পারতাম কিন্তু লম্বুদা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একথা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পারব না।

বিপ্লবের কথা শুনে এতক্ষণ যারা এব্যাপারে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের মধ্যে গুলতানি করছিল, তারাও তৎপর হয়ে উঠল। পূর্ণেন্দু বলল, বিপ্লব নেহাৎ বাজে কথা বলে নি। অন্ততঃ স্বাস্থ্য নিয়ে লম্বুদার যেরকম গর্ব, বিপ্লবের এই উক্তি নেহাতই অমূলক নয়। তার অসুখ-বিসুখ না করলেও, লম্বুদা যে কোন-রকম প্যাঁচে পড়েছে যে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্যাঁচে না পড়লে কি আর লম্বুদার মত লোক আড্ডায় আসা বন্ধ করেন!

'তা বটে' বলে যখন চমক পূর্ণেন্দুকে সমর্থন জানাতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা চৌকাঠের ওপরে একখানা পা রেখে, ভ্রূ নাচিয়ে বললেন, সে কি জন্মেছে?

লম্বুদার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আমরা খুশি হয়ে উঠলেও, প্রশ্ন শুনে সকলেই অল্পবিস্তর বিব্রত বোধ করতে লাগলাম এবং তাঁর প্রশ্নের মর্মার্থ উপলব্ধি করার তাগিদে পরস্পর মুখ চাওয়াচাউই করতে শুরু করলাম।

লম্বুদা অবশ্য উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না। মচমচ করতে করতে ঘরে ঢুকলেন এবং তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনের দিকে অগ্রসর হলেন। লম্বুদার চেয়ারখানা আড্ডার নতুন অতিথি পবন অধিকার করে বসেছিল। লম্বুদা সেদিকে এগোতেই পবন চেয়ার ছেড়ে দিয়ে আমার পাশে বসল। লম্বুদা অবশ্য এসব কিছুই ভ্রূক্ষেপ করলেন না

গম্ভীর হয়ে গিয়ে চেয়ারে বসলেন এবং জুতোর ফিতে খোলায় মন দিলেন। জুতো জোড়া চেয়ারের তলায় ঢুকিয়ে রেখে, যেন মরুভূমিতে বসে আছেন এরকম একটা ভান করে একটি সিগারেট ধরালেন। সিগারেটটা যে কম করেও দশ-পনের দিনের বাসী সেটা তার মিনমিনে আগুনেই ধরা পড়ে গেল।

লম্বুদা অবশ্য ছাড়বার পাত্র নন। আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে নানাভাবেই তিনি আগুন তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত সফল হলেন। একমুখ ধোঁয়া টিপে টিপে ছাড়তে ছাড়তে বললেন, কই হে আমার প্রশ্নের জবাব কোথায়?

লম্বুদার ভাবসাব প্রত্যক্ষ করতে করতে আমরা প্রায় প্রসঙ্গটা বিস্মৃতই হতে বসেছিলাম। তিনি নিজেই আবার তা তুলতে, আমি বললাম, কি বলতে চাইছেন?

লম্বুদা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, না বোঝবার মত কিছুই নেই তো ব্রাদার। আমাকে যে প্যাঁচে ফেলবে সে কি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে?

লম্বুদার এই ধরনের গর্বোক্তির সঙ্গে আমরা ভালভাবেই পরিচিত। এই কথা শুনে তাই আমরা লম্বুদাকে আড়াল করে চোখ টেপাটেপি করতে লাগলাম। লম্বুদা দেখতে পেলেন কিনা জানি না। হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বললেন, কী তোমাদের সব খবর ভাল তো? বেশ কিছুদিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হল। মাঝে মাঝে যে কি সাংঘাতিক খারাপ লাগত সে কথা আর কি বলব!

সকলে ঘুরে আমার মুখের দিকে তাকাতে, বাধ্য হয়েই আমি মুখ খুললাম। লম্বুদার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি যে আমাদের কাছে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল, সেটা অকপটে স্বীকার করেই বললাম, আপনার এই অনুপস্থিতি আমাদের কাছে প্রায় ঐতিহাসিক ঘটনার মতই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কী ব্যাপার বলুন তো, না বলে কয়ে একেবারে লম্বা ডুব মারলেন যে বড়!

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে লম্বুদা এমনভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন প্রথমে মনে হ'ল, আমার কথা যেন কিছুই তার কানে ঢোকে নি। আবার বলব কিনা যখন ভাবছি, লম্বুদা কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর সিগারেটের শেষাংশ জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আর বল কেন ব্রাদার, গেলাম নেমন্তন্ন খেতে—করে এলাম গোয়েন্দাগিরি। এখন তাই ভাবছি মানুষের বেশি গুণ থাকার কি বিপদ! আগে যদি টের পেতাম গাঁটের কড়ি খরচ করে তাহলে কি আর ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে নেমন্তন্ন খেতে যেতাম। তাছাড়া কাজেরও কি কম ক্ষতি হল! কে আর তার হিসেব করছে। লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা নাচাতে লাগলেন।

গলা বাড়িয়ে লম্বুদা কোনদিনও কোন ঘটনা বলেন নি এবং বলবেনও না সেটা আমরা সকলেই ভাল করে জানতাম। অযথা সময় নষ্ট না করে বললাম, লম্বুদা একান্তই

যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে আপনি যে কীর্তির স্বাক্ষর রেখে এসেছেন সেটা আজকের এই আড্ডায় বলবেন কি?

লম্বুদা আপন মনেই পা নাচাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে এ অনুরোধ করামাত্রই, তিনি মুখটা ছুঁচলো করে, জিবটা তালুতে ঠেকালেন এবং 'চিড়িক' করে একটা শব্দ করলেন। হাত দুটো ছুঁড়ে, শরীরের জড়তা কাটিয়ে আর একটি সিগারেট ধরালেন এবং কি যেন ভাবতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে দশমিনিট কেটে গেল কিন্তু লম্বুদার মুখ খোলবার কোনও সাড়াশব্দ নেই। ক্রমশঃ আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করল। ধৈর্য যখন আমাদের চরমে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ যা বলছিলাম, চিফ্ জাস্টিস্ হাবুল দত্তের নাম নিশ্চয়রই তোমরা শুনেছ। হাবুল দত্ত সম্পর্কে আমার জেঠামশাই হন। উনি রিটায়ার করার আগে নিউ আলিপুর থাকতেন। রিটায়ার করার পর হঠাৎ কি খেয়াল হল, বাকি জীবন তিনি ঝাঁঝাঁতেই কাটবেন বলে স্থির করলেন এবং একটা বাড়িও কিনে বসলেন।

সেদিন তোমাদের এখান থেকে ফিরে গিয়ে দেখি রাশিয়ার দূতাবাস থেকে ডিমিকা ড্যামোভস্কি বাড়িতে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি ঘরে বসে ড্যামোভস্কির সঙ্গে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করছি, হঠাৎ পিয়ন এসে কড়া নাড়তে লাগল।

লেটার-বক্স বাইরে থাকা সত্ত্বেও পিয়ন কড়া নাড়তে বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই কোনও জরুরি চিঠি এসেছে। অনুমান ঠিকই। 'ভেরি ভেরি আর্জেন্ট' লেখা প্রায় তিনশো গ্রামের মত ভারি একটা খাম। ড্যামোভস্কি চলে যেতে আমি খাম খুললাম। জেঠীর বাইশ পৃষ্ঠা লেখা একখানা চিঠি। সংক্ষেপে জেঠী যা লিখেছে ঃ

আগামী বিশে ফাল্গুন পদির বিয়ে। মাত্র একমাস হাতে আছে। এদিকে তোর জেঠামশাইয়ের বাতের ব্যথাটা ভীষণ বেড়েছে। এখন উত্থানশক্তি রহিত। নেহাত প্রয়োজন না হলে আর বিছানা ছেড়ে ওঠে না। এখন যা-কিছু করার আমাকেই করতে হবে। কিন্তু এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে তোর উপস্থিতি একান্তই কাম্য। তুই যদি এই বিয়েতে এসে না দাঁড়াস, বিয়ে স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমার অবস্থা বিবেচনা করে আশা করি তুই পত্রপাঠ চলে আসবি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেঠীর চিঠি পড়ে তো রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেলাম। হাতে আমার যা কাজ এক সেকেন্ডও এখান থেকে নড়া চলে না। অথচ জেঠী যেভাবে লিখেছে, না গেলে ভবিষ্যতে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যাবে। আমি নির্বিকার হয়ে বসে রইলাম না। যতটা পারি হাতের কাজ সেরে নিলাম। তারপর সুবিধেমত একদিন যাত্রা করলাম ঝাঁঝাঁর উদ্দেশ্যে।

ঝাঁ ঝাঁ নিয়ে গল্প অনেক শুনেছি কিন্তু চোখে দেখলাম এই প্রথম। দেখেই কেমন ভাল লেগে গেল। দুধারে পাহাড় মাঝখানে রেল লাইন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে মনে হয় যেন গিরিপথে দাঁড়িয়ে আছি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওনা হলাম। পথের নির্দেশ আমার কাছেই ছিল। তাই বিশেষ কোনও অসুবিধে হল না। পৌছতে পৌছতে প্রায় বেলা বারোটা বাজল।

গাড়িভাড়া মিটিয়ে গুটিগুটিঅগ্রসর হলাম বাড়ির দিকে। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাড়ির সামনে একটা ছোটখাট জনতার ভিড়।

এলোমেলো অনেক চিন্তাই মাথায় আসতে লাগল। সঠিক ঘটনাটা জানবার জন্য শেষ পর্যন্ত সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছে ভাই?

আমার প্রশ্ন শুনে, লোকটি আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েক মিনিট তারপর সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলোতে লাগল।

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

পুরো এক মিনিট সময় অপেক্ষা করার পরেও লোকটি যখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না, আমি বেশ একটু চটেই গেলাম। বিরক্ত হয়ে বললাম, তুম্ কি বোবা হ্যায়?

সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, নে-হি—

আমি বললাম, তব্ বাত বলতা নেহি কাহে?

সে আমার দিকে পা পা করে এগিয়ে এসে কানে কানে বলল, খু—ন!

খুনের নামে আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করে উঠল। আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম—কৌন্?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে কি যেন ভাবল তারপর আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ পেছু হাঁটতে আরম্ভ করল।

বুঝলাম আমার চেহারা দেখে লোকটি ভয় পেয়েছে। অযথা আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ভিড় ঠেলে বাড়ির দিকেই অগ্রসর হলাম। কৌতূহলী জনতা আমাকে কোনও জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ভেবে সসঙ্কোচেই পথ ছেড়ে দাঁড়াতে লাগল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখি সেখানেও একটা ছোটখাট ধরনের জনতা। অথচ জেঠা-জেঠী বা বোনেদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না সেখানে। বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েই এদিক সেদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কে একজন বলে উঠল, আপনি কাকে খুঁজছেন?

মুখ ঘুরে তাকাতেই যার সঙ্গে চোখাচোখি হল তাকে আমি কোনদিনও দেখি নি। বললাম, হাবুল দত্ত এই বাড়িতে থাকেন না?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল, থাকেন তো। কিন্তু তিনি তো এখন হাত-পা বাঁধা

অবস্থায় পড়ে আছেন। পুলিশের পাছে অসুবিধে হয় এইজন্য আমরা তাঁকে কেউ স্পর্শ করি নি।

আমি বললাম, কেন?

ছেলেটি বলল, আজ ভোরবেলায় মাসীমা পদিদিকে নিয়ে দেওঘরে গিয়েছেন বাড়িতে কেবল মেসোমশাই আর রামুয়া ছিল। ঘন্টা দেড়েক আগে চারজন লোক মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢুকে, মেসোমশাই আর রামুয়াকে বেঁধে আলমারি থেকে পদিদির বিয়ের জন্য কেনা সত্তর ভরি সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

থানায় খবর দিয়েছি। পুলিশ আসছে। তবে একটু দেরি হবে।

ছেলেটির পরিচয় আর জানা হল না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম জেঠার ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখি জেঠার হাত-পা দড়ি দিয়ে আর চোখ-মুখ রুমালে বাঁধা রয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চোখ আর মুখের বাঁধন খুলে দিতে জেঠা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আমি বললাম, কী ব্যাপার?

জেঠা হাঁফ ছেড়ে বলল, আর বলিস কেন! তোর জেঠী তো সকালে দেওঘরে গিয়েছে। আমি বাতের ব্যথায় নড়তে পাচ্ছি না। তাই চা খেয়ে খাটে বসে কাগজ পড়ছি হঠাৎ পেছন থেকে কটা লোক এসে আমায় জাপটে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল এবং যাবার সময় কানে কানে বলে গেল, ঝামেলা করলে বিপদ হবে।

তাই নাকি! বলে আমি মুচকি হাসলাম, তারপর গেলাম রামুয়াকে উদ্ধারের জন্য।

রামুয়ারও ওই একই অবস্থা। তবে তাকে উত্তমমধ্যম বেশ কয়েক ঘা দেওয়ার ফলে, তার আর উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই।

সবকিছু দেখেশুনে আমি জেঠার ঘরে ফিরে আসার কিছু পরেই জেঠী এসে পৌছল। জেঠী সব ঘটনা শুনে থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আমার হাত ধরে কঁকিয়ে কেঁদে উঠে বলল, ওরে লম্বু, আমার একি সর্বনাশ হলরে! আজ বাদে কাল পদির বিয়ে অথচ ডাকাত এসে গয়না নিয়ে গেল। আমি এখন কি দিয়ে পদির বিয়ে দেব? পাত্রপক্ষ তো ওই গয়নার লোভেই পদিকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল।

জেঠীর কাতর হবার কারণ আমি মনে মনে উপলব্ধি করলাম। ভরসা দিয়ে বললাম, ঘাবড়াচ্ছ কেন? বিয়ের তো এখন দেরি আছে। চেষ্টা করলে এর মধ্যে কি আর ডাকাত ধরা পড়বে না!

জেঠী কপালে করাঘাত করে বলল, সবই আমার অ-দৃ-ষ্ট!

যথাসময়েই পুলিশ এসে হাজির হল বাড়িতে। দারোগা রামসিং তেওয়ারি

দরজমিনে তদন্ত করে, জেঠাকে প্রশ্ন করল, বাড়িতে আপনার বাইরের লোক কে কে আছে?

জেঠা বলল, আপাততঃ বাইরের লোক বলতে দুজনই আছে। এক রামুয়া চাকর যাকে ওরা মারধোর করে বেঁধে রেখে গিয়েছে আর আমার ভাইপো লম্বমান। অবশ্য সে এই ঘটনা ঘটার পরেই এখানে এসে পৌঁছেছে।

রামসিং তেওয়ারি হাতের রুলগাছটা ঘোরাতে ঘোরাতে, গোঁফের আড়ালে মুচকি হেসে বলল, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এদের দুজনকেই থানায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আপাততঃ আপনার ভাইপোকেই নিয়ে যাচ্ছি। রামুয়া একটু সুস্থ হলে ওকেও থানায় পাঠিয়ে দিবেন।

আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার কথা উঠতেই জেঠা হাঁ-হাঁ করে উঠল। হাত নেড়ে বলল, 'দ্যাটস্ কোয়াইট্ ইম্পসিবল্। আফটার অল্ হি ইজ মাই গেস্ট।' তাকে আমি কিছুতেই থানায় যেতে দিতে পারি না।

জেঠা আমার অনেক গুণই গাইল বটে কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হল না। রামসিং তেওয়ারি ছুঁচলো গোঁফটা আঙুল দিয়ে পাকাতে পাকাতে বলল, হোবুল বাবু আপনার অসুবিধে সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, পুলিশে যখন খবর দিয়েছেন এবং তাদের সাহায্য চেয়েছেন তখন তাদের কর্তব্যে বাধা দেওয়াটা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। বিশেষ করে আপনি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক যখন।

রামসিং তেওয়ারির অকাট্য যুক্তির কাছে জেঠা মাথা নত করল এবং অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ফাঁসির আসামীর মত আমার আর নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। আমি তেওয়ারিকে ডেকে বললাম, আমার কোনও আপত্তি নেই। চলুন আমি থানায় যাচ্ছি—

আমার কথা শুনে জেঠা হাত নেড়ে কি যেন বলতে আসছিল, আমি আর তাবে সে সুযোগ দিলাম না। বললাম, আপনি জানেন তো আমি বর্ন স্পোর্টস্‌ম্যান—থানায় যাওয়াকে আমি অপমানকর বলে ভাবি না। থানায় আমার নামধাম লিখিয়েই চলে আসছি। আপনি বরং জেঠীকে বলুন খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে।

থানা থেকে যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব ভেবেছিলাম তত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম না। গিয়ে শুনলাম থানার ও-সি হাটে গিয়েছে লাড্ডু কিনতে। ও-সি না ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে না। শুনে রাগে আমার শরীর রি রি করে উঠল। টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে বললাম, মিঃ তেওয়ারি কলকাতা হলে পুলিশ-

কমিশনারকে একখানা ফোন করে ও-সি মশাইয়ের চাকরি খেয়ে নিতাম। নেহাত এটা আমার নাগালের বাইরে তাই এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। রামসিং তেওয়ারি আমার মুখের দিকে একমিনিট ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তারপর আমতা আমতা করে বলল, কিছু মনে করবেন না মিঃ দ্যাট, ও-সির শ্বশুরবাড়ি থেকে শালাশালীরা বেড়াতে এসেছে। অনেক লাড্ডুর প্রয়োজন। তাই হাটে গিয়েছে এখুনিই আসবে।

'ধন্যাবাদ' বলে আমি চোখ বুজিয়ে বসে রইলাম। ঘুমে চোখ বুজে আসতে লাগল।

বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ ও-সি ঘামতে ঘামতে লাড্ডুর থলে বগলে নিয়ে হাজির হল থানাতে।

তেওয়ারির কাছ থেকে সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে এবং আমার পরিচয় পেয়ে তখুনি বসে গেল আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

ট্রেনের রিজার্ভেশনের টিকিটখানা আমার পকেটেই ছিল। সেটা বের করে ও-সির হাতে দিয়ে বললাম, ট্রেন যখন ঝাঁঝায় পৌঁছেছে, ততক্ষণে ডাকাতরা ডাকাতি করে, বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন আমার কাছে কি জানতে চান বলুন—

ও-সি আমার বক্তব্য শুনে দুদিকেই এমন করে মাথা নাড়তে লাগল, আমার ইঙ্গিতটা আদৌ তার মাথায় ঢুকল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। ইতিমধ্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রামুয়া এসে হাজির হল থানাতে। ওদের নিকটতম প্রতিবেশী যে লোকটির সঙ্গে আমার প্রথমেই সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই ওকে পাহারা দিয়ে থানায় এনেছে।

ও-সি আমাকে রেহাই দিয়ে রামুয়াকে নিয়ে পড়ল। বলল, ঘটনাটা কি শুনি? একবর্ণও লুকোবে না। তাহলে কিন্তু ফল ভাল হবে না।

রামুয়া অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। হাতজোড় করে বলল, হুজুর, বাবুর পায়ে মালিশ করে দিয়ে আমি সবেমাত্র আমার ঘরে এসে খাটিয়ায় বসেছি, হঠাৎ কে যেন ঘন ঘন কড়া নাড়তে লাগল। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বলল, গিন্নীমা গাড়ি থেকে নামতে পাচ্ছে না। জিনিসগুলো নামিয়ে নাও। গিন্নীমার ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি তাই অবিশ্বাস না করেই দরজা খুলে দিয়েছিলাম। দরজা খোলামাত্রই একজন দুম করে আমার চোখে এমন একটা ঘুঁষি মারল মাথাটা আমার বনবন করে ঘুরতে লাগল। একজন আমাকে সামনের ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম ওরা এই জেলারই লোক। এই বলে রামুয়া থামতে, ও-সি ডায়েরিতে কি যেন লিখে নিতে শুরু করল।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর, ও-সি রামুয়াকে রেহাই দিয়ে বলল, ঠিক আছে, তোকে আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি। তলব মিললেই চলে আসবি থানায়।

আমি চেয়ারেতে বসে ছিলাম। ও-সি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'এক্সকিউজ মি মিঃ দাট্। আই অ্যাম্ ভেরি স্যরি ফর্ ইওর হ্যারাস্মেন্ট'!

আমি ও-সির হাত ধরে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে মুচকি হাসলাম। তারপর থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা করলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি জেঠা ও জেঠী দুজনেই আমার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। আমি হাজির হবামাত্রই জেঠী আমার হাত দুটো ধরে বলল, এরকম ঘটবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি রে লম্বু। তুই যেন ফিরে গিয়ে কারুর কাছে গল্প করিস নি। তাহলে আর—

আমি জেঠীর অবস্থা দেখে হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, তুমি এব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। লম্বমান সে ধাতুতে গড়া নয়।

খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমরা যখন এই চুরির ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে গুলতানি করছি, দারোগা ও কয়েকজন সেপাই সহ স্বয়ং ও-সি এসে হাজির হ'ল বাড়িতে। জেঠাকে বলল, আমরা বিস্তৃতভাবে তদন্ত করতে এসেছি। আশা করি এব্যাপারে আপনার কোনও আপত্তি নেই।

জেঠা ঘাড় নেড়ে বলল, না না, আপত্তির আর কি থাকতে পারে! দেখুন না যদি কোনও হদিস করতে পারেন—

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গেলেন এবং নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন। আমরা সবাই লম্বুদার এই নীরবতা সমর্থন করলেও, বাস্তব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বলল, তদন্ত শুরু করে আর নীরবতা শোভা পায় না। বলুন, তারপর কি হল—

লম্বুদা সিগারেটটিতে শেষ টান দিয়ে, মাটিতে ফেলে জুতোয় পিষতে পিষতে বললেন, যে ঘর থেকে আলমারির তালা ভেঙে গয়না নিয়ে গিয়েছিল, ও-সি স্বয়ং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সাহায্য নিয়ে, তন্নতন্ন করে সেই ঘর খুঁজতে লাগল। ও-সি যখন আলমারির গায়ে হাতের ছাপ খুঁজতে ব্যস্ত, হঠাৎ একজন সেপাই একটা আধপোড়া বিড়ি এনে তাঁব হাতে দিয়ে বলল, স্যার, এটা আলমারির পাশেই পড়েছিল দেখুন তলাটা এখনও ভিজে ভিজে রয়েছে।

বিড়িটা হাতে নিয়ে ও-সির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা কাগজের টুকরোর ওপর বিড়িটা তুলে নিবিষ্টমনেই সে ওটা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর ও-সি জেঠাকে দুএকটা প্রশ্ন করল তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, নাঃ যা ভেবেছিলাম তা নয়। হোবুলবাবু বিড়ি খান না এবং রামুয়ার বাড়িতে বিড়ি খাওয়ার অভ্যেস নেই শুনে অনুমান করেছিলাম এটা অপরাধীদের কীর্তি নির্ঘাত। কিন্তু বিড়ির ভেতরের মসলা পরীক্ষা করে দেখলাম, বহুদিনের পুরনো হওয়ার

জন্যে, মসলা সব মিইয়ে গিয়েছে এতে আগুন ধরান কোনক্রমেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, অপরাধীরা যখন এ কাজ করেছে নিশ্চয়ই তাদের সর্বাঙ্গে উত্তেজনা ছিল। বিড়িটা যদি তাদের কারুর হাতে থাকত, উত্তেজনার কিছুটা ছাপ নিশ্চয়ই থেকে যেত তার গায়েতে। তৃতীয়তঃ বিড়ির গড়ন এবং আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, ফরমায়েসি বিড়ি। সম্ভবতঃ কোনও সৌখিন লোকই অতীতে বিড়িটা সদ্ব্যবহার করেছিল।

রামসিং তেওয়ারি এতক্ষণ হাঁ করেই ও-সির যুক্তি শুনছিল। অপরাধীদের সঙ্গে বিড়ির আদৌ কোন সংস্রব নেই শুনে, সে প্রশ্ন করল তাহলে স্যার আমাদের পরবর্তী কাজ কি হবে?

ও-সি গম্ভীর হয়ে বলল, দেখা তো যাক কোথায়ও কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা। না পেলে আরও ছড়িয়ে জাল ফেলতে হবে যাতে অপরাধীরা সুড়সুড় করে এসে পা দেয়।

রামসিং কৌতূহল চাপতে না পেরে বলল, যেমন—

ও-সি মৃদু হাসল। সব তো তোমায় এখুনি বলা সম্ভব নয়। তবে এই মুহূর্তেই যেটা করা একান্ত প্রয়োজনীয়, সোনার দোকানে খবর পাঠাও। এইসব গয়না কেউ সেখানে বিক্রী করতে এলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আমাদের জানান হয়।

রামসিং ঘাড় নেড়ে বলল, রাইট্ স্যার। আমার মনে হয় এখন অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে, ওই ব্যাপারেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ও-সি বলল, তাহলে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলি এস।

শূন্যহাতেই যখন পুলিশবাহিনী ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, হঠাৎ জেঠী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ও-সির পথরোধ করে বলল, আর মাত্র কুড়ি দিন বাকি বিয়ের। এই কুড়ি দিনের মধ্যে যেরকম করেই হোক আমার গয়না উদ্ধার করে দিতেই হবে আপনাকে। না দিলে সসম্মানে বিয়ে বাতিল করে দেওয়া ছাড়া আমার পক্ষে আর গত্যন্তর থাকবে না।

ও-সি অবশ্য জেঠীকে নিরাশ করল না। বলল, 'ডোন্ট ওরি, আই শ্যাল্ ট্রাই মাই বেস্ট'।

পুলিশ চলে যাবার পর দুসপ্তাহ কেটে গেল অথচ অপরাধী ধরা পড়ার নামগন্ধ নেই। এদিকে জেঠা খুব চিন্তিত হয়ে পড়তে লাগল এবং দুবেলা থানায় ধর্না দেওয়া শুরু করল। জেঠী আমার কানে ফিসফিস করে বলল, ঘরের কথা তুই তো সবই জানিস লম্বু। তোর জেঠা যা টাকা জমিয়ে ছিল, মেয়ের বিয়ের খরচ রেখে বাকি সবই বাড়ির পেছনে ঢেলেছে, এখন নতুন করে আর গয়না গড়াবার মত টাকা কোথায়!

পুলিশ এখন যেরকম টালবাহানা করছে, আমার মনে হয় বিয়ে শেষ পর্যন্ত বাতিলই করে দিতে হবে। গয়না সব চুরি গিয়েছে বললে কি আর পাত্রপক্ষ শুনবে!

জেঠীর হতাশায় আমি সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, তোমার ধারণা নেহাৎ অমূলক নয়। কম করেও শচার-পাঁচ বিয়ে তো আমি নিজের হাতে দিয়েছি, সবই বুঝি। কিন্তু তোমাদের এই বিপদ-মুহূর্তে আমি কীই বা করতে পারি বল?

আমার কথা শুনে জেঠী আমার মুখের দিকে একমিনিট অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, লম্বু তুই তো জীবনে অনেক অসাধ্য সাধন করেছিস। এই চোরটাকে ধরে দিতে পারিস না? জেঠীর কাছ থেকে এই ধরনের অনুরোধ আসবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তাই বেশ একটু হকচকিয়ে গেলেও, হো-হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, গোয়েন্দা না হলেও যে গোয়েন্দাগিরি জীবনে কখনও করি নি একথা সত্য নয়। তবে তোমরা যখন পুলিশের সাহায্য নিয়েছ, এব্যাপারে মাথা গলান কি আমার উচিত হবে? ভেবে দেখ।

জেঠী কোনও জবাব না দিয়ে নিরুত্তর রইল। বুঝলাম, জেঠার সঙ্গে পরামর্শ না করে চূড়ান্ত মতামত জানাতে রাজী নয়।

পরের দিন চায়ের টেবিলে বসে জেঠা নিজেই তুলল প্রসঙ্গটা। বলল, লম্বু তোর জেঠী বলছিল চুরির কেসটা পুলিশের হাত থেকে নিয়ে যদি তোর হাতে দিই, তুই নাকি চেষ্টাকরে দেখতে পারিস। কথাটা কি সত্যি?

আমি হ্যাঁ কিংবা না কিছুই না বলে জেঠার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে একবার মুচকি হাসলাম মাত্র। জেঠা আমার মনোভাব কিছুটা অনুমান করে নিয়েই হেসে বলল, অল্‌রাইট। আমি আজই থানায় খবরটা পৌঁছে দিচ্ছি। তুই তাহলে কোমর বেঁধে লেগে যা।

জীবনে কোনওদিন কোন কাজে ব্যর্থ হই নি। দায়িত্বটা মাথায় নিয়ে তাই বেশ সিরিয়াস্‌লিই চিন্তা করতে শুরু করলাম। যে ঘর থেকে গয়না চুরি গিয়েছিল সেই ঘরে আমি অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজন মনে করলাম না। কারণ পুলিশ তন্ন তন্ন করেই সে ঘর খুঁজেছিল। বরং যে ঘরে অপরাধীদের সঙ্গে রামুয়ার ধস্তাধস্তি হয়েছিল সেখানেই গেলাম কোনও সূত্র সন্ধানের আশায়।

ঘরটা সিঁড়ির তলায় হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। সাধারণতঃ অতিথি এলে বসতে দেওয়া হত সেখানে। রামুয়ার সঙ্গে অপরাধীদের ধস্তাধস্তির চিহ্নও বর্তমান। তাছাড়াও টুকিটাকি জিনিসপত্রও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

সতর্কতার সঙ্গে আমি চারদিকে চোখ বুলোতে লাগলাম। হঠাৎ ঘরের কোণে বিছানো চ্যাটাই-এর ওপর একটা পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে

ঝুঁকে পড়লাম তার ওপর। হুম্, যা ভেবেছি তাই। বাড়ির বাইরের কোনও লোকের পায়ের ছাপ। কারণ বাড়িতে এত বড় পা কারুর নেই। পায়ের ছাপ নিয়ে যখন অনেক কিছুই ভেবে ফেলেছি, হঠাৎ মনে হল পায়ের গোড়ালির ছাপটা যতটা স্পষ্ট সুমুখের ভাগটা ততটা নয়। বিশেষ করে পায়ের আঙুল আদৌ আছে কিনা জানবার কোনও উপায় নেই। এরকম অসম্পূর্ণ পায়ের ছাপের ওপর নির্ভর করে গোয়েন্দাগিরি চলে না। অগত্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার অনুসন্ধানে মন দিলাম।

ঘরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোনও সূত্রের সন্ধান না পেয়ে যখন ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়েছি হঠাৎ ঘরের পশ্চিম কোণে একরাশ ধূলোবালির সঙ্গে একগাছা তৈলাক্ত চুল চোখে পড়ল। কৌতূহল সামলাতে না পেরে চুলটা তুলে নিলাম সেখান থেকে। চুলের দুপ্রান্ত ধরে চোখের সামনে মেলে ধরতে মনটা খুশিতে নেচে উঠল।

চুলের যা দৈর্ঘ্য জেঠা, জেঠী, পদি বা রামুয়া কারুরই নয়। বিশেষ করে রামুয়ার তো নয়ই। কারণ সম্প্রতি সে নেড়া হওয়ার ফলে মাথায় সবেমাত্র খোঁচা খোঁচা চুল গজিয়েছে।

চুলটা তৈলাক্ত দেখে নাকের কাছে ধরলাম। কড়ুয়ার তেলের গন্ধ নাকে এল অর্থাৎ তেলটা যে টাটকা ছিল এবং কয়েকদিন আগে চুলে মাখান হয়েছিল এই গন্ধই তার প্রমাণ।

একটা খালি দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে চুলটা পুরে নিয়ে, দৌড়লাম জেঠীর কাছে। জেঠীকে প্রশ্ন করলাম, ইতিমধ্যে কোনও আত্মীয় স্বজন এখানে বেড়াতে এসেছিল কিনা।

জেঠী ঘাড় নেড়ে বলল, না না কে আর আসবে! সরস্বতী পুজোর সময় হাঁদু বউ নিয়ে বেড়াতে এসেছিল বটে, তারপর আর কেউ আসে নি।

জেঠির কথা শুনে আমার মনে বেশ একটুআশার সঞ্চারই হল। রামুয়াকে খুঁজতে খুঁজতে কুয়োর পাড়ে তার সঙ্গে দেখা হল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোকে বাঁধবার সময় যে লোকটার সঙ্গে তোর কয়েক মিনিট ধস্তাধস্তি হয়েছিল তার মাথায় কি চুল ছিল?

রামুয়া একমিনিট চিন্তা করে ঘাড় নেড়ে বলল, না সাহেব, মাথা কামানই ছিল। তবে তার টিকি ছিল প্রকাণ্ড। আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় আমি যে সেটা একবার ধরেছিলাম স্পষ্টই মনে আছে এবং আমার হাতের মুঠো থেকে সেটা ছাড়াতে তাকে যথেষ্ট বেগও পেতে হয়েছিল।

রামুয়ার কথা শুনে আনন্দে আমার মন নেচে উঠল। এই চুলটা যে টিকিরই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রামুয়ার হাতের মুঠো থেকে সেটা টেনে বের করবার সময়েই এটা তার টিকি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

চুলটা অপরাধীর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে, আমার পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করে ফেললাম। গোপনে স্থানীয় নাপিতদের এক সর্দারের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। পারলে নগদ দুশো রুপিয়া বকশিশ।

দুশো রুপিয়ার লোভে সর্দার হাঁ হাঁ করে উঠে বলল, বলুন বাবু কি কাজ। আমি জান লড়িয়ে দেব!

আমি দেশলাইয়ের খোলের ভেতর থেকে সেই চুলটা বের করে, সর্দারের হাতে দিয়ে বললাম, এই চুলটা এই মহল্লারই একজনের টিকির চুলের মাপ। তুমি মহল্লার নাপিতদের সঙ্গে দেখা করে চুপি চুপি বলে দাও, এখন থেকে কেউ দাড়ি বা চুল কাটতে এলে, যদি তার মাথায় টিকি থাকে তাহলে যেন তার টিকির মাপের সঙ্গে এই চুলের মাপ মিলিয়ে দেখে। এবং যার সঙ্গে হুবহু মিলবে তার নামধামটা যেন আমাকে জানিয়ে দেয়।

আমার প্রস্তাব শুনে সর্দার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল তারপর 'বিলকুল ঠিক হ্যায়' বলে চুলটা নিয়ে চলে গেল।

দুশো রুপিয়া বকশিশের কথাটা আমি চিৎকার করে আবার শুনিয়ে দিলাম। সর্দার হাত তুলে আবার কি বলল বটে, কিন্তু আমার কানে এসে আর পৌঁছল না।

এদিকে জেঠা ও জেঠী দুজনেই অস্থির হয়ে পড়ল। বিয়ের মাত্র আর তিনদিন বাকি। কোথায় চোর আর কোথায় গয়না তার ঠিক নেই। জেঠা ধৈর্যচ্যুত না হলেও জেঠী ধৈর্য হারাল। আমাকে বলল, লম্বু এবার একটু ঝেড়ে কাশ। একটা চুলের ভরসায় কি আর বিয়েতে এগুনো যায়! তাছাড়াও এসব অঞ্চলে প্রায় সকলের মাথায় টিকি আছে। সকলের টিকির চুল মেপে বেড়ান কি আর মুখের কথা! না পারিস তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেল্। বিয়ে নাকচ করে দিয়ে দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচি!

জেঠীর কথা শুনে আমি নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে মুচকি হাসলাম মাত্র। জেঠীর কথায় গুরুত্ব না দিলেও মনের মধ্যে কিন্তু খচখচ করতে লাগল। অপরাধী যদি ধরা না পড়ে, মখ দেখানোর আর উপায় থাকবে না। নেহাতই চুপি চুপি আমায় এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির সংলগ্ন বাগানে পায়চারি করছি হঠাৎ দেখি সর্দার গুটিগুটি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি দৌড়ে গিয়ে সর্দারকে জাপটে ধরে বললাম, কেয়া কুছ মিলা হ্যায়?

সর্দার ঘাড় নেড়ে বলল, জরুর। পিপলাই নদীর ধারে যে আটাবাগান আছে, সেখানে লাল্লু পাণ্ডা নামে একজন মস্তান থাকে। লাল্লুর টিকির চুলের মাপের সঙ্গে ওই

চুলের মাপ হুবহু মিলে গিয়েছে। এ চুল যে তার এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সর্দারের হাতে সঙ্গে সঙ্গে একশ'টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, যথেষ্ট। এখন এই নাও, বাকি ধরা পড়লে এবং প্রমাণিত হলে পাবে। সর্দার খুশিমনেই আমার প্রস্তাব মেনে নিল।

পিপলাই নদী খুব বেশ দূরে নয়। ঘন্টা তিনেক পায়ে হেঁটেই পৌঁছে গেলাম আটাবাগানে। লাল্‌লু দাওয়ায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল। আমি গিয়ে সেখানে হাজির হবামাত্রই, সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে এই দুরাশঙ্কায় আমি একমুহূর্ত আর বিলম্ব না করে হাসতে হাসতে বললাম, ঘাবড়াইয়ে ম্যত্‌। আমি ভারতীয় টিকি কালচার সংস্থার তরফ থেকে আসছি। ভারতীয় টিকির ভবিষ্যৎ কালচার করাই আমাদের কাজ। আপনার টিকি থেকে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। আশা করি আপত্তির কোনও কারণ নেই

লাল্‌লু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত কি যেন ভাবল তারপর পেছন ফিরে টিকিটা আমার মুখের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, লিজিয়ে, কই বাত্‌ নেই

লাল্‌লুর দীর্ঘ ও পুষ্ট টিকিটার ডগায় একটা কলকে ফুল বাঁধা ছিল। আমি ধীরে সুস্থে সেটা খুললাম এবং টেপের সাহায্যে মাপ নিলাম। হুঁ, সর্দারের কথা ঠিকই একই মাপ। কাঁটায় কাঁটায় সওয়া পাঁচ ইঞ্চি। টিকিটা ধরে নাড়ানাড়ি করতে করতে পট্‌ করে একগাছা চুল ছিঁড়ে নিলাম তা থেকে, তারপর ব্যস্ততার ভান করে সরে পড়লাম সেখান থেকে।

বাড়ি না ফিরে প্রথমেই গেলাম ল্যাবরেটরীতে তারপর সোজা থানায়। ও-সির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, আটাবাগানের লাল্‌লুই এই অপারাধের মূল পাণ্ডা আপনারা এখুনি গিয়ে ওর বাড়ি সার্চ করুন। হাবুল বাবুর অপহৃত সব গয়না পেয়ে যাবেন বলেই আমার ধারণা।

ও-সি আমার নির্দেশ মতই তখুনি ছুটল লাল্‌লুর বাড়ি পুলিশ বাহিনী নিয়ে। অনুসন্ধান চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত ধানের বস্তার মধ্যে পেয়ে গেল গয়নার পুঁটলি। হাতেনাতেই লাল্‌লুকে গ্রেপ্তার করা হল।

সব গয়না ফেরত পেয়ে নির্দিষ্ট দিনেই পদির বিয়ে হয়ে গেল। জেঠীর এত আনন্দ হয়েছিল, বিয়ের দিন আমাকেও মালা পরিয়ে বসিয়ে রাখল বাসরে। অর্থাৎ সেদিনের আনন্দের উপলক্ষ্য যে কেবলমাত্র পদির বর নয়, আমিও, সেটাই জানাবার চেষ্টা করেছিল নিমন্ত্রিতদের, বলেই লম্বুদা হা-হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

লম্বুদার সঙ্গে আমরা সকলে হাসিতে যোগ দিলেও বিপ্লব গুম মেরেই বসেছিল। লম্বুদা ধীরে ধীরে হাসির দমক কমিয়ে আনতে, বিপ্লব বলল, লম্বুদা আপনার অভিনব গোয়েন্দাগিরি শুনলাম বটে, কিন্তু ঠিক পরিষ্কার হ'ল না।

লম্বুদা ভূকুঁচকে বিপ্লবের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললেন, কেন আমি না বোঝার মত কিছুই বলি নি। দেড় বছরের শিশুও বুঝতে পারে। যা হোক একান্তই যখন বুঝতে পার নি বলছ, বল অসুবিধেটা কোথায়?

বিপ্লব মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, টিকির মাপের সঙ্গে চুলের মাপ মিলিয়ে আপনি অপরাধীকে ধরলেন কিন্তু ওসব অঞ্চলে তো আর একজনের মাথায় টিকি নেই। হাজার হাজার লোকের মাথায় টিকি আছে। ওইসব টিকি দেখে ছোট-বড় হলেও, সওয়া পাঁচ ইঞ্চি টিকি যে লাল্‌লু ছাড়া আর কারুর মাথায় থাকবে না, এমন গ্যারান্টি আপনি কোত্থেকেই বা পেলেন!

লম্বুদা প্রশ্নটা আদৌ শুনতে পেলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ টানতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে দশমিনিট কেটে গেল। আমরা সবাই লম্বুদার উত্তর শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি। লম্বুদা কিছুতেই আর মুখ খোলেন না।

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে হা-হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, টিকি সমান লম্বা হতে পারে ঠিকই, কিন্তু মাথার ঘিলু? মাথার ঘিলু নিশ্চয়ই এক হয় না।

লম্বুদার কথা শুনে এবার আমাদের ভিরমি খাবার উপক্রম হল। আমি বললাম, তার মানে?

লম্বুদা দু'নাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, মাথা থেকে চুল ছিঁড়লে চুলের আগায় একবিন্দু শ্বেতবস্তু লেগে থাকে দেখেছ? এটা আর কিছুই নয় মাথার ঘিলু। মানুষের এই ঘিলু কোনপ্রকারেই একরকম হয় না।

কুড়িয়ে পাওয়া চুলের আগায় লেগে থাকা ঘিলু আর লাল্‌লুর টিকির চুলের ঘিলু আমি ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। একই, অতএব—

আমরা একমিনিট লম্বুদার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ প্রায় একসাথেই নিজের নিজের মাথার ঘিলু দেখবার আশায় চুল ছিঁড়তে শুরু করলাম।

লম্বুদা আড়চোখে সেটা প্রত্যক্ষ করে, শূন্যে অনর্গল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

# হীরে মণি মুক্ত

আড্ডার ইতিহাসে যা কখনও ঘটে নি আজ তাই-ই ঘটল অর্থাৎ আমরা সদলবলে ঘরে ঢুকে দেখলাম, লম্বুদা দুটো চেয়ার জুড়ে বেশ আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে একখানা বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছেন।

লম্বুদা বই-এর মধ্যে এমনভাবে ডুবে ছিলেন, আমরা যে ঘরে ঢুকেছি তিনি খেয়ালই করেন নি। হঠাৎ বাস্তব কেশে সাড়া দিতে, লম্বুদা বই-এর পাতা থেকে চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন তারপর বইখানা বন্ধ করে টেবিলে রেখে, একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, উনিশ শো আটচল্লিশ সালে কোনান আমার কাছে হার স্বীকার করে, তার লেখা এই বইটা উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিল। চব্বিশ বছর ধরে বইটা পড়ব পড়ব ভাবছিলাম কিন্তু কিছুতেই আর সময় করে উঠতে পারছিলাম না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রমিস্ করেছি, ঝড় হোক তুফান হোক এমন কি যদি পৃথিবী রসাতলেও যায়, তাহলেও বইটা আজ শেষ করবই। অবশ্য না পড়লেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না বলে লম্বুদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

লম্বুদার সংস্পর্শে এসেছিলেন যখন, কোনান যে চুনোপুঁটি লেখক নন সেটা আমাদের কারুরই অনুমান করতে অসুবিধে হল না। কিন্তু পুরো নামটা না বলার ফলে আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাউই করতে লাগলাম।

বাস্তবের আর তর সইল না। হঠাৎ বলে উঠল, কোনান ভদ্রলোক কে লম্বুদা?

বাস্তবের প্রশ্ন শুনে লম্বুদা তার মুখের দিকে একমিনিট অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তারপর হো-হো-হো করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেন, বল কি হে কোনানের নাম শোন নি—স্ট্রেঞ্জ! শার্লক হোম স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলের নাম একুশ দিনের বাচ্চাও জানে, আর তোমরা—। অবশ্য কি করেই বা শুনবে! পড়বে তো খালি তপনকুমার কিংবা জীবনকুমারের সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী। ওদিকে নজর থাকলে কি আর কোনান ডয়েলের নাম জানা যায়! চালে কাঁকর মেশান থাকে। এখন তোমরা যদি বেছে বেছে কাঁকরগুলো তুলে নিয়ে চালগুলো ফেলে দাও তাহলে আর চালের আস্বাদ পাবে কোত্থেকে! লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলেন।

নিজেদের অজ্ঞতা এভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতে লম্বুদাকে আর বিশেষ ঘাঁটালাম না। বললাম, লম্বুদা কোনা ডয়েল ভাল গোয়েন্দা কাহিনী লেখেন শুনেছি কিন্তু ইংরিজী ভাল বুঝি না, পড়ার ইচ্ছে থাকলেও আমাদের পক্ষে পড়া সম্ভব হয়

নি। যা হোক আপনার কাছে তার হার মানার কাহিনীটা কি আমাদের শোনাবেন?

লম্বুদার চোখে খুশির ঝিলিক উঠল। কি যেন একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ চেপে গেলেন এবং নির্বিকার চিত্তেই ধূমপান করতে লাগলেন। প্রায় দশমিনিট ধরে লম্বুদার সঙ্গে আমাদের ঠাণ্ডা লড়াই চলল। লম্বুদাও মুখ খুলবেন না আমরাও অনুরোধ করব না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাদেরই জিত হ'ল। লম্বুদা পোড়া সিগারেটটা ছাইদানিতে রেখে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ তোমরা যেন কি বলছিলে?

আমি প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করতে, লম্বুদা রসগোল্লার মত গোল গোল চোখ করে বললেন, কোনান ডয়েলের সঙ্গে আমার পূর্বে কোনও পরিচয় ছিল না। উনিশ শো আটচল্লিশ সালে প্যারিসের সী ভিউ হোটেলে ওর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হল, ও আমার পরিচয় জানতে পেরে বলল, আপনিই ভারতের দি গ্রেট লম্বমান দাট্। আপনার কথা যে কত শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, যে কদিন আপনি এখানে থাকবেন আমি যদি আপনার সঙ্গে থাকি, আপনার দিক থেকে কোনও আপত্তি আছে?

কোনানের আবদারটা আমার তেমন মনঃপূত না হলেও এমন আন্তরিকতার সঙ্গে সে প্রস্তাবটা করল, আমি আর মুখ ফুটে না বলতে পারলাম না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমর্থন করলাম।

প্যারিস স্পোর্টস কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য প্রতিবছরই আমার আমন্ত্রণ থাকত। সে বছর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সাতদিন একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল এবং সেই সাতদিনই সভাপতিত্ব করার কথা ছিল আমার সেখানে।

সাতদিন ঐ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকার দরুন, রাত্রিবেলা ছাড়া কোনানের সঙ্গে আমার দেখা হত না। আমি সারা দিন ওই কাজেই ব্যস্ত থাকতাম। কোনান ঘরে বসে গোয়েন্দা কাহিনী লিখত।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। আমি ফ্রি হতে, কোনান তার লেখার খাতা শিকেয় তুলে রেখে বলল, রহস্যোপন্যাস লেখা যে এত পীড়াদায়ক, আগে টের পেলে কখনই এ পথে আসতাম না। এ নেশা এমনই নাওয়া-খাওয়া তো ভুলেছিই, একমুহূর্ত যে প্যারিসের পথ-ঘাটের বিশুদ্ধ হাওয়া খেতে বেরুব তারও উপায় নেই। বাইরে বেরুলেই কেবল মাথার মধ্যে খুনখারাপি আর চুরি-ডাকাতির চিন্তা পাক খাবে।

কোনানের আক্ষেপ শুনে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম, বন্ধু জলে নামবে জল ছিটাবে বেণী ভিজাবে না তা কি আর হয়? অতই যদি শান্তিকামী হয়ে থাকতে চাও, তাহলে আমাদের দেশে চল। বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে উলুবাবার আখড়ায়

ছেড়ে দেব। ছাই মেখে ধূপধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকবে। দেখবে মাথায় কোনও চিন্তা নেই। মাথাখানা সোলার মতই হালকা হয়ে শূন্যে ভাসছে।

আমার মন্তব্যটা কোনান নীরবে হজম করল না। সিগারেটকেস থেকে একটা সিগারেট বের করে খেতে খেতে বলল, 'ইজ্ ইট্!' ইস্, আর কিছুদিন আগে যদি জানতে পারতাম! কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই। দশ দশজন প্রকাশকের টাকা খেয়ে বসে আছি। এখন যদি চুক্তিমত তাদের বই দিতে না পারি, যে কোনও মুহূর্তে আমার মুণ্ডুর খোঁজেই কোন-না কোন গোয়েন্দাকে আবার এগিয়ে আসতে হবে। কোনান হা-হা-হা করে হাসতে লাগল। আমিও কোনানের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলাম। এসভাবেই দিনান্তরে কোনান আমার কাছে ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে পড়তে লাগল।

কোনানের সঙ্গে দেশ-বিদেশের দর্শনীয় বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন প্যারিসের কথা উঠল। আমি বললাম, যদিও প্রায় প্রতিবছরেই আমি একবার করে প্যারিসের মাটিতে পা দিই কিন্তু নানা কাজের চাপে এখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলো আর দেখা হয়ে ওঠে নি। এবছর একরকম প্রতিজ্ঞা করেই বেরিয়েছি, না দেখে আর ফিরব না। তা তোমাকে যখন সঙ্গী পেয়েছি সুবিধেই হবে। অবশ্য তোমার কোন আপত্তি না থাকলে—

আমার শেষোক্ত মন্তব্যে কোনান বেশ একটু লজ্জিতই হল। হাত কচলাতে কচলাতে বলল, হ্যাঁ আমারও ওই একই অবস্থা। কতদিনের সখ চাঁদনি রাতে ইফেল টাওয়ারের চুড়োয় বসে প্যারিসের সৌন্দর্য দেখব কিন্তু সে আর কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। চলুন না আগামীকাল পূর্ণিমা রাতে ইফেল টাওয়ার দেখতে যাই।

কোনানের প্রস্তাবটা আমার খুবই ভাল লাগল। আমি বললাম, 'ভেরি ভেরি রোমান্টিক আইডিয়া নো ডাউট।' আমার এতকাল ধারণা ছিল কেবল মাত্র ভারতীয়দেরই বুঝি রুচি বোধ আছে। কিন্তু এখন দেখছি সে ধারণা ভুল। আচ্ছা আমরা যে কয়েক ঘন্টা টাওয়ারের মাথায় কাটাব, সঙ্গে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে গেলে কেমন হয়! খেতে খেতে সময় কাটালে মনে হয় আরও উপভোগ্য হবে—তাই নয় কি?

খাওয়ার নামে কোনান জিব বের করে ঠোঁট দুটো ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে বলল, 'ভেরি গুড্ আইডিয়া।' আমি এ ব্যাপারে চিরকালই একটু বেশি উৎসাহী। কিন্তু কি জিনিস নেবেন সেটা ভেবে দেখেছেন কি?

কোনান নির্বাচনের দায়িত্বটা পুরোপুরি আমার ঘাড়ে ছেড়ে দেওয়াতে আমি একমিনিট ভেবে নিয়ে বললাম, কেক ও কাটলেট আর প্যাসট্রি খেয়ে খেয়ে তো তোমাদের জিবে শ্যাওলা পড়ে গিয়েছে। যদি তোমার ভারতীয় খাবারে আপত্তি না থাকে তো একটা ভাল খাবারের নাম বলি।

কোনান হৈহৈ করে উঠে বলল, বেশ তো বলুন না—

আমি বললাম, আলুরদম আর কড়াইশুঁটির কচুরি। শুধু বেস্ট ফুড নয়, দি বেস্ট বলতে পার। এ জিনিস যত খাবে ততই খেতে ইচ্ছে করবে। আশ্চর্য এর ক্ষমতা। আর তৈরীর ফরমুলাটাও আমার জানা আছে। এখন যদি কাউকে দিয়ে তৈরী করান যায়।

আমার প্রস্তাব শুনে কোনান অন্যমনস্ক হয়ে একমিনিট বিড়বিড় করল। তারপর হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল, ওলুর ডোম কৌচুরি! 'ভেরি সুইট্ নেম্।' আমার কোনও আপত্তি নেই। জন্ম থেকে তো শুধু দেশীয় খানাই খাচ্ছি। একদিন না হয় ভারতীয়ই খেলাম।

ম্যানেজারের সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ ছিল। কোনান রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই অপর প্রান্ত থেকে ম্যানেজার মিঃ গামবিয়ার গলা ভেসে এল। কোনানকে সুপ্রভাত জানিয়ে বলল, কী চাই স্যার বলুন? কালি, কলম, কা-গ-জ!

কোনান তার স্বভাব সুলভ হাসি হেসে উঠে বলল, না না না আপাততঃ ওসব কিছুর প্রয়োজন নেই।

আগামীকাল আমি আর মিঃ দাট্ সন্ধ্যেবেলায় ইফেল টাওয়ার দেখতে যাব বলে স্থির করেছি। জলখাবার হিসেবে সঙ্গে ওলুর ডোম কড়াইশুটির কৌচুরি নিয়ে যেতে চাই। আপনি কী বানিয়ে দিতে পারবেন?

কোনানের প্রশ্নের কোনও জবাব এল না প্রথমে। লাইন কেটে গিয়েছে ভেবে কোনান যখন 'হ্যালো' 'হ্যালো' শুরু করেছে, হঠাৎ ম্যানেজার বলে উঠল, কী যেন নাম বললেন স্যার, ওলুর ডোম কৌচুরি না কি যেন?

'রাইট ইউ আর্' বলে কোনান আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, কী পারবেন? ভেবে দেখুন ভাল করে। না পারলে আবার মেনু পালটাতে হবে।

মিঃ গামবিয়া গলার স্বর ভারি করে বলল, শুনুন মিঃ ডয়েল, প্যারিস সী ভিউ হোটেলের অভিধানে 'নো' বলে কোনও শব্দ নেই। প্রয়োজনে আমরা এখান থেকে ব্যাঙের দুধও সাপ্লাই করতে পারি, ওলুর ডোম কৌচুরি তো দূরের কথা! তবে আপনাদের সহযোগিতা একান্তই দরকার। আমাদের ঊনপঞ্চাশ নম্বর ঠাকুর জ্যাম্বু খুবই পাকা রাঁধুনি। দেশ-বিদেশের অনেক রান্নাই সে জানে। তাকে বরং আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি মিঃ দ্যট্‌কে বলুন, রান্নার পদ্ধতিটা তাকে শিখিয়ে দিতে। যাতে সে তৈরী করে দিতে পারে।

কোনানের সঙ্গে [illegible]তেই ম্যানেজার জ্যাম্বুকে পাঠিয়ে দিল ঘরেতে। দোহারা মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। দাড়ি-গোঁফ কামান। বেশ গম্ভীর চালেই বলল, কোন্ দেশীয় খাবার

খেতে চান, বলুন।

ম্যানেজার যে ওকে কিছু না বলেই পাঠিয়েছে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। অগত্যা আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, খাঁটি ভারতীয় বা বাঙালীয়ও বলতে পার। কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর দম খেতে চাই—এই তার ফরমুলা। জ্যাম্বু আমার হাত থেকে খপ করে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে দুবার চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর মাথায় খোঁচা খোঁচা চুলগুলোর ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, ঠিক হ্যায় বানাদুঙ্গা।

জ্যাম্বু যে সত্যি সত্যিই একজন পাকা রাঁধিয়ে পরের দিন দুপুরেই তা প্রমাণিত হয়ে গেল। চোদ্দ গণ্ডা ফুলকো ফুলকো কড়াইশুঁটির কচুরি আর এক কাঁসি লঙ্কা গরগরে আলুরদম এনে আমাদের সামনে ধরে দিয়ে বলল, বহুৎ ঝামেলা সাহেব। এক একটা কৌচুরি উইথ আলুরদম ফিফটি রুপিজের মত খরচ পড়েছে।

কচুরির দাম শুনে কোনান বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেও, আমি হাসতে হাসতে বললাম, কুছ পরোয়া নেই। এ বিল আমিই দেব।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা দুজনে রওনা হয়ে গেলাম ইফেল টাওয়ারের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছলাম যখন সূর্য ডুবু ডুবু। কোনান আমার উদ্দেশ্যে বলল, মিঃ দ্যট্ ইফেল টাওয়ারের উচ্চতা তো নেহাত কম নয়। আপনি আবার উঠতে পারবেন তো?

কোনানের কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললাম, কোনান তুমি একজন বড় লেখকই নয়, সুরসিকও বটে। তুমি কি জান, হিমালয়ের উচ্চতম চুড়ো এভারেস্টে আমি একদিনে উঠে আবার নেমে এসেছিলাম। এভারেস্টের চেয়ে ইফেল টাওয়ার নিশ্চয়ই উঁচু নয়।

আমার জবাব শুনে কোনান আমার মুখের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল তারপর হাত কছলাতে কচলাতে বলল, আমার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করবেন মিঃ দ্যট্। না জেনে মন্তব্য করে ফেলেছি।

আমি হো-হো করে হাসতে হাসতে বললাম, 'আই নো।'

দুজনে ধীরে ধীরে ইফেল টাওয়ারের চুড়োয় উঠে, পছন্দসই একটা জায়গা নির্বাচন করে বসলাম। অত্যুৎসাহী কিছু লোক আশেপাশে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করলেও আমাদের কোনও অসুবিধে হল না। আমরা মনের আনন্দেই জোছ্নামাখা প্যারিস শহরের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে লাগলাম। রবিঠাকুরের একটা গানের লাইন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে, সবেমাত্র গুনগুন করে গানটা ধরেছি, হঠাৎ কোনান আমার পেটে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে বলল, মিঃ দ্যট্ অযথা আর বিলম্ব করে লাভ কি! ওলুর ডোম কৌচুরি শুরু করে দিলেই তো হ-য়।

প্যারিস শহর দেখতে দেখতে সত্যি আমি খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে

গিয়েছিলাম। কোনান মনে করিয়ে দিতে, আমি সোৎসাহে টিফিন-কেরিয়ারটা খুলে, কচুরি আর আলুরদম সমান ভাগে ভাগ করে নিলাম। তারপর কোনানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'ডিয়ার ফ্রেন্ড, লেট আস্ স্টার্ট'।

প্রথম কচুরিখানা কোনান খুব ভয়ে ভয়েই মুখে দিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল এবং 'নাইস্' বলে চিৎকার করে উঠে বাকি গুলো গবগব করে খেতে শুরু করল। কোনানের কাণ্ড দেখে আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে বললাম, আরে আরে করছ কি? এসব জিনিস রাক্ষসের মত ওরকম হাউ হাউ করে খায় না। ধীরে সুস্থেই খেতে হয়। তবেই তো স্বাদ পাওয়া যায়।

আমার কাছ থেকে সরাসরি বাধা পেয়ে কোনান এবার একটু লজ্জিতই হল। বলল, উঃ যা খে-তে!

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোনান আমার পথই অনুসরণ করল এবং আমার অনুকরণেই খেতে লাগল।

রাত বারোটা নাগাদ কোনান হঠাৎ ঘড়ি দেখে বলল, বেশ রাত্তির হয়েছে। চলুন এবার হোটেলে ফেরা যাক। চোর-ডাকাত ভেবে এখন পুলিশে ধরতে পারে।

ইফেল টাওয়ারের চুড়ো থেকে টর্চ জ্বেলে নামতে বেশ সময় নিল। অবশ্য পথঘাট নির্জন থাকার জন্য, আমরা দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলে গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখি মিঃ গামবিয়া হোটেল কর্মচারীদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন জটলা করছে। আমাদের বিলম্বই হয়তো বা এই জটলার কারণ, এই কথা ভেবে কিভাবে ম্যানেজারকে একখানা চমক দেব যখন চিন্তা করছি, হঠাৎ মিঃ গামবিয়া ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে কোনানকে বলল, ভীষণ বিপদ! আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। কাইন্ডলি আপনারা আমার চেম্বারে একবারটি আসুন।

ঘরে গিয়ে আমরা দুজনে দুটি চেয়ার দখল করতে, মিঃ গামবিয়া আবার সরব হল। বলল, আপনাদের কচুরি ও আলুরদম প্রস্তুতকারক জ্যাম্বু আপনারা বেরিয়ে যাবার পরেই, আমাদের হোটেলের অন্যতম অতিথি সুইডিশ প্রেসিডেন্ট হ্যারল্ড ছিনলের অ্যাটাচিকেশটা নিয়ে সরে পড়েছে। হ্যারল্ড ছিনলের এই অ্যাটাচিকেশে প্রায় নয় লক্ষ টাকা মূল্যের দুষ্প্রাপ্য হীরে মণি মুক্তো ছিল। হ্যারল্ড সাহেব পৃথিবী পর্যটন করে এইগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। এইগুলো চুরি যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। আমি অবশ্য হোটেলের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে, হ্যারল্ড সাহেবকে কথা দিয়েছি আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব জ্যাম্বুকে ধরবার জন্য।

কোনান মিঃ গামবিয়ার কথা শুনতে শুনতে খুব ঘাড় নাড়ছিল। সে তার কথা

শেষ করামাত্রই, বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, সবই তো শুনলাম কিন্তু তার জন্য আমি কি করতে পারি?

কোনানের প্রশ্ন শুনে মিঃ গামবিয়ার চোখ দুটো ট্যাপারির মত গোল গোল হয়ে উঠল। সিগারেট-কেসটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিন ধ-রা-ন—

আমি নির্বিকারচিত্তেই সিগারেট ধরালাম। কোনান সিগারেটটা দেশলাইয়ের বাক্সের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলল, কই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না তো?

মিঃ গামবিয়া নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। ঠোটের কোণা দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, জ্যাম্বুকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আমি ভেবে দেখলাম ওকে ধরার ব্যাপারে আপনার সাহায্যই একান্ত দরকার।

কোনান মোটামুটি আন্দাজ করেই রেখেছিল। মিঃ গামবিয়া অনুরোধ করতে. বেশ একটু গর্বের সুরে বলল, বই লেখা আমার জীবিকা। আমার গোয়েন্দা ওরফে শার্লক হোমস্ গল্পের বইতে চোর-ডাকাত টপাটপ ধরে ঠিকই, কিন্তু এরকম ছিঁচকে চুরি-ডাকাতি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। এসব ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নেওয়াই ভাল। পুলিশ এসব ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি পটু।

মিঃ গামবিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দেখুন আপনার সাহায্য চাইলেও পুলিশে আমি ঘটনাটা জানাতে ভুলি নি। কথাপ্রসঙ্গে যেইমাত্র শুনল আপনি স্বয়ং এই হোটেলে অবস্থান করছেন, ওরা বলল, স্বয়ং গোয়েন্দার রাজা আপনার হোটেলে রয়েছেন আর আপনি আমাদের সাহায্য চাইছেন! বলিহারি যাই আপনাকে আপনি এখুনি কোনান সাহেবকে চেপে ধরুন। উনি নির্ঘাত ধরে দেবেন অপরাধীকে। মিঃ গামবিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

মিঃ গামবিয়ার মুখ থেকে এ কথা শোনামাত্তরই কোনান হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, পুলিশ নেহাত বাজে কথা বলে নি। কিন্তু আমার সময়ের তো একটা মূল্য আছে। এইসব ছিঁচকে চোর-ছ্যাচড় ধরবার জন্য আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করি কি করে!

অপরাধী গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রথমে কোনান ঔদাসীন্য প্রকাশ করলেও, হঠাৎ কি ভেবে তার উৎসাহ বেড়ে গেল। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে ম্যানেজারকে বলল, মিঃ গামবিয়া আমি আপনার কেস টেক্ আপ্ করলাম। কথা দিচ্ছি সাতদিনের মধ্যে অপরাধীকে ধরে দেব। তবে আমাকে জনপাঁচেক সহকারী আর হাজার দশেক টাকা এখুনি দিতে হবে। ছোটাছুটি করতে একটা পকেট খরচ আছে তো।

মিঃ গামবিয়া কোনানের আরজি শুনে গাঁইগুঁই করতে লাগল। কিন্তু নিজের মুখে প্রস্তাব করার জন্য এড়িয়ে যেতে পারল না।

সহকারীদের নিয়ে কোনান একটা গোপন মিটিং ডাকল। মোটামুটি চুরির পদ্ধতি

:বং চোরের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে, লেগে গেল :দন্তের কাজে।

কোনান তার সহকারীদের নিয়ে ঢুকল জ্যাম্বুর ঘরে। জ্যাম্বু বাবুর্চির কাজ করলেও ভতর ভেতর যে খুবই সৌখিন ছিল, সেটা ধরা পড়ল তার ব্যবহৃত টুকিটাকি জনিসপত্রে। বেডকভার থেকে শুরু করে, ঘরের ক্যালেন্ডার পর্যন্ত সর্বত্রই বেশ একটা চির ছাপ।

সেল্‌ফে দেশ-বিদেশের পাক-প্রণালীর বই ছাড়াও, বিখ্যাত লেখকদের গল্পের বইও ল্প বিস্তর সাজান ছিল। তাছাড়াও নিয়মিত সে যে ফ্রেঞ্চ অবজারভার পড়ত, জড় রা কাগজপত্তর থেকেই তা প্রামাণিত হল। এছাড়াও ছিল স্নো, পাউডার, ক্রীম ইত্যাদি সৌখিন প্রসাধনের জিনিসপত্তর।

সহকারীদের সাহায্যে কোনান সব জিনিসপত্তর গোরুখোঁজা খুঁজল বটে কিন্তু :কখানা ঠিকানাবিহীন চিঠি ছাড়া আর সে কিছুই পেল না। ঠিকানাবিহীন চিঠি হলেও, কানান হতাশ হল না। চিঠিখানা ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে মিঃ গামবিয়াকে বলল, ধরে নিন আপনার তিন-চতুর্থাংশ কিনারা হয়ে গিয়েছে। এখন মার মাত্র এক-চতুর্থাংশ বাকি। অর্থাৎ অপরাধীকে হাতে নাতে ধরে আপনার হাতে ুলে দেওয়া। কোনান এমন বুক ঠুকে কথাগুলো বলল মিঃ গামবিয়াকে, মনে হল ুঝি দশমিনিটের মধ্যেই অপরাধীকে তুলে নিয়ে এসে শুইয়ে দেবে মিঃ গামবিয়ার :কালে।

চিঠিটা হস্তগত করে কোনান মাইক্রোসকোপে নানাভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিল। চিঠিটা প্যারিসেরই কাছাকাছি একটি বড় গ্রাম থেকে লেখা। গ্রামর ছাপটা অস্পষ্ট থাকার দরুন, কোনান পোস্ট অফিসের সাহায্য নিয়ে নামটা ভাল করে যাচাই করে নিল। তারপর আর সময় নষ্ট না করে রওনা হয়ে গেল সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে। যাবার মুহূর্তে সহকারীদের পাঠিয়ে দিল প্যারিসের রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে। তার যাতায়াতের ওপর নজর রাখার জন্য। তাছাড়াও প্যারিস শহরের বিশিষ্ট রত্ন-ব্যবসায়ীদের ফোনে জানিয়ে দিল, এই ধরনের মূল্যবান রত্নরাজি কেউ বিক্রি করতে এলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটকে রাখা হয়।

যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে কোনান যথাসময়েই পৌঁছল সেই গ্রামে। তবে যতটা সোজা ভেবে গেছিল ততটা সোজা হল না। চিঠি দেখে কেউই তার মালিকের হদিস দিতে পারল না।

সারা সকাল এভাবে টইটই করে ঘুরেও কোনান তার খোঁজ পেল না। শেষ পর্যন্ত লাঞ্চটা সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার তাগিদে ঢুকল স্থানীয় একটা হোটেলে। হোটেলটা অভিজাতের মধ্যে পড়ে না। নেহাতই গ্রাম্য এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরই সেখানে আনাগোনা বেশি।

কোনানও সেটা চেয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে সে হোটেলেরই এক গোপ আড্ডায় ভিড়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। পয়সার বিনিময়ে সেখানে জোর জুয়াখেল চলছিল।

পর পর তিনবার জিতলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনান ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল তাদে মধ্যে।

কোনান সেই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। নিরীহ স্বভাবের ম্যাডস্টোন্ নামে ে তরুণটি তার পাশে বসে একটু বেশি রকমের হৈচৈ করছিল, কোনান তাকেই দেখাল চিঠিটা।

ম্যাডস্টোন্ হ্যাঁ অথবা না কিছুই বলল না। সিগারেট কেনবার অছিলায় সে বেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘর থেকে। তারপর বেশ নির্বিকার ভাবেই আবার সে তার আসন দখল করল।

আড্ডায় তেমন কিছু সুবিধে হচ্ছে না দেখে কোনান ফিরে গেল হোটেলে। ঘরেতে ফিরে এসে নকল গোঁফ দাড়ি প্যান্ট ইত্যাদি সবকিছু খুলে রেখে শুয়ে পড়ল বিছানায়। শুয়ে একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তার খেয়ালই রইল না।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ দারোয়ানের হৈচৈ শুনে। কোনান লাফিয়ে উঠে দেখল তার জামা-কাপড় ও জিনিসপত্তর কিছুই নেই। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে আঁকশির সাহায্যে কে বা কারা সব নিয়ে চলে গিয়েছে। সম্বল বলতে এখন হাতকাটা গেঞ্জিটা আর একটা আন্ডারওয়ার।

এমন অসহায় অবস্থায় সে কোনদিনও পড়ে নি। হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে টাকা নয় ধার নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু জামাপ্যান্ট মিলবে কোথায়! দোকান থেকে কিনতে গেলেও তো তাকে বাজারে যেতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে কোনান শেষ পর্যন্ত প্যারিসে ফেরারই সিদ্ধান্ত নিল। তারপর একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে, চুপি চুপি উঠে চেপে বসল।

আমি কফি খেতে খেতে লনে পায়চারি করছি হঠাৎ ট্যাক্সিটা গেটের মধ্যে হোটেলের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করে দাঁড়াল হোটেলের সামনে।

আমার সঙ্গে কোনানের চোখাচোখি হতেই সে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল যেন আমাকে চেনেই না। কোনানের আকস্মিক এইরূপ আচরণে আমি বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারলাম না। সে আমাকে অকারণে এড়িয়ে যেতে চাইছে দেখে আমি আর ওকে ঘাটালাম না। নিজের মনেই আবার পায়চারি করতে শুরু করলাম। তবে ট্যাক্সি থেকে নামবার মুহূর্তে তার পোশাকের দৈন্যতা আমার দৃষ্টি এড়াল না। মনে মনে ভাবতে লাগলাম এর কিই বা কারণ থাকতে পারে?

কোনান যাদের এদিক ওদিক পাঠিয়েছিল, তারা সকলেই একে একে ফিরে এল।

এভাবে সে ব্যর্থ হবে কোনান বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সিগারেট ছেড়ে তাই সে চুরোট ধরল এবং অবিরাম ধূমপান করতে লাগল। নতুন কোনও ফন্দি বের করতে কোনান যখন ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় একখানা চিঠি এসে পৌঁছল ডাকে। চিঠিখানা জ্যাম্বুর লেখা। লিখেছে—

ডিয়ার মিঃ কোনান,

গোয়েন্দা কাহিনী লেখক হিসেবে আপনি বিশ্ববিখ্যাত হলেও, গোয়েন্দাগিরির যে আপনি এ. বি. সিও জানেন না, ছদ্মবেশে আমাকে ধরতে আসা দেখেই তা প্রমাণিত হল। সেদিন হোটেলে উঠে আপনি যাদের কাছে আমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করছিলেন, তাদের মধ্যে আমার একজন চর ছিল আপনি বোধ হয় জানতেন না। যার জন্য আপনার আবির্ভাবের খরব আমার কানে পৌঁছতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়নি।

এযাত্রা আপনাকে আন্ডারওয়ার ও গেঞ্জি পরিয়েই ছেড়ে দিলাম। এর পরেও যদি দেখি আপনি আমাকে ধরবার চেষ্টা করছেন, প্রাণে হয়তো বা মারব না কিন্তু মাথা কামিয়ে মুখে আলকাতরা মাখার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

সবশেষে আপনার শুভবুদ্ধি কামনা করি। ইতি— জ্যাম্বু।

· চিঠি পাবার পর থেকেই কোনানের উৎসাহ ঝিমিয়ে গেল। একদিন চুপি চুপি ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে বলল, মিঃ গামবিয়া আমার একজন পুস্তক-প্রকাশক জরুরী প্রয়োজনে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমার আর একমিনিটও এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এখুনি আমায় যেতে হবে। আপনি পুলিশের হাতেই এই তদন্তের ভার দিন। আমার মনে হয় পুলিশ একটু চেষ্টা করলেই এই অপরাধীকে ধরতে পারবে।

কোনান যে হঠাৎ এভাবে পালিয়ে যাবে মিঃ গামবিয়া স্বপ্নেও তা ভাবতে পারে নি। কোনানকে সে আর কয়েকদিন থাকবার অনুরোধ করলেও, কোনান তা রাখল না। পরের দিন রাত ভোরেই সে অন্তর্ধান হয়ে গেল প্যারিসের হোটেল থেকে।

মিঃ গামবিয়া পরের দিন তার চেম্বারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, মিঃ কোনান ডয়েল যে এভাবে আমাকে পথে বসিয়ে চলে যাবেন আমি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এখন পুলিশের শরণাপন্ন হতে গেলে, পুলিশ কি আর উৎসাহ দেখাবে! মিঃ গামবিয়া বেশ একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন এবং নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন।

এই মুহূর্তে আর কি করা সম্ভব ভাবছি, হঠাৎ মিঃ গামবিয়ার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। আমার উদ্দেশ্যে বলল, মিঃ দ্যট্ আপনি পেশাদার গোয়েন্দা নন ঠিকই, কিন্তু আপনার যা আসাধারণ প্রতিভা, আমার মন বলছে আপনি একটু চেষ্টা করলেই

এ ব্যাপারে অমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আপনি কাইন্ডলি আমার প্রস্তাবটা একটু বিবেচনা করে দেখুন না কেন।

মিঃ গামবিয়া হেসে বলল, দেখুনই না চেষ্টাকরে। না পারলে আর কি হবে। ডুবতে তো বসেইছি, না হয় ভরাডুবিই হবে।

এবার আমি সিরিয়াস্ হয়ে গেলাম। বললাম লম্বমান দত্তের অভিধানে 'অক্ষম' বলে কোনও শব্দের স্থান নেই, চেষ্টা করতে পারি।

মিঃ গামবিয়া বলল, আপনার কাছ থেকে ওই আশ্বাসটুকুই যথেষ্ট।

মিঃ গামাবিয়ার অনুরোধ শুনে আমি মৃদু হেসে বললাম, গোয়েন্দাগিরির আমি 'গ' -ও জানি না। এই অন্তিম মুহূর্তে এই গুরু দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া কি আমার উচিত হবে?

মিঃ গামবিয়া আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল বটে কিন্তু আমার আর দুর্ভাবনার শেষ রইল না। ঘাড় বাড়িয়েছি যখন, যেমন করেই হোক মুখ রক্ষা করতেই হবে।

বিলম্বও যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সেদিন রাত থেকেই তদন্তের কাজ শুরু করে দিলাম।

জ্যাম্বুর ঘরখানা মোটামুটি দেখা থাকলেও, ব্যক্তিগত কৌতূহলে আবার ওর ঘরে ঢুকলাম। তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে আবার দৈনিব ফ্রেঞ্চ অবজারভার কাগজগুলোর ওপর চোখ পড়ল। কাগজগুলো টেনে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলোতে শুরু করলাম। বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠার এক জায়গায় হঠাৎ চোখ পড়াতে কাগজখানা নিয়ে এলাম আমার ঘরেতে।

পরের দিন সকালে একে একে ফোন করতে লাগলাম প্যারিসের বড় বড় জহরত ব্যবসায়ীদের। সকলেই বলল, মিঃ কোনান ডয়েল তো আমদের জানিয়েই রেখেছেন এখনও পর্যন্ত কেউ আসে নি। এলেই গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা তৈরী হয়েই বসে আছি।

জহরত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাবার পরেই আমি রওনা হয়ে গেলাম আমারই পরম ভক্ত ও বন্ধু চৈতন্য সেনের বাড়ির উদ্দেশ্যে। চৈতন্য আমাদের হোটেল থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে যে নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠেছে সেখানেই এক সরকারী কোয়ার্টারে থাকে। মোটরে গেলেও তা প্রায় দুঘন্টার মত সময় লাগল সেখানে পৌঁছতে।

আমি যে প্যারিসে এসেছি চৈতন্য জানতই না। হঠাৎ আমাকে দেখে, চৈতন্য বেশ কিছুটা অবাকই হয়ে গেল। আমার মুখের দিকে একমিনিট অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, কী ব্যাপার? একি স্বপ্ন না সত্য!

আমি ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে গরম এক পেয়ালা কফি খাওয়া দিকি নি। প্যারিস থেকে মোটরে আসছি। ঝাঁকুনিতে দেহের জয়েন্টগুলো মচমচ করছে।

মিসেস্ চৈতন্য ওরফে বুলবুলি ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। দুধের বোতল ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলল, বাব্বা! আজ আমাদের কি সৌভাগ্য! সকালে ঘুম থেকে উঠে কার মুখ দেখেছিলাম কে জানে। কফির সঙ্গে আর কি খাবেন বলুন—

আমি বললাম, ব্যস্ত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপাততঃ এক কাপ কফি পেলেই খুব খুশি হব। পরে একদিন কব্জি ডুবিয়ে ভেড়ার মাংস খেয়ে যাব।

আমার মত পেটুক লোকের মুখে একথা শুনে চৈতন্য খুবই আশ্চর্য হল। আমার কানে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার বল তো?

আমি চৈতন্যকে সব ঘটনাটা ব্যক্ত করে বললাম, এ ব্যাপারে তোর কিছু সাহায্য চাই। যদি অনুমতি করিস তো বলি।

চৈতন্য হাঁ-হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, এতে আর অনুমতি দেওয়ার কি আছে। বল না কি করতে হবে—

আমি বললাম দৈনিক ফ্রেঞ্চ অবজারভার পত্রিকায় তোর ঠিকানায় একটা বিজ্ঞাপন দেব। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা হবে মোটামুটি এইরকম ঃ

'বাঙালী পরিবার আয়োজিত এক গার্ডেন পার্টিতে মুখরোচক কোনও খাবার প্রস্তুত করার মত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন পাচক চাই। পারিশ্রমিক ফ্রাঁ-এর হিসাবে পাঁচশো টাকার মত। অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনে পরীক্ষা দেবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। বুলবুলি সেন ইত্যাদি ইত্যাদি।'

সাক্ষাৎপ্রার্থী যারা আসবে বুলবুলিই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। আমি কেবল আড়াল থেকে দেখব জ্যাম্বু এসেছে কিনা।

আমার পরিকল্পনা শুনে চৈতন্য বলল, আমার কোনও আপত্তি নেই।

ফ্রেঞ্চ অবজারভার পত্রিকায় যেদিন বিজ্ঞাপন বেরুল, সেদিনই আমি গিয়ে হাজির হলাম চৈতন্যের কোয়ার্টারে এবং সেই সুবর্ণ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পরের দিন সকাল ছটা নাগাদ লালজান নামে এক বাবুর্চি এসে হাজির হল প্রথম। সে বলল আমি খুব ভাল পটলের দোর্মা বানাতে পারি। একবার খেলে এ জীবনে আর ভুলতে পারবেন না।

বুলবুলি তার নামধাম শুনে নিয়ে বলল, নামধাম লিখে রেখে যাও, প্রয়োজন মত জানাব।

লালজান আসার পর আরও সাতজন এল। কেউ বলল, আলু-পোস্ত—কেউ বলল, মোচার ঘণ্ট— কেউ বলল, চিংড়ি মাছের মালাইকারি ইত্যাদি ইত্যাদি। বুলবুলি অবশ্য সকলকে একই জবাব দিল।

দেখতে দেখতে সারাদিনটাই কেটে গেল কিন্তু আসল লোকের আর পাত্তা নেই। পরের দিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল।

দরজা খুলতেই একমুখ দাড়ি ও গোঁফ নিয়ে যার মুখ দেখা গেল সে আর কেউই নয় আমাদের বহু প্রত্যাশিত জ্যাম্বু। বুলবুলি জ্যাম্বুকে ঘরে এনে বসাল। কথাপ্রসঙ্গে জ্যাম্বু বলল, বাঙলার অন্যতম জনপ্রিয় জলখাবার আলুর ডোম কৌচুরি আমি তৈরী করতে পারি। আমায় একবার সুযোগ দিয়ে দেখতে পারেন।

কচুরি আলুর দমের নাম শুনে বুলবুলির আর চিনতে অসুবিধে হল না লোকটিকে। হেসে বলল, আমিও এই ধরনের খাবারের কথাই ভাবছিলাম। তুমি তাহলে কাল এস। কি কি জিনিস কতখানি লাগবে তার একটা ফর্দ দিয়ে যেও।

জ্যাম্বু ঘাড় নেড়ে বিদায় নিতে আমরা তিনজনে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম।

পরের দিন যথাসময়েই জ্যাম্বু এসে হাজির হল। আমি পুলিশে আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলাম। জ্যাম্বু এসে ঘরে জাঁকিয়ে বসামাত্রই বাড়ির চারপাশে পুলিশ দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখামাত্রই ভূত দেখার মতই জ্যাম্বু চমকে উঠল এবং পালাবার জন্য এদিক সেদিক তাকাতে লাগল।

আমি বেশ বোকা সেজেই বললাম, আরে জ্যাম্বু যে কি ব্যাপার, এখানে হঠাৎ!

এবার জ্যাম্বুর কুতকুতে চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলে উঠল।

আমি হেসে বললাম তোমায় আলুর ডোম কৌচুরি খাওয়াতে হবে না। আমিই তোমায় খাওয়াব। ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে, এখন খালি—

তার মানে? জ্যাম্বু উঠে দাঁড়ালে তারপর হঠাৎ দৌড়ে পালাতে গেল দরজা দিয়ে।

কিন্তু—, লম্বুদা হা-হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন, কিছুই লাভ হল না। জ্যাম্বুর কোমরে দড়ি পড়ল।

লম্বুদা এখানেই তার কাহিনীর ইতি টানতে চাইলেও, বাস্তব রেহাই দিল না। বলল, লম্বুদা জ্যাম্বুকে ধরার জন্য আপনি যে কৌশল করেছিলেন তার তুলনা হয় না। কিন্তু কোন্ যুক্তিতে আপনি এইভাবে জ্যাম্বুকে ধরতে পারবেন আশা করে ছিলেন, সেটা দয়া করে আমাদের এখন বলবেন কি? অবশ্য বলায় যদি কোনরকম আপত্তি না থাকে—

আ-প-ত্তি, আপত্তি কিসের ? লম্বুদা তার পূর্বের হাসির রেশ টানতে টানতে বললেন, জ্যাম্বুর ঘরে ঢুকে ফ্রেঞ্চ অবজারভার কাগজ হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ল, বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় বাবুর্চির জন্য যেখানে যত বিজ্ঞাপন রয়েছে সবগুলোই সে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ আরও বড় বড় হোটেলে চাকরি সংগ্রহের জন্যেই যে জ্যাম্বু নিয়মিত ফ্রেঞ্চ অবজারভার কাগজ কিনত এবং পড়ত সেটা আমার কাছে বেশ পরিষ্কারই হয়ে গিয়েছিল।

শুধু তাই-ই নয় মিঃ গামবিয়ার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আমি এও জেনেছিলাম, ফ্রেঞ্চ অবজারভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখেই সে এখানে এসেছিল।

জ্যাম্বু টাকাকড়ি চুরি করে নিয়ে গেলে হয়তো বা এত তাড়াতাড়ি তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হত না। কারণ তার চাকরিতে ঝোঁক থাকত কম। কিন্তু যেহেতু সে মূল্যবান হীরেজহরত চুরি করেছিল এবং ভয়ে কোনও স্বর্ণব্যবসায়ীর কাছে টপ করে যেতে পারে নি, স্বভাবতঃই তাকে পেট চালাবার জন্য চাকরির কথা ভাবতে হচ্ছিল।

আমি তার অসুবিধের কথা মোটামুটি অনুমান করেই এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফাঁদ পেতে ছিলাম। আমার চাতুরি সে ধরতে না পেরে একবেলায় পাঁচশো টাকা রোজগারের লোভে পা বাড়িয়ে ছিল ওখানে। এবং এখনও সে জেল খাটছে বলে লম্বুদা আড়চোখে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বললাম, লম্বুদা আপনার মাথাটা ছেঁদা করে মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে ভেতরে কি বস্তু আছে !

লম্বুদা আমার কথা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দেখাতে গেলেও ফাটাতে হবে। যা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

তাছাড়াও ব্রিটিশ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে মৃত্যুর পর আমার আস্ত মাথাটা দেবার ব্যাপারে একটা চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। অবশ্য পরিবর্তে তারা দশহাজার পাউন্ড দিতে রাজী হয়েছে বলে লম্বুদা ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকতে লাগলেন।

পূর্ণেন্দু এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ মাটি থেকে কুঁজোটা তুলে নিয়ে, ঢকঢক করে জল খেতে শুরু করল।

---

# সোনার হার

ধুতি পাঞ্জাবি পরতে আমরা কোনদিনও দেখি নি লম্বুদাকে। হাফসার্ট আর প্যান্টই ছিল তাঁর প্রিয় পোশাক। সেদিন হঠাৎ কোচান ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি এবং হাতে একটা গোলাপফুল নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

লম্বুদা চোখ বুজে গোলাপফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর আড়চোখে আমাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে বললেন, নেহরু গোলাপের গন্ধই আলাদা। দেখতে দেখতে কুড়ি বছর কেটে গেল তো, কিন্তু ফুলের চেহারা বা গন্ধ দেখে বোঝবার উপায় নেই। মনে হচ্ছে ঠিক যেন দশ মিনিট আগে ফুটেছে।

গোলাপটা দেখে অবশ্য আমাদের প্লাস্টিকের ফুল বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সেটা তখুনি পরখ করার কোনও সুযোগ ছিল না, আমরা লম্বুদার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বললাম, কুড়ি বছর আগে ফোটা ফুল এখনও এত তাজা থাকতে পারে নাকি? বাপের জন্মে এমন কথা তো কখনও শুনি নি।

লম্বুদা মুখিয়েই ছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, শুনবে কি করে? ফ্রিজ কেনার সৌভাগ্য কি সকলের হয়, বিশেষ করে সেই যুগে!

ফ্রিজের সঙ্গে গোলাপের কি সম্বন্ধ আমাদের কারুরই বোধগম্য হল না ফলে আমরা বেশ একটু বোকাই বনে গেলাম। লম্বুদা সেটা লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে বললেন, ভারতের পূর্বতন গভর্নর-জেনারেল লর্ডমাউন্টব্যাটেনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় আমি একটা ছোটখাট রকমের গোয়েন্দাগিরি করে পণ্ডিত নেহরুর কাছ থেকে এই গোলাপফুলটা উপহার পেয়েছিলাম। নেহরু তাঁর বুক থেকে গোলাপটা খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, লম্বমান তুমি আজ শুধু আমার নয় ভারতবাসীর মুখরক্ষা করেছ। পুরস্কার দিয়ে তোমায় আমি ছোট করতে চাই না। আমার বুকের গোলাপ তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমার এই প্রীতি-উপহার তোমার এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের রাজসাক্ষী হয়ে থাকুক।

আমার অবশ্য কোনই অসুবিধে হল না। লন্ডনে ফ্রিজ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ রিচার্ড বাইসনকে ট্রাঙ্ককলে বললাম, আমার এখুনি একটা বেষ্ট কোয়ালিটির ফ্রিজ দরকার। টাকার জন্য কুছ পরোয়া নেই—'অ্যাট্ এনি কস্ট!' পাঠিয়ে দাও।

মিঃ বাইসন পরের দিনই প্লেনে আমায় একটা ফ্রিজ পাঠিয়ে দিয়ে লিখল, ডিয়ার লাম্বু, পৃথিবীতে টাকাটাই বড় নয়। তোমাকে আমি ফ্রিজ দেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব। আশা করি উপহার হিসেবেই এটা তুমি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবে।

মিঃ বাইসনের পাগলামি দেখে আমি মনে মনে হাসলাম। অবশ্য ফ্রিজটা যে শুধু বেস্টনয় দি বেস্ট কোয়ালিটির ছিল, সেটা এই ফুলের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে। লম্বুদা গোলাপফুলটা নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘ্রাণ নিতে নিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

গোলাপফুলটা যে লম্বুদার কীর্তিরই সাক্ষ্য এখন আর বুঝতে আমাদের কোনই অসুবিধে রইল না। আমরা যখন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাউই করছি, হঠাৎ পূর্ণেন্দু সরব হল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বলল, লম্বুদা এমন কি বীরত্ব আপনি দেখিয়েছিলেন যে নেহরু জামা থেকে গোলাপ খুলে আপনাকে উপহার দিয়েছিলেন!

লম্বুদা পূর্ণেন্দুর প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে ফুলটা বুক পকেটে সযত্নে রাখলেন তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে একটা কাঁচি সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় যখন ঘর আচ্ছন্ন, লম্বুদা ভ্রূকুঁচকে বললেন, বীরত্বের কাহিনীটা বলতে আমার কোনরকম বাধা নেই। কিন্তু তোমাদের আবার সকলের ধৈর্য থাকবে তো আগে সেটা ভেবে দেখ—

আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না। বললাম, আপনার কীর্তি শোনার মত ধৈর্য নেই এমন লোক বোধ হয় এখনও পৃথিবীতে জন্মায় নি। আপনি নিশ্চিন্ত মনেই শুরু করতে পারেন।

'বটে' বলে লম্বুদা নড়েচড়ে চেয়ারে বসলেন। ফুলটা আবার পকেট থেকে বের করে নাকের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, ভারত যখন স্বাধীন হল তখন আমি টপ ফর্মে। অর্থাৎ বাড়ির দেওয়ালে আর মেডেল ঝোলানোর জায়গা নেই। এইসময় একদিন দুপুরবেলা ট্রাঙ্ককল এল দিল্লী থেকে। ভারত-সরকারের মন্ত্রণালয়ের চিফ্ সেক্রেটারী আনন্দ সিং বলল, মিঃ দ্যট্, আপনি বোধ হয় জানেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন আগামী সপ্তাহে ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে লর্ডকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছি। এই সভায় ভারতের বিশিষ্ট লোকেরাই উপস্থিত থাকবেন। যাঁদের আমরা এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি তার মধ্যে আপনিও আছেন।

আমার প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে লর্ডের অকৃপণ সহানুভূতি ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করে আমি আর না বলতে পারলাম না; বললাম, 'অল্‌রাইট, মিঃ সিং আই ডু অ্যাকসেপ্ট' অর্থাৎ কিনা আমি সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

লম্বুদা নড়েচড়ে বসলেন এবং পকেট থেকে আর একটি সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। অন্যান্য সময়ে লম্বুদা সিগারেট ধরিয়ে একবার টানার পর অন্ততঃ দেড় মিনিট দুমিনিট সময় দিতেন, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম সিগারেট ধরিয়ে মিনিটে একষট্টি বার টানতে। যার ফলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল এবং ধোঁয়ার মাঝে লম্বুদাকে ঝাপসা দেখাতে লাগল।

লম্বুদার চোখের উজ্জ্বল মণি দুটো ছাড়া যখন আর কিছুই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, লম্বুদা মুখে 'চি-ড়ি-ক' করে একটা শব্দ করলেন তারপর হাই তুলে আঙুল মটকাতে মটকাতে বললেন, দিল্লী পৌঁছতে আমার অবশ্য কোনই অসুবিধে হ'ল না। বাংলার

গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রী বিধানদাকে নিয়ে যে বিমানখানা দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হল, তার মধ্যেই আমি জায়গা পেয়ে গেলাম।

বিধানদার পাশেই আমার সীট ছিল। বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ তিনি সজোরে আমার পিঠে একখানা বিরাশি কিলো ওজনের থাপ্পড় কষিয়ে বললেন, তোমরাই বাঙলার ভবিষ্যৎ। তোমাদের ওপরেই দেশের উত্থান-পতন নির্ভর করছে। উঠে পড়ে লাগ—ঘরে ঘরে স্পোর্টস্‌ম্যান্ গড়ে তোল— বাঙলাকে বাঁচাও।

বিধানদার কথা শুনে গর্বেতে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি বললাম, 'ডোন্ট ওরি বিধানদা', আমি আপনার অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করব।

বিধানদা খুশিই হয়েছিলেন। আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'আই নো দ্যাট্ লম্বু। গড্ ব্লেস্ ইউ।'

প্লেন যখন পালাম এয়ারপোর্টে পৌঁছল তখন সূর্য ডুবুডুবু করছে। আমি যে ওই প্লেনেই দিল্লী যাচ্ছি ইতিমধ্যেই সে খবর রটে গিয়েছিল আমার ভক্তদের মধ্যে। এয়ারপোর্টে নামতে দেখি গিজগিজ করছে ছেলেমেয়ে।

আমি ছিলাম সবার শেষে। আমি ভেতর থেকে বেরুতেই 'লঙ লিভ লম্বমান' 'লঙ লিভ লম্বমান' বলে জনতা চিৎকার করতে লাগল। আমি দুহাত নেড়ে তাদের অভ্যর্থনার জবাব দিতে লাগলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে এলাম দিল্লীর পয়লা নম্বর হোটেল 'জনপথ'এ। ঘর আগে থাকতেই রিজার্ভ করা ছিল। কোনই অসুবিধে হল না। হোটেলে উঠে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শরীরখানা চাঙ্গা করে নিলাম। তারপর সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দিল্লী শহর চক্কর মারতে।

যতটা নিশ্চিন্তমনে ঘুরব ভেবেছিলাম তা হল না। পথে যারই সঙ্গে দেখা হতে লাগল সবার মুখেই এক কথা। কী ব্যাপার!

আমি অবশ্য বিশেষ কাউকেই আমল দিলাম না। হাসতে হাসতে বললাম— 'আর্জেন্ট বিজনেস্।'

গিলে মারা পাঞ্জাবি, কোচান ধুতি আর জরীর কাজ করা নাগরা পরে, যথাসময়েই আমি হাজির হলাম রাষ্ট্রপতি ভবনে। প্রবেশ-পথে ভীষণ রকম কড়াকড়ি। ভি. আই. পি.-রা সবাই কার্ড দেখিয়ে একে একে ঢুকছে রাষ্ট্রপতি ভবনে।

পঞ্চম সারিতে আমার বসবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা আমায় টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে প্রথম সারিতে বসিয়ে দিল। বলল, পঞ্চম সারিতে বসা কি আপনার শোভা পায়? ভি. আই. পি.-দের চেয়ে আপনি কম কিসে!

দেখতে দেখতে সব চেয়ার ভরে গেল। নিমন্ত্রিতদের আসন ভরে যেতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এসে মঞ্চে বসলেন।

যথারীতি অনুষ্ঠান শুরু হল স্বাধীনতা ও ইংরেজ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তারা আবেগজড়িত কণ্ঠে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে লাগল। প্রায় দুঘন্টা ধরে অনুষ্ঠান চলার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হল। এবার ভুরিভোজের পালা। বেশ জব্বরই খাওয়াদাওয়ার

ব্যবস্থা হয়েছিল।

বিভিন্ন ঘরেতে বিভিন্ন রকমের খাবারের ব্যবস্থা থাকায়, অতিথিরা ছড়িয়ে পড়ল তাদের পছন্দসই জায়গায়। আমি চিরকালই ঝালের ভক্ত। গরগরে লঙ্কা ছাড়া আমার কোন ব্যঞ্জনই মুখে রোচে না। খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত তাই সাত নম্বর ঘরেই ঢুকলাম।

ঘরের মধ্যে মাত্র কয়েক পা এগুতেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী চন্দ্রি আল্‌লুনাথমের সঙ্গে দেখা হল। আল্‌লুনাথম আমাকে দেখে বেশ আশ্চর্যই হয়ে বলল, কী ব্যাপার, তুমি এখানে যে বড়! এ তো 'ফর্ মাদ্রাজী পিপল্।'

বেশ একটু অবাক হয়েই আমি বললাম, কেন?

সে মুচকি হেসে বলল, রান্নাবান্নার চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে না! আমি তো বাইরে থেকে লঙ্কার গন্ধ পেয়ে এলাম। তোমরা বেঙলীরা তো এত লঙ্কা খাও না। এ রান্না খেলে নির্ঘাত ঝালে তোমার জিব খসে যাবে। চন্দ্রি আল্‌লুনাথমের কথা শুনে আমার হাসি পেল। আমি বললাম কথায় কি প্রয়োজন? কাজেই দেখা যাক না জিব খসে যায় কিনা!

চন্দ্রি আল্‌লুনাথম এমনভাবে মুচকি হাসল, স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল এর জন্য পরে আমার আপসোসের সীমা থাকবে না।

সামনের টেবিলটাই খালি ছিল। আমরা দুজনে দুটো চেয়ার দখল করলাম এবং ফ্রায়েড্ রাইস্ সহ চিকেন-কারীর ফরমাস দিলাম। বয় দুজনকে দুপ্লেট লাল লঙ্কা গরগরে চিকেন-কারী ও ফ্রায়েড্ রাইস্ দিয়ে গেল। চন্দ্রি আল্‌লুনাথম প্লেটের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে, আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন মাংস আর খাবার প্রয়োজন হবে না। রঙ দেখেই আমার করোনারী থ্রম্বসিস্ হয়ে যাবে!

চন্দ্রি আল্‌লুনাথম আমাকে চমকে দেবার জন্যই গোগ্রাসে মাংস খাওয়া শুরু করল। অবশ্য গোড়াতে যেভাবে সপসপ করে খাওয়া শুরু করেছিল, ক্রমশঃ তা মন্থর হয়ে আসতে সে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আমি নিজের মনে হাসতে হাসতে কাঁচালঙ্কার জুসের বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম এবং ছিপি খুলে বেশ খানিকটা ঢেলে দিলাম ফ্রায়েড্ রাইসের ওপর। তারপর মাংস সহযোগে ফ্রায়েড্ রাইস্ খেতে লাগলাম সপসপ করে।

চন্দ্রি আল্‌লুনাথম অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও সবকিছুই লক্ষ্য করছিল। নিজের খাওয়া ফেলে সে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ 'একমিনিট' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খেতে খেতে হঠাৎ তার এভাবে বেরিয়ে যাবার পক্ষে আমি কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। আমি অবশ্য আমার কাজ সমানেই চালিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে চন্দ্রি আল্‌লুনাথম যখন ফিরে এল ঘরেতে, আমার খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

চন্দ্রি আল্‌লুনাথম আবার পূর্বের মতই সোৎসাহে খেতে শুরু করল বটে কিন্তু সাময়িক। দুমিনিট খাবার পরেই আমার চোখে ধুলো দিয়ে, সে নিজের চোখের কোণায়

জমে-ওঠা জল মোছবার চেষ্টা করল।

চোখের জল মুছে কি আর কূল পাওয়া যায়! আমি চন্দ্রি আল্লুনাথমকে এ চ্যালেঞ্জ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য বলব কিনা ভাবচি হঠাৎ সে এক কাণ্ড করে বসল। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁচালঙ্কার জুসের বোতলাটা খুলল এবং সবটুকু ঢেলে দিল মাংসের মধ্যে।

আমি হাসি চেপে তা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম।

লঙ্কার জুস মিশিয়ে চন্দ্রি আল্লুনাথম গুনগুন করে এক লাইন তেলেগু গান ধরল। কাঁটা চামচ দিয়ে একখণ্ড মাংস মুখে দিয়েই হঠাৎ তার গান থেমে গেল এবং 'ইংগলে পিন্ডু' বলে কি একটা শব্দ উচ্চারণ করে গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার খাওয়া শেষ হতেও আমি বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করলাম তার জন্য কিন্তু সে আর ফিরে এল না। আমাকে এড়াবার জন্য সে আশেপাশে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে আমার বুঝতে অসুবিধে হল না।

লম্বুদা খুশ মেজাজে সিগারেটে পর পর কটি সুখটান মেরে মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, বাইরে এসে দাঁড়াতে লক্ষ্য করলাম—কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কোনও গোপনীয় খবর নিয়ে আলোচনা করছে।

ব্যক্তিগত ব্যাপার ভেবে আমি প্রথমে তেমন আমল দিলাম না। নিশ্চিন্তমনেই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর সহকারী সর্দার কোঁদল সিং সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে মৃদু হেসে দাঁড়িয়ে গেল। একথা সেকথার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, একটা কেচ্ছাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে শুনেছেন নাকি? লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেন দুজনেই খুব অস্বস্তি বোধ করছেন এই ঘটনায়।

সেরকম কিছু আমার সন্দেহ হয়েছিল। কোঁদল সিংয়ের মুখ থেকে তা আভাস পাবামাত্রই আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, ব্যাপারটা কি মিঃ সিং?

কোঁদল সিং আমতা আমতা করে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে বলা ঠিক সমীচীন হবে না মিঃ দ্যট্। ঘটনাটা এখনও গোপন রাখার চেষ্টা চলছে। কারণ এখানে যাঁরা এসেছেন সকলে শুধু নিমন্ত্রিতই নয়, গণ্যমান্যও বটে। তাঁদের সন্দেহ করা—, বুঝতেই পারছেন তবে আপনি যদি সত্যি সত্যিই আগ্রহী হন তাহলে অন্য কোথায়ও চলুন—

আমি আর কৌতূহল চাপতে না পেরে বললাম, অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। আপনি বরং গলার স্বরটা নামিয়ে বলুন তাহলেই হবে।

কোঁদল সিং এবার আর কোনরকম আপত্তি করল না। আমাব কানের কাছে দাড়িসুদ্ধ মুখটা এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ওঁর চার বছরের নাতনী লাভলিও আজ উপস্থিত আছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন চেনা-পরিচিতদের সঙ্গে বিদায়ী শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত লাভলি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল লনেতে।

কেউ একজন তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে গাছের ফুলের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়ে, গলার সোনার হারটা খুলে নিয়েছে।

প্রথম সেটি লেডী মাউন্টব্যাটেনের চোখে পড়ে। লেডী ব্যাপারটার প্রতি লর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, লর্ড লাভ্‌লিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন সদুত্তর পান নি এবং চোরকে আইডেনটিফাই করার মত কোন তথ্যও সংগ্রহ করতে পারেন নি। কেবল বলেছে লোকটার মাথায় অনেক চুল ছিল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন অবশ্য এ ব্যাপার নিয়ে বিশেষ হৈচৈ করার পক্ষপাতী নন। তবে গোয়েন্দা বিভাগের যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ মদনলালের কানে কথাটা পৌঁছতে, তিনি কি করা উচিত চিন্তা করে দেখছেন।

কোঁদল সিং-এর মুখে ঘটানাটা শুনে আমার খুবই খারাপ লাগল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন জাতে ইংরেজ হতে পারেন এবং তাঁর জাতভাইয়েরা দুশো বছর আমাদের ওপর অত্যাচার চালাতে পাবেন, কিন্তু বিদায় মুহূর্তে একজনের দুষ্কর্মের জন্য সমগ্র জাতটাকে চোর বলে যাবেন এটা কোনরকমেই সহ্য করা যায় না। বিশেষ করে আমি নিজেই যখন একজন ভারতীয়, ভারতীয়ের বদনাম হওয়া মানেই আমারও বদনাম এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

মনে মনে আমি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠলেও, করার মত কিছুই ছিল না। প্রথমতঃ আমি গোয়েন্দা নই, দ্বিতীয়তঃ আমার কাছে যখন সাহায্য চায় নি, আমার পক্ষে গায়ে পড়ে আগ্রহ দেখানোর আদৌ কোনও যুক্তি নেই। আমি তাই নীরবেই ধূমপান করতে লাগলাম। কোঁদল সিং চলে গেল।

মিঃ মদনলাল যে এই হার উদ্ধারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে সেটা তার সসব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি দেখেই বুঝতে পারলাম। মিঃ মদনলাল রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রবেশদ্বারে যে কজন রক্ষী দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছে গিয়ে চুপি চুপি নির্দেশ দিল, ফটক বন্ধ রাখ। কেউ যেন বেরুতে না পারে। কেউ বেরুতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে। আমি অনুমতি দিলেই তবে সে বাইরে যাবার সুযোগ পাবে নচেৎ নয়।

ক্রমশঃ মদনলালের নেতৃত্বে ভবনের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হ'ল। মিঃ মদনলাল যে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে খানাতল্লাসী চালাতে চান, সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। এবং আমিও যে তা থেকে রেহাই পাব না সে কথা ভেবে আমারও খুব খারাপ লাগল।

কিন্তু উপায়ও কিছু ছিল না। এই মুহূর্তে আমি যদি গলা বাড়িয়ে মদনলালকে এ কাজে বিরত থাকতে বলি, চুরির পেছনে আমারও সক্রিয় ভূমিকা আছে এমন ধারণা মিঃ মদনলালের হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

অবশ্য মিঃ মদনলালের এই কীর্তি সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। যেহেতু তারা চুরি সম্পর্কে কিছুই জানত না, অতএব কিছু সশস্ত্র পুলিশের চলাফেরায় তারা কোন গুরুত্বই দেয় নি।

জায়গায় জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করে মিঃ মদনলাল যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে তার পরিকল্পনার কথা জানাতে এল আমি তখন সেখানে বসে আড্ডা মারছি।

মিসেস্ মাউন্টব্যাটেন বলছিলেন ভারতে যত ঐশ্বর্য আছে পৃথিবীর আর কোথাও

এত নেই। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের যত প্রাচুর্য তত প্রাচুর্য মানুষের মহানুভবতার। এখানে এই কবছরে অসংখ্য জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি—অবশ্য তার মধ্যে তুমিও পড় বলে মিসেস্ মাউন্টব্যাটেন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

সেই মুহূর্তে মিঃ মদনলাল এসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কানে কানে বললেন, একটু এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন মিঃ মদনলালের মুখ থেকে এ কথা শোনা—মাত্রই বেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কি ব্যাপার বল তো?

মিঃ মদনলাল ইঙ্গিতে চুরি প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি হা-হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, লাম্বুর সামনে অনায়াসেই বলতে পার। তুমি বোধ হয় ওর পরিচয় জান না তাই—

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে মিঃ বদনলাল একমিনিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ভদ্রলোকের ছবি কাগজে অনেকবার দেখেছি বটে কিন্তু নামটা ঠিক খেয়াল করতে পারছিলাম না।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ব্রাহ্মিশাক খাওয়া উচিত। ওতে নাকি স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়।

লর্ডের মন্তব্য শুনে মিঃ মদনলাল বেশ একটু লজ্জিতই হল।

মিঃ মদনলাল তার পরিকল্পনাটা পরিষ্কার করে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বলতেই তিনি প্রায় ছোটখাট ধরনের একটা লাফ মেরে বলে উঠলেন, 'কোয়াইট্ ইম্পসিবল্।' যদিও ঘটনাটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক কিন্তু তাই বলে আমি সামান্য কটা টাকার জন্য বিশিষ্ট এই জ্ঞানীগুণীদের এভাবে প্রকাশ্যে সার্চ করে অপমান করতে পারব না। এ খবর যদি দেশবিদেশে রাষ্ট্র হয়ে যায় লোকেই বা বলবে কি! ধরে নেবে আমি ইচ্ছে করেই তাঁদের অপমান করেছি। আমার নিজের পক্ষেও বটে, চাকরির ভবিষ্যতের পক্ষেও সেটা মঙ্গলজনক নয়। পার তো অন্য কোনও উপায়ের কথা চিন্তা করে দেখ।

মিঃ মদনলালের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, ঠিক আছে, আবার নতুন করে ভেবে দেখি তাহলে।

মিঃ মদনলাল চলে গেলেও আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এল। বলল, আর একটা পথ আছে। দেখুন তো চলবে কিনা?

লর্ড মাউন্টব্যাটেন মুখ তুলে তাকালেন।

মিঃ মদনলাল বলল, লাভলিকে যখন চোর ভদ্রলোক ফুল দেখাবার অছিলায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, লাভলি তাকে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। এখন যদি আমর লাভলিকে নিয়ে নিমন্ত্রিতদের মাঝখানে ঘোরাই, আমার মনে হয় ও নিজেই অপরাধীকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারবে।

মিঃ মদনলালের প্রস্তাবটা শুনে মিঃ ও মিসেস্ মাউন্টব্যাটেন দুজনেই যখন মোটামুটি রাজী হতে যাচ্ছে, আমি বাধা দিলাম। বললাম, আপনারা সকলে যত সহজে ব্যাপারট নিচ্ছেন, আদৌ ততটা সহজ নয়।

লাভলির চোখে ইতিমধ্যেই ঘুম নেমে এসেছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে তার ব্যক্তিগত মতামত বলতে কিছুই নেই। এখন যদি ওকে সকলের সামনে হাজির করে চোর

ধরে দিতে বলা হয়, সে এই ঘুম জড়ানো চোখে আদৌ সে কাজে সফল হবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার চেয়েও যেটা ভাববার কথা, ধরুন ঘুমের ঘোরে সে যদি কোনও নির্দোষী ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেয় তবে অযথা তাকে বিব্রত করা হবে এবং সেটার সম্ভাবনাই ষোল আনা। আমার মনে হয় মিঃ মদনলালের প্রস্তাব আপানাদের আরও ভাল করে বিবেচনা করা উচিত।

লর্ড ও লেডী দুজনে প্রায় একসাথেই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কারেক্ট।' ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে তা না হলে এই বিদায় মুহূর্তে বদনামের ভাগীদার হতে হত।

মিঃ মদনলালও নিজের ভুল বুঝতে পেরে বেশ একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ভেরি স্যরি স্যার' আমার মাথায় এটা একেবারেই আসে নি। বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মিঃ মদনলাল চলে গেল সেখান থেকে।

মিঃ মদনলাল আবার ঘুরে আসবে আমরা কেউই ভাবতে পারি নি। লর্ড মাউন্টব্যাটেন আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আবার কিছু মাথায় এল নাকি?

মিঃ মদনলাল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, চালপোড়া নিয়ে আসব? এক চামচ করে খাইয়ে দিলেই এখুনি চোর ধরা পড়ে যাবে।

চালফোড়া। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

জিনিসটা যে তাদের বোধগম্য হয় নি মিঃ মদনলাল বুঝতে পেরে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল চালপোড়ার মাহাত্ম্য।

লেডী মাউন্টব্যাটেন রাজী হলেন না। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'নো নো' চালফোড় ফালফোড়া চলবে না। ফ্রায়েড্ রাইস্, চিকেনকারী খাওয়ানোর পরে কি আর ওসব খাওয়ানো চলে অতিথিদের!

মিঃ মদনলাল যে বেশ একটু চটে গেল সেটা তার আরক্তিম মুখ দেখেই মনে হল। সে ঘাড় নেড়ে বলল, এভাবে চোর ধরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি পুরো অক্ষমতা জানাচ্ছি। 'ডোন্ট মাইণ্ড!'

মিঃ মদনলাল এত তাড়াতাড়ি অক্ষমতা জানাবে, লর্ড বা লেডী মাউন্টব্যাটেন কেউ ভাবতেই পারেন নি। দুজনে বেশ একটু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

লেডী মাউন্টব্যাটেন এতক্ষণ নীরবেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার উদ্দেশ্যে বললেন, লাম্বু তুমিও জীবনে অনেক অসাধ্যসাধন করেছ, এ ব্যাপারে কোনরকম মতলব দিতে পার না?

লেডী মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চোখ দুটো হঠাৎ ছানাবড়ার মত গোল গোল হয়ে উঠল। গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'রাইট ইউ আর।' আমারও এতক্ষণ একথা মনে আসে নি। তুমিও সত্যি সত্যিই একজন ভার্সাটাইল্ জিনিয়াস্—দেখ না যদি লাভলির হারগাছাটা উদ্ধার করে দিতে পার।

লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেনের হঠাৎ আমাকে নিয়ে আমড়াগাছি শুরু করাটা মিঃ মদনলালের মোটেই ভাল লাগল না। একজন জাঁদরেল গোয়েন্দা হয়ে সে যা পারল না, আমার মত একজন চুনোপুঁটির পক্ষে সে চেষ্টা কর নেহাতই হাস্যাস্পদ। তাছাড়াও

এখবর যদি বড়কর্তাদের কানে কোন রকমে পৌঁছায় তাহলেও যথেষ্ট বিপদ আছে। ভবিষ্যতে তার প্রমোশনের ক্ষেত্রে হয়তো বা এটা একটা বড়রকমের বাধা হয়ে দাঁড়াবে!

মিঃ মদনলাল নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উল্টো সুর গাইতে শুরু করল। লেডী মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যে বলল, আমার একটা অনুরোধ আছে। দয়া করে আনাড়ীদের হাতে এই গুরু দায়িত্ব চাপাবেন না। কি করতে কি করে ফেলবে, কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তাছাড়াও আমার চাকুরে-জীবনে একটা ক্ষতিও বটে।

লেডী মাউন্টব্যাটেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেও, লর্ড তাকে বিশেষ পাত্তা দিলেন না। আমার উদ্দেশ্যে বললেন, কী হে ভেবে দেখ পারবে নাকি?

মিঃ মদনলাল আমার জবাব শোনবার জন্য মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললাম পাঁচ মিনিট সময় দিন। ভেবে দেখি—

একটা সিগারেট ধরিয়ে লনে পায়চারি করতে করতে ভাবছি। পরিকল্পনা মাথায় এনেও ঠিকমত জুতসই হচ্ছে না। পাঁচটা সিগারেটের পাঁচ পাউন্ড ধোঁয়া মুখ দিয়ে ঢুকে যে কোথায় মিলিয়ে গেল টেরই পেলাম না। বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছি, হঠাৎ একখণ্ড পাথরে হোঁচট খেতেই বুদ্ধিটা টক করে খুলে গেল এবং একটা সুন্দর পরিকল্পনা এসে গেল মাথায়।

একমুহূর্ত আর সময় নষ্ট না করে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সুমুখে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমার মতামত জানবার জন্য সাগ্রহেই অপেক্ষা করছিলেন। হাসিমুখে আমায় ঘরে ঢুকতে দেখেই বলে উঠলেন, জানতাম। আর বলার দরকার নেই। এখন কোমর বেঁধে লেগে যাও আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথিরা চলে যেতে শুরু করবে।

মিঃ মদনলাল ভেবেছিল আমি বুঝি একটা ছুতো করে সরে পড়েছি। হাসিমুখে আমায় ঘরে ঢুকতে দেখে, মুখটা গোমড়া হয়ে গেল। কাজের অছিলায় সে সরে পড়ল সেখান থেকে।

আমি সেখানে থেকে সোজা চলে গেলাম রাষ্ট্রপতি ভবনের ফটকে। প্রহরীদের কাছে প্রশ্ন করলাম, অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর কেউ বাইরে যাবার চেষ্টা করেছে কিনা।

তারা ঘাড় নেড়ে বলল, না—এখনও পর্যন্ত কেউ যায় নি।

ওদের কথা শুনে আমি আশ্বস্তই হলাম। প্রহরীদের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে আমি আবার ফিরে এলাম। এদিকে খাওয়ার পাটও মোটামুটি মিটেই গিয়েছিল। দলে দলে ভাগ হয়ে তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প করছিল।

আমি একটা চক্কর মেরে দেখে এলাম চারদিকটা। অতিথিরা কেউই বাইরে নেই। সকলেই কোন-না-কোন ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

পয়লা নম্বর ঘরে থেকেই শুরু করলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম অতিথিরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ডাইনিং টেবিলের চারধারে বসে রয়েছে এবং গালগল্প করছে।

আমি ঘর গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, ঘরের চৌকাঠে একটা সোনার হার পড়ে ছিল। আমি তুলে রেখেছি। দেখুন তো আপনাদের কারুর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে কিনা।

লক্ষ্য করলাম কেউই কোনরকম নড়াচড়া করল না। আমার মুখের দিকে তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। একজন বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, খেতে এসেছি পেটপুরে, পকেটে হার নিয়ে আসতে যাব কেন! আমাদের মাথা কি খারাপ হয়েছে নাকি?

কথাবার্তার ধরন দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, চোর বাবাজী এ ঘরে নেই। এক নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে যথাক্রমে দুই, তিন, চার নম্বর ঘরেও ঢুকলাম এবং ওই একই কথা বললাম। পরিণতি মোটামুটি একই রকম হল।

পাঁচ নম্বর ঘরে অতিথির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। আমি ঘরে ঢুকে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আমি ঘরের দোড়গোড়ার কাছ থেকে একটা সোনার হার কুড়িয়ে পেয়েছি। দেখুন তো আপনাদের কারুর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে কিনা!

আমার কথা শুনে সকলে আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকালেও একজন অন্ততঃ তাকাল না। বেশ হকচকিয়েই সে জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে, ট্যাঁকে কি যেন খুঁজতে গিয়েও পরমুহূর্তেই বিরত হল এবং নিজের অজ্ঞাতসারে জিব কাটল।

আমার নজর এড়াল না। আমি এগিয়ে গেলাম আগন্তুকের কাছে। গম্ভীর হয়ে বললাম, ট্যাঁকে যে হারগাছটা লুকিয়ে রেখেছেন এখুনি বের করে দিন। নইলে পুলিশের সাহায্য নেব।

আগন্তুকের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেলেও মুখে কিছু প্রকাশ করল না। বরং বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বলে উঠল, কে হরিদাস মশাই আপনি! চুরির অভিযোগে আপনি যাকে অভিযুক্ত করছেন তার পরিচয় জানেন? জানলে বোধ হয় আপনি আসতেন না।

আমি হেসে বললাম, আপনি আর যেই হন রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই নন। এখন চলুন নিশ্চিন্তমনে জেলে বসে দিন কাটার ব্যবস্থা করে দিই।

পালাবার আর কোনও পথ নেই দেখে এবার আগন্তুকের সুর নরম হয়ে গেল এবং সশঙ্কিত চোখে চারপাশে তাকাতে লাগল। হারগাছাটা পাছে সরিয়ে ফেলে, আমি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালাম এবং শূন্যহাতটা পেতে দিলাম তার সামনে।

আগন্তুক ট্যাঁকের মধ্যে এক গোপন পকেট থেকে হারগাছটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, কাইন্ডলি ব্যাপারটা নিয়ে আর বিশেষ হৈচৈ করবেন না। আমার মনিব এখানেই উপস্থিত আছেন। খবরটা তাঁর কানে গেলে নির্ঘাত আমার চাকরিটা যাবে এবং পথে পথে ছোলাভাজা ফিরি করে বেড়াতে হবে।

হারগাছটা খুঁজে বের করে মালিকের হাতে তুলে দেওয়াতেই আমার আনন্দ। চোর ধরে নয়। আগন্তুকের সনির্বন্ধ অনুরোধটা আমি রাখলাম। হারগাছটা নিয়ে গিয়ে লেডী মাউন্টব্যাটেনের হাতে দিয়ে বললাম, পেয়েছি। এখন অনায়াসেই লাভলিকে পরিয়ে দিতে পারেন।

লেডী মাউন্টব্যাটেন হারটা হাতে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলেন। লর্ড উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমার হাতটা ধরে বললেন, লাম্বু তোমায় আমি যতই জানছি ততই তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে যাচ্ছে। তুমি সত্যিকারের ভারতরত্ন!

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে আমার ভীষণ রকম হাসি পেল। কোনরকমে হাসিটা চেপে বললাম, তারার আলো দেখেই যদি আপনি আত্মহারা হয়ে পড়েন, সূর্যের আলো দেখলে তখন করবেন কি?

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার কাহিনী শুনে যখন আমরা সকলে অভিভূত, হঠাৎ চমক বলে উঠল, আচ্ছা লম্বুদা, আপনি যেভাবে চোর ধরলেন, এর পেছনে আপনার যুক্তি কিছু ছিল?

লম্বুদা প্রায় একদমে কাহিনীটা বলার ফলে বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য তার জন্য চমককে হতাশ করলেন না। 'একমিনিট' বলে চোখ বুজিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন। সিগারেটটা পুরো শেষ করে, জুতোর তলায় ফেলে পিষতে পিষতে বললেন, তোমার কৌতূহল দেখে খুশিই হলাম। কেন ওই পদ্ধতিতে চোরকে ধরতে গেলাম তোমরা জানতে চেয়েছ। রাষ্ট্রপতি ভবনের দ্বাররক্ষক যখন জানাল, অনুষ্ঠান শুরু হবার পর থেকে একজনও ভবনের বাইরে যায় নি, তখন স্বাভাবিক কারণেই ধরে নিলাম, চোর ভদ্রলোক যেই হউন না কোন, তিনি এখন সশরীরেই সেখানে অবস্থান করছেন। .

বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় লোকের সঙ্গে উপহার থাকাটা তেমন কিছু অস্বাভাবিক নয়. কিন্তু সোনার হার থাকাটা অস্বাভাবিকই। সোনার হার কুড়িয়ে পেয়েছি বলামাত্রই তাই সকলে কেবল বিস্ময় প্রকাশই করেছে—পকেট হাতড়ায় নি। পাঁচ নম্বর ঘরের ওই লোকটি যেহেতু হারগাছটা লাভলির গলা থেকে খুলে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছিল. মনটাও তার পড়েছিল সেখানে। আমি গিয়ে 'হার পেয়েছি' বলা মাত্রই অন্যমনস্কতাবশতঃ এটা তার হার কিনা জানবার জন্য হাতটা চলে গিয়েছিল ট্যাঁকে কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চুরির কথা মনে পড়ে যাওয়াতে সে জিব কেটেছিল।

আমি অবশ্য অসতর্ক মুহূর্তের এই ভুলটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। লম্বুদা মুচকি হাসলেন। সিগারেটটা ঠোঁটের কোণায় ঝুলিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, খবরটা যথাসময় নেহরুর কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। নেহরু আমায় আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি ভারতের মুখ রক্ষা করেছ। পুরস্কার দিয়ে তোমায় আমি ছোট করতে চাই না। আমার বুকের গোলাপ তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমার এই প্রীতি-উপহার তোমার এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের রাজসাক্ষী হয়ে থাকুক।

লম্বুদা গোলাপ ফুলটা নাকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানতে লাগলেন। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল।

---

# খেলোয়াড় লম্বুদা



# সট্

লম্বুদা টাইয়ের নট্ টাইট করতে করতে ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের ফাইন্যাল খেলা যেন ক'টার সময়?

হিল্লোল জার্সি পরতে পরতে বললে, পাঁচটা পনরো মিনিটে।

লম্বুদা হাতের বোতাম খুলে ঘড়িটা দেখে বললেন, একঘণ্টা আগে আসতে বলেছিলে। তাহলে ঠিক সময়েই এসেছি কি বল? লম্বুদা চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন, 'দিসিস্ পাঙচুয়ালিটি।' আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে যেটার প্রচণ্ড অভাব। অবশ্য ত্রিশ বছর আগে আমিও এর মূল্য বুঝতুম না। ব্লাডিভস্টকে গিয়েই আমার প্রথম চোখ খুলল। ওখানকার গভর্নরের সঙ্গে এক ভোজসভায় আমার যেতে মাত্র পনরো সেকেন্ড দেরি হয়েছিল বলে সে সভাসুদ্ধ লোকের কী হাসি! একজন তো লোভ সামলাতে না পেরে বলেই ফেলল, মহাশয় ভারতীয় নিশ্চয়ই। শুনে লজ্জায় আমার কান লাল, তাড়াতাড়ি দোষ স্খালন করবার জন্য একটা অজুহাত দেখাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তাতে ব্যাপারটা আরো ঘোলাটে হয়ে গেল। তারা যদিও বা মুচকি হাসছিল, এবারে হো-হো-হো করে হেসে উঠল। দেখলুম ব্যাপার তেমন সুবিধের নয়। বেমালুম চেপে যাওয়াই শ্রেয়। কোনোদিকে আর না তাকিয়ে কাঁটা-চামচ আর ছুরি বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দে ব্যাঙের রোস্ট খেতে লাগলুম।

লম্বুদা প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার সিগারেট খাওয়ার ফাঁকে আমাদের জার্সি ও জুতো পরা হয়ে গিয়েছিল। লম্বুদা জুতোর হিলের তলায় সিগারেটের শেষাংশটুকু চেপে ধরে বললেন, 'ফ্রেন্ডস্ নাউ উই মে গো!' আমরা লম্বুদাসহ বেরিয়ে পড়লুম খেলার মাঠের উদ্দেশ্যে।

মাঠে পৌঁছে লম্বুদা পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতির আসনের পাশেই একটি চেয়ার ম্যানেজ করে পায়ের ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসলেন, তারপর পকেট থেকে একটি মিনি বায়নাকুলার বের করে চোখে লাগিয়ে সারা মাঠের ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন।

যথাসময়েই হুইসীল্ পড়তে আমরা সদলবলে লম্বুদার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। লম্বুদা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'ফ্রেন্ডস্ উইস্ ইউ সাকসেস্।' তারপর টাইয়ের নট্টা বেশ একটু টাইট করে দ্রুত পা নাচাতে শুরু করলেন।

খেলা শুরু হতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের সেন্টার ফরোয়ার্ড চমক মাঠের মধ্যে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলল এবং অনবরত প্রতিপক্ষ দলের গোলে

হানা দিতে লাগল, সেটা প্রতিপক্ষ দলের মোটেই মনঃপূত হল না। তারা চমককে কায়দামত পাওয়া মাত্রই এমন কাঁচি মারল, সঙ্গে সঙ্গে সে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এবং বলির কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে লাগল।

লম্বুদা তার আসন থেকে বায়নাকুলারের সাহায্যে সবকিছুই প্রত্যক্ষ করছিলেন। চমক পড়ে যাওয়ামাত্রই তিনি 'ফাউল—ফাউল' চিৎকার করতে করতে সেখানে ছুটে এলেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে চমকের আঘাতপ্রাপ্ত পা-খানায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে শুরু করলেন।

নিবিষ্টমনে বেশ কয়েক মিনিট পরীক্ষা করার পর, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, লাকি এনাফ্। ফ্র্যাক্চার হয় নি। সর্বত্রই টং টং আওয়াজ হচ্ছে। কোপেনহেগেনে এক প্রদর্শনী খেলায় আমিও একবার এরকম ল্যাঙ খেয়েছিলুম। যে ল্যাঙ মেরেছিল আমার পায়ের স্ট্রেনথ্ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। বসে পড়ে আমি যখন পায়ের ডিমটা ডলছি, হঠাৎ সে পা ধরে বসে পড়ল মাটিতে।

যাঁরা আমাকে ফার্স্ট-এড্ দেবার জন্য দৌড়ে এসেছিলেন, আমি তাঁদের বললুম, আমাকে সাহায্য করার কোনো দরকার নেই। বরং আপনারা বন্ধুটিকে দেখুন। আমার অনুরোধ মতই তাঁরা বন্ধুটির কাছে গিয়ে দেখলেন, তার পায়ের গোড়ালির কাছে একটি ছিদ্র থেকে ট্যালকম্ পাউডারের মত বোন্‌ডাস্ট বা হাড়ের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। আমি লাফিয়ে উঠে খেলতে নেমে গেলুম। আর আমার পুওর ফ্রেন্ডকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হল।

লম্বুদা থেমে গিয়ে আড়চোখে তাঁর বীরত্বের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

চমক ইতিমধ্যে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চারদিক থেকে হাততালি পড়তে লাগল।

খেলা শুরু হতেই আবার চমক বিদ্যুৎগতিতে এগুতে লাগল প্রতিপক্ষ দলের সীমানার মধ্যে। চমককে আটকাবার জন্য ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের ওপর। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। চমক চট্ করে ডান পায়ের বলটা বাঁ পায়ে টেনে মাটি ঘেঁষে এমন প্রচণ্ড একটি সট্ মারল যে, বলটা ওদের গোলরক্ষকের হাতের গ্লাভসের খানিকটা অংশ ফাটিয়ে ঢুকে গেল নেটের মধ্যে।

চমকের এই অভূতপূর্ব গোলটি দেখে সমস্ত দর্শক হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। বিজ্ঞ যে-সব খেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে স্বীকার করলেন, গোষ্ঠ পালের সটে বার ভাঙার ঘটনার পরে এমন দুর্ধর্ষ সটের নজির আর নেই। অনেকেই তাই গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে চমকের সাথে করমর্দন করে এলেন।

পরে আরো দুটি গোল হয়ে মোট তিনশূন্য গোলে খেলা নিষ্পত্তি হওয়াতে

সমর্থকদের আনন্দের সীমা রইল না। তারা চমককে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দিল।

ক্লাবে ফিরে লম্বুদা পকেট থেকে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, পঞ্চাশ টাকার গরম রসগোল্লা নিয়ে এস। বিজয়োৎসব করা যাক।

লম্বুদার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল এবং দশ মিনিটের মধ্যেই রসগোল্লার ভাঁড় নিয়ে ফিরে এল ক্লাবেতে। ভাঁড়ের গায়ে হাত বুলিয়ে লম্বুদা বললেন, যাক পেয়েছ তাহলে। বহুদিন গরম রসগোল্লা খাই নি। অবশ্য খাবার অবকাশই বা কোথায়!

রসগোল্লা ভাগের দায়িত্ব পড়ল হিল্লোলের ওপর। হিল্লোল রসগোল্লা গুনতে গুনতে বললে, চমকের প্রথম গোলটা দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। ফার্স্ট ডিভিসনের খেলায়ও এমন জোরালো সট্ দেখা যায় না। গোলরক্ষকের গ্লাবস্ ফাটানো কি মুখের কথা!

লম্বুদার ভাগ আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লম্বুদা একসাথে চারটে রসগোল্লা মুখে পুরে সাপে ব্যাঙ খাওয়ার মত রস টানছিলেন। হিল্লোলের কথা শুনেই তিনি ঠোঁট চেপে হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দ করে হাসবার চেষ্টা করলেন।

হাসির শব্দে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল তাঁর দিকে। বাস্তব বলল, লম্বুদা কিছু একটা বলবেন মনে হচ্ছে। আপনি তো বড় অকারণে হাসেন না? লম্বুদা চোখ বুজে 'কোঁৎ' করে চারটে একসঙ্গে গিলে ফেলে বললেন, চমকের এই সট্ দেখেই তোমরা ভিরমি খাচ্ছ, তবু যদি আমার ঐতিহাসিক গোলখানা দেখবার সৌভাগ্য তোমদের হত! চমকের বোধ হয় একটু গায়ে লাগল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বললে, আপনি ফুটবল খেলতে জানেন কখনো বলেন নি তো?

লম্বুদা ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে তুড়ি দিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন, যদিও এটা প্রচারের যুগ তাহলেও নিজের ড্রাম নিজে পেটাতে আমার লজ্জা করে। নেহাৎ প্রসঙ্গ না উঠলে বড় একটা মুখ খুলি না। আজো খুলতুম না, যদি না চমকের জোরালো সটের কথা বলতে বলতে হিল্লোলের নাল না ঝরত।

আমি দেখলুম এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। লম্বুদাকে বললুম, আপনার ঐতিহাসিক সট্ ছেপে বেরুতে এখনো দেরি আছে। মরি কি বাঁচি তার ঠিক নেই, আজ বরং আপনার মুখ থেকেই আমরা কাহিনীটা শুনি। খুবই সময়োচিত হবে।

'বটে' বলে লম্বুদা হাসলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে একটা অনুরোধ, তোমরা যেন বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই কাহিনী ফাঁস করো না। ছেপে বেরুলে তাহলে কিছু খদ্দের

হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আমরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলুম—বলব না, কথা দিলুম।

লম্বুদা দুনাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, তখন আমার বয়েস কতই বা হবে, হার্ডলি ষোল কি সতরো। ফুটবল খেলায় তখন আমার ভীষণ ঝোঁক। রেগুলার্ স্কুল টিমে খেলছি। এই সময় ফুটবলের যাদুকর ম্যাথুজ ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নত ধরনের ক্রীড়াপদ্ধতি শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোশিয়েসন এক বিজ্ঞপ্তিতে যে সমস্ত খেলোয়াড়েরা ম্যাথুজ সাহেবের কাছে ফুটবল ট্রেনিং নিতে ইচ্ছুক, তাদের আবেদন করতে অনুরোধ জানাল।

বিজ্ঞপ্তিটা দেখে ভাবলুম একখানা আবেদন-পত্র ছেড়েই দেখা যাক না কেন. কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। তখুনিই ছুটলুম আই. এফ. এ.-র অফিসে আবেদন-পত্র সংগ্রহের জন্য। যিনি আবেদনপত্র বিলি করছিলেন, আমি হাত বাড়ানো মাত্রই স্টিলের ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে এনে বললেন, কার জন্য নিতে এসেছ, বাবা না দাদা?

শুনে আমার সর্বাঙ্গ রাগে রী রী করে উঠল। একবার মনে হল একখানা ভলি কিক্ করে বুঝিয়ে দিই কার দরকার। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, মাথা গরম করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো মহৎ কাজ হয় নি। অগত্যা মেজাজখানাকে বরফে পরিণত করে বললুম, আমি বেঙ্গল স্কুল টিমের ভাবী অধিনায়ক শ্রীলম্বমান দত্ত। আমি নিজের জন্যেই এসেছি।

ভদ্রলোক প্রজাপতি মার্কা গোঁফজোড়া মৃদু নাচিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কী যেন নাম বললে লম্ব না ডম্ব?

আমি বললুম, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।

ভদ্রলোক তেমনিই হাসতে হাসতে বললেন, একটা কেন একশটাও বলতে পার।

আমি বললুম, বাড়ি গিয়ে দিদিমাকে বলবেন কানে খোল জমেছে। অবিলম্বে পরিষ্কার করে দিতে। বেশি জমে গেলে কানে পচন ধরতে পারে।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে দুদণ্ড তাকিয়ে থেকে, একখানা আবেদন-পত্র পাকিয়ে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ছেলে না পিলে!

আবেদন-পত্র যথাযথ পূরণ করে জমা দিতেই, পরের দিনই চিঠি এল তুমি নির্বাচিত। আগামী রবিবার বেলা তিনটায় ক্যালকাটা মাঠে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। চিঠির নির্দেশ মতই আমি রবিবার দিন মাঠে হাজির হলুম। সেখানে পৌঁছে দেখি ভারতের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়েরা সকলেই হাজির হয়েছে। আমি মাঠে ঢুকতেই ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় পিল্লুস্বামীনাথম ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বললে,

তোমার কথাই ভাবছিলুম। আমাদের তো অবসর গ্রহণের সময় হয়ে এসেছে। এখন তো তোমাদের মত রাইজিং সান-দেরই ট্রেনিং নেওয়া উচিত। পিল্লুস্বামীনাথম আমাকে এভাবে খাতির করাতে, অন্যান্য খেলোয়াড়েরা হিংসাতে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল।

যথাসময়েই ট্রেনিং শুরু হল। ম্যাথুজ সাহেব প্রথমেই পিল্লুকে ডাকলেন। পিল্লু এগিয়ে যেতেই ম্যাথুজ সাহেব তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, পেনাল্টি কিকে তোমাদের ভীষণ দুর্বলতা। সর্বাগ্রে তাই তোমাদের পেনাল্টি কিক্ করাই শেখাব।

পেনাল্টি-বক্সের সীমানায় বল বসিয়ে গোলরক্ষক কোন্ পজিসানে থাকলে কি ভাবে কিক্ করতে হবে, সে সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে, ম্যাথুজ সাহেব তাঁর নির্দেশ মতই একটি পেনাল্টি কিক্ মারতে বললেন।

পিল্লুস্বামীনাথম কিক্ করল বটে কিন্তু গোলরক্ষক সাগিরুদ্দি বডি থ্রো দিয়ে বলটা আউট করে দিল।

ম্যাথুজ সাহেব ভ্রূকুঁচকে বললেন, বল মারার ডিরেকসন্ ঠিকই হয়েছে কিন্তু বড্ড দুর্বল কিক্। কিক্ জোরালো না করতে পারলে গোলের কোনো গ্যারাণ্টি থাকবে না। ম্যাথুজ সাহেব নিজে একটা কিক্ করে দেখালেন। তারপর পিল্লুর পিঠ চাপড়ে বললেন, নার্ভাস্ হবার কোনো কারণ নেই। প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা অনুশীলন কর তাইলেই এই দুর্বলতা কেটে যাবে।

পিল্লুস্বামীনাথমের পর একে একে অন্য খেলোয়াড়দেরও ডাক পড়তে লাগল। সকলকেই পেনাল্টিকিকের সুযোগ দিয়ে, ম্যাথুজ সাহেব একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন, কিক্ জোরালো কর। তা না হলে কোনোদিন ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছতে পারবে না।

একে একে সকলের ট্রেনিং নেওয়ার পালা শেষ হতে এবার আমার ডাক পড়ল। আমি বুকের বোতাম আঁটতে আঁটতে এগিয়ে যেতেই, ম্যাথুজ সাহেব আমার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্রূকুঁচকে বললেন, পাঁচ নম্বর বল কোনোদিন খেলেছ?

ম্যাথুজ সাহেবের প্রশ্ন শুনে আমার হাড়াপিত্তি জ্বলে উঠল। ঢোঁক গিলে বললুম, খেলি না খেলি একবার চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি!

ম্যাথুজ সাহেব মুখটা ছুঁচলো করে বললেন, বটে, কিন্তু তোমার তো জানা উচিত ছিল, এলেবেলেদের খেলা শেখাতে আমি সাত সমুদ্দুর পার হয়ে এখানে আসি নি।

কী উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ম্যাথুজ সাহেবের হঠাৎ কি মনে হল, বললেন অলরাইট্, তোমার যখন এতই সখ দেখি একটা কিক্ কর। অন্যান্যদের বেলায় ম্যাথুজ সাহেব নিজে গিয়েই বল বসিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলের কোন্ স্থানে কিক্ করতে হবে, সে বিষয়েও কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমার বেলায় তো বল বসালেনই না, উপরন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে চিলের খেলা দেখতে

লাগলেন।

কি আর করি, আমি নিজেই বলটা পেনাল্টিসীমানায় বসিয়ে নিলুম, তারপর গুনে গুনে সাড়ে সতেরো হাত ছুটে এসে বলের তলপেটে সাপাটে এমন একখানা কিক্ করলুম, বলের তো কোনো অস্তিত্ব দেখা গেলই না, উপরন্তু গোলরক্ষক সাগিরুদ্দিন হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার নুলো হাত দুটো থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। লম্বুদা এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করলেন।

বাস্তব বললে, দোহাই লম্বুদা, গান থামান।

লম্বুদা মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা বাসের টিকিট বের করে, ছুঁচলো করে কানের গর্তে ঢুকিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, ম্যাথুজ সাহেব সাগিরুদ্দিনের গোঙানি শুনেই ছুটে গেলেন সেখানে। রক্তাপ্লুত কব্জিবিহীন তার হাত দু'খানা দেখে, আঙ্গুরের মত টসটসে তার মুখখানা কুঁকড়ে কিচমিচ হয়ে গেল।

ম্যাথুজ সাহেবের চেঁচামেচিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে বিস্তর লোক জমায়েত হল। আই. এফ. এ. ক্লাবের একজন কর্মকর্তা বিস্তৃতভাবে সব ঘটনা শুনে, বেরিয়ে পড়ল বল ও সাগিরুদ্দিনের বিচ্ছিন্ন হাতের অংশ দুটি খুঁজতে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর গোলপোস্টের পেছনে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা এঁদো পুকুরের জলে দেখা গেল, বলটা ভাসছে আর সাগিরুদ্দিনের হাতের বিচ্ছিন্ন তালু দুটো বলের গায়ে সেঁটে রয়েছে।

চমক সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, সেটা কী করে সম্ভব হল লম্বুদা?

লম্বুদা চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে বললেন, আমার কিকের জোর সম্পর্কে সাগিরুদ্দিনের কোনো ধারণাই ছিল না। সে বলটা ধরামাত্রই কব্জি থেকে তার তালু দুটো খুলে বলের সঙ্গে পুকুরে গিয়ে পড়ল। বেচারা সাগিরুদ্দিনের দুর্দশার কথা ভেবে এখনো আমার বুকটা টনটন করে ওঠে, বলে লম্বুদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

আমি লোভ সামলাতে পারলুম না। প্রশ্ন করলুম ম্যাথুজ সাহেব দেখে কী বললেন?

লম্বুদা হঠাৎ হো-হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, সে এক কেচ্ছা। ম্যাথুজ সাহেব আড়চোখে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর পেট কামড়ানির দোহাই দিয়ে সেই যে মাঠ থেকে সরে পড়লেন আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম, ভোরের প্লেনেই ম্যাথুজ সাহেব পিট্টান দিয়েছেন।

লম্বুদা চমকের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। উত্তরে আমরা হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পারলুম না।

# ঘুষি

সকাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সারাদিন সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখা যায় নি।

বিকেল না হতে হতেই এক এক করে সবাই আসতে লাগল। প্রথম এল বাস্তব। বাস্তব আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লব আর চমক গলা ধরাধরি করে এসে ঘরে ঢুকল। ওরা দুজনে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকে। তাই ওদের দুজনে খুব বেশি ভাব।

তার বেশ কিছুক্ষণ পরেই এল হিল্লোল মাথায় রুমাল বেঁধে। ঘরে ঢুকে মাথার রুমাল খুলতে খুলতে বললে, আচ্ছা জ্বালাতন রে বাবা! সারা বর্ষা গেল এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, আর হেমন্তে কিনা ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি!

কানন ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে জামা তুলে মাথা পুঁছতে পুঁছতে বললে, যা বলেছিস। আমিও তোর সঙ্গে একমত। ভগবানের মাথার স্ক্রুগুলো নির্ঘাত ঢিলে হয়ে গিয়েছে, তা না হলে কখনো এই কাণ্ড করে!

কাননের গলা পেয়ে আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললুম, মেকানিজম্ তুই তো ভালই জানিস। গিয়ে স্ক্রুগুলো টাইট করে দিয়ে এলেই পারিস। ভবিষ্যতে তাহলে আর আমাদের এমন নাজেহাল হতে হয় না।

হিল্লোল হাসতে হাসতে বলল, ভাল কথাই বলেছিস! চমকই এ কাজের উপযুক্ত লোক বটে। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে। ভগবানের মাথার স্ক্রু টাইট করে তারপর যেন ভগবানকে দিয়ে নিজের মাথার স্ক্রুগুলোও টাইট করে নিয়ে আসে।

হিল্লোলের মন্তব্য শুনে সকলে হো-হো-হো-হো করে হেসে উঠল।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের পছন্দসই জায়গাগুলো বেছে নিয়ে বসার পর বাস্তব বলল, কাল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ দেখলুম। কোনো স্ট্যান্ডার্ডই নেই। এরা কোনোদিন ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছতে পারবে বলেই মনে হয় না, অথচ বকুনির চোটে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। তবু যদি ক্যাসিয়াস ক্লের মত লড়তে পারত।

ক্লের নাম শুনেই চমকের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। পাখার জোরালো বাতাসের তলায় মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ক্যাসিয়াস বোধ হয় মা দুর্গার সেই মহিষাসুরেরই বংশধর হবেন। তা না হলে দুর্ধর্ষ ওই লিস্টনকে কখনো কাবু করতে পারেন!

কানন বলল, ওর স্ট্রেট হুকগুলো সাংঘাতিক। এক পায়ে ভর করে ওই যে ঘুষিগুলো ছোঁড়ে, ও নাকি বুলেটের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যার ফলে লিস্টন বা মার্সিয়ানো কেউই দাঁড়াতে পারল না তার সুমুখে। আমার মনে হয় শক্তির দেবতা হিসাবে ক্যাসিয়াস ক্লে-কেই মানুষের পূজা করা উচিত।

'হ্যাঁ তোমরাই পূজা করবে' বলে যিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পরিচয় আর নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা প্রায় সমস্বরেই বলে উঠলুম, আসুন লম্বুদা, আমরা এতক্ষণ আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। আপনি ছাড়া কখনো আড্ডা জমে!

লম্বুদা রেনকোটের বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, জানি, কিন্তু কী করব বল। একে পথে প্যাচপ্যাচে কাদা তার ওপর বাসে-ট্রামে বাদুড়ঝোলা ভিড়। পুরো একটি

ঘণ্টা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকার পর তবে বাসের পাদানিতে পা রাখতে পারলুম। ইউরোপ-এশিয়ার বহু জায়গায় তো ঘুরেছি—কিন্তু এমন কাণ্ড কোত্থাও দেখি নি, বলতে বলতে লম্বুদা রেনকোট আর টুপিটা খুলে পেয়েকে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। তারপর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটা দখল করে পকেট থেকে একটা দাঁড়াভাঙা চিরুনি বের করে মাথার মধ্যিখানের চুলের গাছা সযত্নে সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে চিরুনিটা পকেটে রাখলেন লম্বুদা। সিগারেট-কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে, সিগারেটের মুখটা দেশলাইয়ের বাক্সে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, হ্যাঁ ক্যাসিয়াস ক্লে-র ঘুষি নিয়ে তোমরা যেন কি বলাবলি করছিলে?

বিপ্লব মৃদু হেসে বললে, ক্লে-র ঘুষির জোর সম্পর্কে আপনার কী মত?

লম্বুদা বিপ্লবের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাঁর গোঁফের নিচে একমুঠো তাচ্ছিল্যের হাসি ছড়িয়ে বললেন, বাছাধনের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তা না হলে ওই কচি ঘুষি মেরে কখনো বিশ্ববিজয়ী হতে পারে!

লম্বুদা এমন নির্বিকারচিত্তে কথাগুলো বললেন, শুনে মনে হল আমরা যদি মেরেকেটে সাতদিনও অনুশীলন করি অনায়াসেই ক্লে-র সঙ্গে এক হাত লড়ে যেতে পারব। আর এক মাস অনুশীলন করলে তো কথাই নেই।

লম্বুদার কথা শুনে আমরা অল্পবিস্তর ঘাবড়ে গেলেও বিপ্লব কিন্তু ঘাবড়াল না। বলল, লম্বুদা আপনি বলছেন বটে, কিন্তু কচি ঘুষিই তো তাকে বিশ্বজয়ীর খেতাব দিয়েছে। শুনে লম্বুদা প্রথমে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন, মনে হল তিনি যেন বিপ্লবের কথা শুনতেই পান নি। সিগারেটটা ঠোঁটের কোণায় চেপে ধরে ঘরের সিলিং লক্ষ্য করে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। প্রায় আধখানা সিগারেট পুড়িয়ে হঠাৎ বিপ্লবের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, নেহাৎ বয়সের ভারে কাবু হয়ে পড়েছি তা না হলে দেখিয়ে দিতুম, কত ধানে কত চাল হয়!

লম্বুদার দম্ভোক্তি শুনে আমরা সচকিত হয়ে উঠলুম।

চমক চোখ দুটো রসগোল্লার মত গোল্লা পাকিয়ে প্রশ্ন করল, লম্বুদা আপনি আবার বক্সিং লড়তেও জানেন নাকি?

লম্বুদা বোধ হয় এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চমকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বললেন, যা জানি তা দিয়ে একবার পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিলুম। কথা উঠেছিল আমার হাতখানা মৃত্যুর পর বাঁধিয়ে রাখবে। নেহাৎ আমি রাজী হই নি তাই। লম্বুদা তার লম্বাটে থুতনিটায় হাত বুলোতে লাগলেন।

আমি আর লোভ সামলাতে পারলুম না। বললুম, লম্বুদা, আপনার পৃথিবী কাঁপানোর কাহিনীটা বলুন না শুনি। এমন বৃষ্টি-বাদলার দিনে ভালই জমবে।

আমার আবদার শুনে লম্বুদা খুশিই হলেন। ভাবসাব দেখে মনে হল, এই অনুরোধটা শোনবার জন্যেই যেন তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। সিগারেটটা মুখ থেকে বের করে রেল-ইঞ্জিনের মত ভকভক করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সেটা ১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। একদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সারছি, ভৃত্যটা একটা চিঠি দিয়ে গেল। বিদেশী চিঠি আমার নামে দশ-বিশখানা প্রায় রোজই আসত,

কাজেই কিছুমাত্র অবাক না হয়ে চিঠিটা খুলে ফেললুম।

আলাবামা পিস্ কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ভি. ভি. টেরোর গুলজার এক শান্তি-আলোচনাচক্রে আমাকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমি তখন কাজে এতই ব্যস্ত যে খাবার-নাইবার পর্যন্ত সময় পাই না। প্রথমে ভাবলুম যাবই না, তারপরে মনে হল; মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে আমার ক্ষুদ্র কর্মব্যস্ততার কিই বা মূল্য। সব কাজকর্ম ফেলে তাই পাড়ি জমালুম আলাবামার পথে।

আলাবামায় পৌঁছে পিস্ কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করলুম তিনদিন। ফিরে আসার দিন সকালে মোটঘাট বাঁধাছাঁধা করছি, হঠাৎ আলাবামার প্রেসিডেন্ট মিঃ টেরোর গুলজার সস্ত্রীক এসে হাজির হলেন আমার হোটেলে।

মিসেস গুলজার বললেন, মিঃ দ্যট্, শুনলুম আজই নাকি আপনি আলাবামা লীভ্ করছেন। একথা কী সত্যি?

আমি সবিনয়ে ঘাড় নাড়তেই, মিসেস গুলজার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ইট্ ইজ্ কোয়াইট্ ইমপসিবল্ মিঃ দ্যট্!' আপনি কতদিন পরে আমাদের দেশের মাটিতে পা দিয়েছেন, অন্ততঃ একটা সপ্তাহ আপনাকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার ইচ্ছাটা কী অন্যায় হবে?

স্পষ্টই বুঝতে পারলুম পুরোটাই মিঃ গুলজারের চালাকি। পাছে তাঁর অনুরোধ না রাখি এইজন্যই তিনি মিসেসের মুখ দিয়ে তাঁর ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও রাজী হতে হল। মিঃ গুলজারের গাড়িতেই রওনা হলুম তাঁর স্পেশ্যাল গেস্ট হয়ে।

উঃ, সে কী আদর! আদরের চোটে প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। অলসভাবে বসে বসে খাওয়া আর ঘুমোনো আমার পোষায় নাকি! আপত্তি করলে পাছে আন্‌সোস্যাল্ ভাবে, তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাল দিয়ে যেতে লাগলুম।

মিঃ গুলজার আমার সম্মানে এক বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করলেন। মিসেস গুলজার বললেন, মিঃ দ্যট্, আলবামার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাবার ষাঁড়ের জিবের রোস্ট। ভোজসভার স্পেশ্যাল মেনু হিসাবে তাই আমি রোস্ট সাজেস্ট করেছি। দেখবেন ওটা যেন মিস্ করবেন না।

মিসেস গুলজারের কথা শুনে আমার হাসি পেল। কানাডিয়ান ইন্টার-প্রভিন্স টুর্নামেন্টে যে কয়েকবার 'রেফরীং' করেছি, দুবেলা খালি ষাঁড়ের জিবের রোস্ট খেতে খেতে জিবে প্রায় শ্যাওলা জম্মে গেছিল। অথচ মুখ ফুটে বলারও উপায় নেই।

মিসেস গুলজার যখন ওটা খাওয়াবার জন্য এতই ব্যগ্র, তাঁর ইচ্ছায় বাধা না দিয়ে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্'।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ভোজসভা শুরু হল।

আলাবামা রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে একে এসে পৌঁছতে লাগলেন। সকলে উপস্থিত হওয়ার পর পরিচয়ের পালা শুরু হল। মিঃ গুলজার আমাকে স্পোর্টস্ অ্যাণ্ড গেমস্ ওয়ার্ল্ডের সূর্য বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয়ের পালা প্রায় শেষ। আর মাত্র দুতিনজন বাকি। মিঃ গুলজার প্রায় সাত ফুটের মত লম্বাচওড়া ও বলিষ্ঠকায় এক তরুণের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বললেন, ইনি প্রখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইয়ের পয়লা নম্বর ছাত্র মিঃ ড্যাম্ ফক্স।

সংক্ষেপে ভবিষ্যৎ বিশ্বজয়ী বলা চলতেও পারে। জো লুইয়ের মতে মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন শক্তিধর যোদ্ধা আসে নি।

মিঃ গুলজার যখন বেশ ফলাও করে মিঃ ড্যাম্ ফক্সের ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করছিলেন, ড্যাম্ ফক্স যেন আমাকে দেখতেই পায় নি এমন ভাব করে ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি "হ্যালো মাই ডিয়ার" বলে হাত বাড়াতে, ড্যাম্ ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্য। আমি হ্যান্ডশেক করলেও মনে মনে ওর এই অভদ্র আচরণে ক্ষুন্ন হলুম। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! কোথায় কি তার ঠিক নেই, এর মধ্যেই এত দেমাক। ডেঁপো ছোঁড়া কোথাকার!

ষাঁড়ের জিবের রোস্টটায় সবে কামড় দিয়েছি, মিঃ গুলজার বললেন, মিঃ দ্যট্ এলেনই যখন এখানে, জো লুইয়ের সাথে একহাত নড়বেন নাকি? যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো স্টেট ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে একটা প্রদর্শনী লড়াইয়ের আয়োজন করি।

মিঃ গুলজারের প্রস্তাব শুনে অভ্যাগতরা হৈহৈ করে উঠলেন। সকলে থামতে ড্যাম্ ফক্স খিকখিক করে হেসে উঠে বলল, মিঃ গুলজার আপনার প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। আশা করি আপনি আপনার ভুল সংশোধন করবেন।

মিঃ গুলজার ড্যাম্ ফক্সের হেঁয়ালি ধরতে না পেরে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি হঠাৎ ওকথা বলছেন কেন?

ড্যাম্ ফক্স মুচকি হেসে বললে, গুরুর সঙ্গে লড়তে নামার আগে অন্ততঃ শিষ্যের কাছে নিজের যোগ্যতাটা প্রমাণ করা উচিত।

মিঃ গুলজার বেশ অপ্রস্তুত পড়ে গেলেন। আমার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ফক্সকে বললেন, মিঃ দ্যটের পরিচয় বোধ হয় আপনি জানেন না বলেই এ ধরনের মন্তব্য করছেন। উনি যদি চর্চা রাখতেন, বিশ্ববিজয়ীর খেতাব এখন তাহলে ওঁর বুক পকেটেই থাকত।

মিঃ গুলজারের কথা শুনে ফক্স মুচকি হেসে বলল, জুনিয়ার গ্রুপে নিশ্চয়ই।

এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে বললুম, মিঃ ফক্স আপত্তি যদি না থাকে তো আসুন না একহাত পাঞ্জা লড়ি।

মিঃ ফক্স খিকখিক করে হেসে উঠে বললে, শৈশবে আমরা কথায় কথায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে গায়ের জোর পরীক্ষা করতুম। আপনি এখন সে স্টেজে থাকলেও আমি নেই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো শক্তি পরীক্ষা ছাড়াই আমি আপনাকে বিজয়ীর সম্মান দিতে পারি। এখন ভেবে দেখুন—

ভোজসভায় উপস্থিত সকলেই আমাদের বাদানুবাদ উপভোগ করছিলেন। মিঃ ফক্সের মুখ থেকে এ ধরনের ব্যঙ্গাত্মক উক্তি শোনার পর মিঃ গুলজার বললেন, মিঃ ফক্স পরোক্ষভাবে মিঃ দ্যটের সঙ্গে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয় মিঃ দ্যটের স্পোর্টিং স্পিরিটে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত।

মিঃ গুলজারের প্রস্তাবকে সমর্থন জানাল মিঃ রিচি রোস্টার ও মিঃ গোপী গর্ডন।

আমি দেখলুম আর নিরব থাকা শোভা পায় না। মিঃ গুলজারের উদ্দেশ্যে বললুম, আপনি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। ষাঁড়ের জিব চুষে চুষে বাছাধনের গায়ে

কত শক্তি জন্মেছে একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই। আমার মতামত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে করতালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

আমার অনুরোধ মত মিঃ গুলজার আলাবামা ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে লড়াইয়ের ব্যবস্থা করলেন। এ খবর বেশিক্ষণ চাপা রইল না। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে, চেনা অচেনা হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে ঘন ঘন ফোন আসতে লাগল। সকলের এক প্রশ্ন। জো লুইয়ের সাথে না লড়ে আপনি ওই দুগ্ধপোষ্য শিশুটার সঙ্গে কেন লড়ছেন?

আমি উত্তরে বললুম, 'পিপীলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে' একটা কথা আছে জানেন? ড্যাম্ ফক্সেরও ডানা উঠেছে। সেই ডানা দুটো ভাঙবার জন্যই রাজী হয়েছি বলে লম্বুদা মুচকি মুচকি হেসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট লম্বুদা নির্বিকারচিত্তে সিগারেট টানাতে হিল্লোল বিরক্ত হয়ে বলল, লম্বুদা তারপর—

লম্বুদা সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, খবর পেলুম, ড্যাম্ ফক্স নিয়মিত আদা-ছোলা খেয়ে দিনে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা অনুশীলন করছে। আর জো লুই নাকি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে এক্সট্রা স্পেশাল আপার্-কাট্ মারা শেখাচ্ছে।

শুনে আমার হাসি পেল। মনে মনে বললুম, বে-চা-রা। আমি কিন্তু একদিনে এক ঘণ্টাও অনুশীলন করলুম না। প্রতিদিন সকালে দশ মিনিট স্কিপিং করে কেবল বডি ফিট রাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

লড়াইয়ের দিন সকাল সকাল উঠে আধঘণ্টা ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করে নিলুম, তারপর এক কিলো পেস্তাবাদাম আর এক পোয়া আখের গুড় মোষের দুধ দিয়ে বেটে খেতেই, শরীরখানা নতুন কারেন্সি নোটের মতন মচমচ করে উঠল।

শূন্যে গোটাকয়েক ঘুষি ছুঁড়ে কলকব্জাগুলোর জং ছাড়িয়ে সেই যে বিছানায় গিয়ে শুলুম, উঠলুম বিকেল পাঁচটায়।

পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটে লড়াই শুরু হবার কথা। আড়মোড়া ভেঙে গেঞ্জি, প্যান্ট আর গ্লাবস্ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে।

এদিকে ড্যাম্ ফক্স রাত পোহাতে না পোহাতেই হাজির হয়েছিল ওখানে। এবং মঞ্চের ওপর স্যাডো ফাইট প্র্যাক্টিস্ করছিল। পাঁচটার মধ্যে আমি সেখানে না পৌঁছতে, মোটামুটি সবাই ধরে নিয়েছিল আমি ভয় পেয়ে পিটটান দিয়েছি। আমার আবির্ভাবে তাই হৈচৈ পড়ে গেল ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে। সবাই ছুটে এসে আমাকে ঘিরে ধরে বললেন, 'হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার্ মিঃ দ্যট্?'

'নাথিং' বলে আমি হাসতে হাসতে গ্লাবস্ পরে এগুতে লাগলুম মঞ্চের দিকে।

পাঁচটা ছাপ্পান্ন মিনিটেই লড়াই শুরু হল। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা। ফক্সের চ্যাংড়া সমর্থকেরা নানা রকমের কুস্বর করে আমাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি সেই পাত্তরই নই, হেসে হেসে গোড়াতে মুষ্টিযুদ্ধের আধুনিকতম কসরৎগুলো দেখাতে লাগলুম।

ফক্স ভাবল আমার এগুবার সাহস নেই বলেই এইসব কসরৎ দেখাচ্ছি। অতএব এই সুযোগ কোনক্রমেই ছাড়বার নয়। ফক্স হঠাৎ প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর এবং আমার থুতনিসহ মুখের জিওগ্রাফি পালটে দেবার জন্য পর পর আপার্-কাট্ মারতে লাগল।

পর পর সাতখানা আপার্-কাট্ আমি নস্যাৎ করে দিলেও অষ্টমখানা পারলুম না। গ্লাবসের খোঁচায় থুতনিটা সামান্য ছড়ে গেল।

ফক্সের সমর্থকেরা কি ভাবল কে জানে, তারা 'অ্যাটাক্—অ্যাটাক্' বলে চিৎকার করতে শুরু করল। ফলে ফক্স আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল এবং দুহাতে দুমদাম ঘুষি চালিয়ে আমাকে রিং-এর বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

ফক্সের ফসফসানি শুনে স্পষ্টই বুঝতে পারলুম, ফক্স ধৈর্যচ্যুত হয়েছে। এখুনিই সে লড়াইয়ের ফয়সালা করতে চায়।

আমি দেখলুম আর বিলম্ব করা উচিত নয়। ওষুধ দেবার সময় হয়ে গিয়েছে। বাঁ পায়ে ভর করে পজিসানটা ঠিক করে নিলুম, তারপর বুক ভরে দম নিয়ে পাঁচফুট লাফিয়ে ফক্সের মাথার ব্রহ্মতালুতে মারলুম একটা প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ঘুষি। সংক্ষেপে যাকে 'লোয়ার্-কাট্' বলে তাই। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে লড়াই খতম। লম্বুদা আবার ধূমপানে মন দিলেন।

আমাদের আর অনুরোধ করবার দরকার হল না। লম্বুদা বললেন, ড্যামের ওই সাত ফুট দেহখানা ঘুষির চাপে কুঁকড়ে সাড়ে তিন ফুট হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার হাঁটুরও নিচে।

ফক্স কিন্তু দুর্ঘটনায় পড়েও ক্ষান্ত হল না। সমানেই সে ঘুষি ছুঁড়ে যেতে লাগল। আমি তখন রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম, ভাবী বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা বন্ধু সম্ভবতঃ জানে না বক্সিং-এ কোমরের নিচে ঘুষি মারা আইনবিরুদ্ধ।

রেফারি একটু অন্যমনস্কই ছিল। আমার বক্তব্য শোনামাত্রই সে তখুনিই এগিয়ে এসে আমার হাতটা তুলে ধরে 'বিজয়ী' ঘোষণা করল।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং রেনকোট ও টুপি গায়ে জড়িয়ে বললেন, বৃষ্টিটা ধরেছে চলি। ইস্তাম্বুল থেকে আজ আবার একটা ট্রাঙ্ককল আসার কথা আছে বাড়িতে।

লম্বুদা চলে যেতে, চমক কানের ওপর হাত বুলোতে লাগল। হিল্লোল বললে, কী ব্যাপার?

চমক গম্ভীর হয়ে বললে, কান দুটো আছে না ভেতরে ঢুকে গিয়েছে পরীক্ষা করে দেখছি।

---

# ছক্কা

লম্বুদা ঘরে ঢুকে টিফিন-ক্যারিয়ার আর ওয়াটার্-বটল্‌টা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে টান টান হয়ে শুয়ে বললেন, টু ট্যায়ার্ড। এক গ্লাস কনকনে ঠাণ্ডা জল খাওয়াও দেখি।

চমক পাশেই একটা চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ সহকারে একটা খেলার কাগজ পড়ছিল। লম্বুদা জল চাইতে, কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে সে উঠে দাঁড়াল এবং কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে লম্বুদার সামনে রাখল।

লম্বুদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিলের মত ছোঁ দিয়ে জলের গ্লাসটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন এবং গালে ও কপালে সেটা বুলোতে বুলোতে বললেন, ইন্ডিয়া আজ বড্ড ভাল খেলেছে। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তুলনা নেই।

লম্বুদার আকস্মিক এই মন্তব্যকে ঘিরে আমরা যখন মুখ চাওয়াচাউই করছি, লম্বুদা গ্লাসের জলটুকু সশব্দে গলাধঃকরণ করে, পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

প্রসঙ্গটা নতুন কিছু না হলেও লম্বুদার মন্তব্যটাকে ঘিরে আমাদের কৌতূহল পুঞ্জীভূত হতে লাগল। লম্বুদা নিবিষ্টমনে সেটা লক্ষ্য করার পর, নাক দিয়ে অনর্গল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, পাতু সেঞ্চুরি করলেও দর্শনীয় মার মেরেছে চাঁদু। ছেলেটা যদি টিকে থাকতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল্ প্লেয়ার হতে পারবে। জীবনে তো অনেক খেলোয়াড়ই দেখলুম, গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারি কে টিকবে আর কে উবে যাবে। লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে পা নাচাতে শুরু করলেন।

হিল্লোল এতক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে লম্বুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। লম্বুদা নিরব হবার সঙ্গে সঙ্গে হিল্লোল উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল, লম্বুদা আপনি খেলা দেখছেন, টিকিট পেলেন কোত্থেকে? একটা সিজিন টিকিটের জন্য আমি তো তিনজোড়া জুতোর সোল খোয়ালুম অথচ বিশ্বাস করুন কোত্থাও পেলুম না।

হিল্লোলের অভিযোগ শুনে লম্বুদা এমনভাবে তার দিকে তাকাতে লাগলেন, মনে হল যেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর দশম আশ্চর্য আবিষ্কার হল। বেশ কয়েক মিনিট ওইভাবে তাকিয়ে থাকার পর, গোঁফের আড়ালে মৃদু হেসে বললেন, আমার পরিচয় তোমরা এখনও সবটুকু জানতে পার নি বলেই এমন প্রশ্ন করতে সাহস করলে। তোমরা বোধ হয় জান না, দরকারী কাজে একবার হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সে বছর কলকাতায় টেস্টম্যাচ পণ্ড হতে বসেছিল। আমি ট্রাঙ্ককলে কর্মকর্তাদের ধমক দিতে তবে টেস্টম্যাচ হয়েছিল ইডেন গার্ডেনে।

লম্বুদা থামামাত্রই বাস্তব সরব হল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, লম্বুদা আপনি বলছেন বটে কিন্তু আমরা যতদূর খবর রাখি, এমন কোনো কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কার কথা শুনি নি তো।

বাস্তবের কথা শুনে লম্বুদা গোল গোল চোখ করে তার দিকে তাকালেন। তারপর হো-হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠে বললেন, 'চাইল্ড্ অব্ ইয়েস্টারডে'—তোমাদের না শোনাটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। তবে হ্যাঁ, তোমরা যখন ক্রিকেট খেল এবং খবরাখবর রাখ, তোমাদের শোনা উচিত ছিল বৈকি।

লম্বুদা থেমে গিয়ে গুনগুন করে একটা পরিচিত টপ্পা গানের সুর ভাঁজতে শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ গুনগুন করার পর যখন আমরা অল্পবিস্তর নড়েচড়ে বসে স্থির হয়েছি লম্বুদা গান থামিয়ে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে টেস্টখেলা বন্ধ হবার খবর শুনেই তোমরা আশ্চর্য হলে। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

তৃতীয় অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে পারিনি বলে তিন ঘণ্টা স্থগিত রাখা হয়েছিল। লম্বুদা তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য চক্রাকারে সকলের মুখের ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন।

চমক এতক্ষণ একটা মশা মারতে ব্যস্ত ছিল। মশাটা ঘুরেফিরে তার গায়ে বসছিল।

লম্বুদার মুখে অলিম্পিক গেমস্ পেছিয়ে দেবার কারণ শুনে মশাটাকে রেহাই দিয়ে লম্বুদার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, ঘটনাটা যেন কোন সালে ঘটেছিল লম্বুদা?

চমকের প্রশ্নে লম্বুদা কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করলেন না। বেশ নির্বিকারচিত্তেই পর পর কবার সিগারেটে টান দিলেন, তারপর নাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সালটা ঠিক খেয়াল নেই। তবে তোমরা যদি নেহাতই উৎসুক হও তৃতীয় অলিম্পিকটা কোন সালে হয়েছিল জেনে নিও। অলিম্পিকের ওপর লেখা কোনো বই পেলে তা থেকেও অবশ্য জানতে পার এবং বলা বাহুল্য আমার নামও সেখানে দেখতে পাবে।

লম্বুদা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে কথাগুলো বলে, মটমট করে হাতের আঙুলগুলো মটকাতে লাগলেন। আঙুল মটকান শেষ করে হিল্লোলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা টেস্টখেলার টিকিট পাও নি, আগে বল নি কেন? আমি তো ডেকে ডেকে হাজার চারেক টিকিট বিলোলুম। যাকগে এখন আর অনুশোচনা করে লাভ নেই। ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন তোমাদের টেস্টখেলার টিকিটের প্রয়োজন হয়, অন্ততঃ একদিন আগেও আমাকে জানালে আমি কন্‌সেসনে তোমাদের টিকিট যোগাড় করে দেব।

উত্তরে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে হিল্লোল নিরব হয়ে গেল।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ সকলে নিরব থাকার পর চমকই প্রথম মুখ খুলল। বলল, লম্বুদা, পাতৌদির নবাবের সেঞ্চুরিখানা কি রকম দেখলেন বলুন। রেডিওতে রীলে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল নবাব বেশ দর্শনীয় সেঞ্চুরি করেছে।

লম্বুদা যেন কথাগুলো শুনতেই পান নি এমন ভান করে নির্বিকারচিত্তে সিগারেট টানতে লাগলেন, আর মুখের মধ্যে ধোঁয়াগুলো জমিয়ে জমিয়ে নানা রকমের ধোঁয়ার খেলা দেখাতে লাগলেন। লম্বুদার কাছ থেকে একটা জবাবের আশা সকলেই করেছিল। হঠাৎ তাঁর এই নির্বিকার ভাব দেখে সকলেই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

নতুন কোনো প্রসঙ্গ তুলে এই অস্বস্তিকর নিরবতা ভঙ্গ করার জন্য সকলেই উৎসুক, ঠিক সেই মুহূর্তে একঝলক মুচকি হেসে লম্বুদা সরব হলেন। চমকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এক কাপ ডবল হাফ্ খাওয়াতে পার, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।

চা পেটে না পড়লে যে লম্বুদার মেজাজ খোলে না সেটা আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা ছিল। লম্বুদা প্রস্তাব করামাত্রই চমক হেসে বললে, নিশ্চয়ই। চমক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই লম্বুদা পকেট থেকে একখানা কড়কড়ে পাঁচটাকার নোট বের করে, তার ওপর তিনবার টোকা মেরে শব্দটা সকলকে উপভোগ করালেন। তারপর চমকের হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমরা যদি কেউ চা খেতে চাও খেতে পার। আমার কোনো আপত্তি নেই।

চা-পানে সকলে তেমন অভ্যস্ত না হ'লেও এ সুযোগ কেউই ছাড়ল না। চমক চমকের মধ্যে গুনতির কাজ শেষ করে দৌড়াল চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে।

লম্বুদাকেই প্রথম চা দেওয়া হ'ল। চায়ের কাপটা মুখে ধরে স-র্-র্-র্ স-র্-র্-র্ করে লম্বুদা প্রায় তিন-চতুর্থাংশের মত চা কাপ থেকে পেটের ভেতর চালান করে পায়ের ওপর পা তুলে দ্রুত নাচাতে লাগলেন। বাকি চাটুকু পেটে ঢোকাতেও লম্বুদার তেমন সময় লাগল না। চায়ের কাপটা টেবিলের তলায় রাখতে রাখতে তিনি বললেন, চায়ের মত চা খেলুম আজ খেলার মাঠে। টি টাইমে প্যাভিলিয়নে বসে লালার সাথে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছি, হঠাৎ বর্ধমানের মহারাজা এসে প্যাভিলিয়নে ঢুকলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমার হাত ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলে বললেন, অনেক কথা আছে। চল একটা জায়গা খুঁজে বসি। ফ্লাস্কে আমার চা আছে। অসুবিধা হবে না।

লালাকে হাত নেড়ে আমি উঠে গেলুম মহারাজার সাথে। পুলিশ-ব্লকের একাংশ খালি পড়েছিল। ওখানে গিয়ে দুজনে বসতেই, মহারাজা ফ্লাস্ক খুলে নিজে এক কাপ চা নিলেন এবং আমাকে এক কাপ চা দিলেন।

চায়ের কাপ হাতে নিতেই একটা চাপা গোলাপফুলের গন্ধ নাকে এল। মনে হল আমি যেন একটা গোলাপ বাগানে বসে আছি।

মহারাজা পর পর কবার কাপে চুমুক দিয়ে 'ঘড়াৎ' করে মুখে একটা শব্দ করলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, লম্বমান চা-টা কি রকম খেলে বল?

উত্তরটা ইংরেজী, বাংলা না হিন্দী কোন্‌টায় দেওয়া সমীচীন হবে যখন ভাবছি, মহারাজা নিজেই সরব হয়ে উঠলেন। বললেন, চা আর গোলাপ গাছের কাটিং জুড়ে

বসিয়ে এই স্পেশ্যাল চাষ করিয়েছি। এক কাপ এই চা খেলে সাতদিন মুখে স্বাদ থাকে।

চায়ের কাপ মুখে দেওয়ামাত্রই আমি সে কথা বুঝতে পেরেছিলুম। মহারাজা তার পুনরাবৃত্তি করতে, আমি বললুম, চা খাবার আগেই আমি সে কথা টের পেয়েছি

সিগারেটটা অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গিয়েছিল। লম্বুদা আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে চমকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ, তখন যেন কি জানতে চাইছিলে?

চমক মুখ তুলে তাকাল লম্বুদার দিকে। বলছিলুম, পাতৌদির নবাবের সেঞ্চুরিখানা কি রকম দেখলেন?

লম্বুদা একটু মুচকি হেসে বললেন, ধুৎ! একে কি আর সেঞ্চুরি বলে, দশ ঘণ্টা লাগল একশ' চার রাণ করতে! আমি যদি সিলেকশন্ বোর্ডে থাকতুম, বাছাধনকে আর ইডেনের গেট পেরোতে দিতুম না। নেহাত ইন্ডিয়ায় জন্মেছিল তাই এ যাত্রা বর্তে গেল।

লম্বুদার মন্তব্য পুরোপুরি না হলেও, কিছুটা না মেনে উপায় ছিল না। প্রায় দেড়দিন ধরে একটা সেঞ্চুরি সত্যিই বিরক্তিকর। তাহলেও ইন্ডিয়ার প্রাথমিক বিপর্যয় মুহূর্তে নবাব যদি এভাবে না খেলত তাহলে ড্র তো দূরের কথা, ইনিংস্ ডিফিট রোখা যেত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চমক সেই কথাটা বলবার জন্য হাঁ করতেই লম্বুদা বললেন, বুঝেছি, বলবার দরকার নেই। পাঁচ বছর বয়েস থেকে আমি ক্রিকেট খেলছি। কোন্ অবস্থায় কিভাবে খেলতে হয়, নতুন করে আর তোমাদের কাছ থেকে জানবার দরকার নেই। তবে কি জান, ক্রিকেট যেহেতু গেম্ অফ্ চান্স, এই ধরনের ক্রিটিক্যাল্ মোমেন্ট চিরকাল এসেছে এবং আসবেও। সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে অতিক্রম করাটাই ক্রিকেটের চার্ম বা খেলোয়াড়ের ধর্ম। সে ধর্ম পালনে যদি কেউ অক্ষম হয়, তাকে নিশ্চয়ই সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রাডম্যান্‌কে যার জন্য আমি চিরকাল ভালবাসতুম। ওর মাথা ও হাতের কাজ একসাথেই চলত বলেই ও বিশ্ববিশ্রুত হতে পেরেছিল।

চমক দেখল লম্বুদা পাতৌদির কৃতিত্ব মানতে কিছুতেই রাজী নন। তাছাড়াও তিনি যে রকম কাঠগোঁয়ার, বোঝালেও যে বুঝবেন এমন কোন ভরসাও নেই। অগত্যা প্রসঙ্গ পালটে চমক বলল, লম্বুদা আপনি সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব মানতে যদি একান্তই গররাজী থাকেন, তাহলে চুরানব্বই রানের মাথায় তার ছক্কা মারাটাকে নিশ্চয়ই প্রশংসা করবেন। আপনি তো বিশ্বের রথী-মহারথীদের অনেকের খেলা দেখেছেন, বলুন হাইকোর্টের মাথা টপকিয়ে কাউকে এমন ছক্কা মারতে দেখেছেন কখনো?

সকলে আশা করেছিল লম্বুদা এবারে পাতৌদির এই কৃতিত্বটা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেবেন, কিন্তু কারুর আশাই পূরণ হল না। লম্বুদা নিজের মনেই হাসতে লাগলেন।

হিল্লোল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, লম্বুদা আপনি হাসছেন বটে কিন্তু হাসির

কথা তো কিছুই হয় নি। আপনার এই অকারণ হাসির কারণ কি জানতে পারি?

হিল্লোলের প্রশ্ন শুনে লম্বুদার তেমন কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। বরং হাসির মাত্রাটা আর এক ডোজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, পাতুর এই ছক্কাটাকে নিয়ে তোমরা যদি এত হৈচৈ কর, ১৯২৩ সালে মেলবোর্নে কিথ্ মিলারের বলে যেটা মেরেছিলুম সেটা তাহলে কি?

লম্বুদার কথা শুনে এবার গুঞ্জন উঠল ঘরের মধ্যে, আমি আর কৌতূহল চাপতে পারলুম না। বললুম আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তেইশ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাটা আমাদের শোনাবেন নাকি?

আমার অনুরোধ শোনামাত্রই লম্বুদার গোঁফের ডানা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতের আঙুল দিয়ে টাকের মধ্যিখানটা চুলকোতে চলকোতে বললেন, তোমাদের যখন এতই কৌতূহল শোনাতে আমায় হবে বৈকি।

লম্বুদা নড়েচড়ে বেশ গুছিয়ে বসলেন চেয়ারে। তারপর চোখ বুজে বেশ নির্বিকার ভাবেই পা নাচাতে লাগলেন। লম্বুদার কাণ্ড দেখে সকলেই যখন মনে মনে অল্পবিস্তর বিরক্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা সরব হলেন। তখন আমার কতই বা বয়েস, হার্ডলি ষোল কিংবা সতরো।

দাদুর ভেড়ার ব্যবসা ছিল। ভাল জাতের ভেড়া কেনবার জন্য প্রায়ই তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে হত। সেবার যাবার সময় দাদু আমাকে বললেন, কীরে আমার সঙ্গে যাবি নাকি?

গরমের ছুটি থাকার দরুন তখন স্কুল বন্ধ ছিল। ভাবলুম মন্দ কি। দাদুকে বললুম যেতে পারি, যদি মেলবোর্ন শহরটা ঘুরিয়ে দেখাও। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ওটা দেখবার।

দাদুর কোনো আপত্তি ছিল না। আমরা অস্ট্রেলিয়ার পথে রওনা হলুম।

মেলবোর্নে বেড়াতে গিয়ে প্রথমেই হাজির হলুম মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের তাঁবুতে। আসন্ন ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্টম্যাচ উপলক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা নেট প্র্যাকটিস্ করছিল।

আমি দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছি হঠাৎ কিথ্ মিলার আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, খোকা খেলতে জান?

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, একটু—একটু।

মিলার আমার হাতে একটা ব্যাট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি বল দিচ্ছি, দেখি কি রকম ঠেকাতে পার!

আমি ব্যাটটা সাপটে ধরে উইকেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, মিলার আমাকে পর পর আন্ডার-রান বা মেয়েলী বল দিতে লাগলেন। ভাবলেন বোধ হয় ওতেই বাজিমাত হবে।

আমি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নই। পর পর তাঁর বল মেরে ছাতু করতে লাগলুম। যা দেখে মিলারের চোখ ট্যারা। দুধের মত ধবধবে সাদা গাল দুটো তাঁর আপেলের মত লাল হয়ে উঠল।

এক মিনিট থ মেরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর শূন্য হাতখানা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলেন।

মিলার যে আর আন্ডার-রান বল দেবেন না স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। আমিও তাই মনে মনে সে বলের জবাব দেবার জন্য তৈরি হতে লাগলুম।

মিলার হাত দুখানা পেছনে নিয়ে গিয়ে তিনি আঙুলে নানা কারসাজি করে বলটা আঁকড়ে ধরলেন, তারপর বার বার জিবের ডগায় ঠেকিয়ে প্যান্টের কাপড়ে ঘষতে লাগলেন।

প্রায় দশ মিনিট পাঁয়তারা কষার পর, মিলার বলটা বাগিয়ে ধরে গুনে গুনে পঁচিশ হাত দৌড়ে এসে বল দিলেন উইকেট লক্ষ্য করে।

আমিও বলের পিচ পড়তে দিলুম না। তার আগেই বল হাওয়া—লম্বুদা থেমে গিয়ে মুচকি হাসতে লাগলেন।

লম্বুদার বলা যে শেষ হয় নি সেটা অনুমান করেই আমরা বললুম, লম্বুদা প্লীজ্ আর ঝুলিয়ে রাখবেন না, শেষ করুন।

লম্বুদা আর একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণ বরাবর আকাশে একখণ্ড মেঘের ভেতর থেকে হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁচ ঝরে পড়তে লাগল।

মিলার হতভম্ব হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে যখন এই রহস্যের কূলকিনারা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি এরোপ্লেন বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। প্লেনের জানলাগুলোর মধ্যে একটির কাঁচ ভেঙেচুরে একশেষ। আর সেই ভাঙা কাঁচের ফাঁকে ডিউজ বলটা সেঁটে রয়েছে।

মিলার বলটা চিনতে পেরেই মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করলেন, তারপর ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যে রণজিৎ সিংজীর দেশের ছেলে বুঝতে পারি নি। তোমাকে শিশু ভেবে আমি যে ভুল করেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। লম্বুদা থামতেই বাস্তব বলে উঠল, জ-ল!

সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই বলে উঠল, আমরাও খাব।

সাবই যখন জল খেতে ব্যস্ত, লম্বুদা হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলি কেমন, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আজ চায়ের নেমন্তন্ন আছে।

লম্বুদা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমরা প্রত্যেকেই এক গ্লাস করে জল খেয়ে ফেললুম।

---

# লাঠি

স্বাধীনতা দিবসের ছুটি থাকার জন্য আড্ডাটা সকাল সকালই বসেছিল। অন্যান্য দিন দু-একজন অনুপস্থিত থাকলেও আজ আর কেউ অনুপস্থিত হয় নি। সংক্ষেপে হাউস ফুলই বলা চলে।

সকলে এলেও আড্ডার শিরোমণি লম্বুদা তখনো এসে হাজির হন নি। যদিও আসার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। লম্বুদার বিলম্বের কারণ নিয়ে যখন মোটামুটি আমাদের মধ্যে ছোটখাট ধরনের একটা গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা হাতে একগাছা বেলফুলের মালা আর এক বাক্স খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর খাবারের বাক্সটা নামিয়ে রেখে, বেলফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বললেন, খ্যাতনামা হওয়ার এত জ্বালা জানতুম না। সকাল থেকে নিরানব্বইটা ক্লাবে পতাকা উত্তোলন করেছি। হাত দুটোর আর কিছু নেই। দড়ি টেনে টেনে অসাড় হয়ে গিয়েছে। এখন প্যারালাইজড্ না হলেই বাঁচি।

লম্বুদার কথা শুনে আর কারুর বুঝতে বাকি রইল না। এই ফুল এবং খাবারের উৎস কি! তা সত্ত্বেও আমরা না বোঝার ভান করে বললুম, লম্বুদা, এই বাক্সের সাথে আপনার সভাপতিত্বের কি কোনো সম্বন্ধ আছে?

লম্বুদা গোল গোল চোখ করে বললেন, নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর আসবে কোত্থেকে? আমার তো আর ময়রা শ্বশুর নেই, রাত পোহাতেই তত্ত্ব পাঠাবে!

গোড়াতেই তো বলেছি সকালে নিরানব্বইটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছি। বিকেলের জন্য একটা রেখেছিলুম! ওরা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। আমিও রাজী হই নি। পেটটা তো আমার। ফাটলে কি ওরা জুড়ে দিয়ে যাবে!

অগত্যা ওরা এই খাবারের বাক্সটা আমার ট্যাক্সীতে তুলে দিয়ে বলল, লম্বমানবাবু আপনি যে আজ আমাদের মনে কত বড় দাগা দিয়ে গেলেন, তা আমরা জানি আর ভগবান জানেন।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, হতাশ হয়ো না। আগামী বছরে দু'বছরের খাওয়া একসাথে বসে খেয়ে যাব। লম্বুদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

বাক্সটা খুলে যে খাবার পাওয়া গেল, তাতে ছ'মাসের শিশুরও পেট ভরবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লম্বুদার অনুরোধক্রমে আমরা সেগুলোকে প্রসাদকণায় পরিণত করে চেখে চেখে খেতে লাগলুম। আমরা যখন সকলেই লম্বুদার দেওয়া প্রসাদকণা গ্রহণে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন

এবং ঘন ঘন ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাদের উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

খাওয়ার পাট চুকতে বাস্তব প্রশ্ন করল, আচ্ছা লম্বুদা, বৈকালিক অনুষ্ঠানটি কাদের ছিল?

লম্বুদা চোখ বুজে বললেন, তোমরা জাতীয় ব্যায়াম সমিতির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষ্যে আজ ওদের লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা ছিল। পুলিনদা যতদিন জীবিত ছিলেন উনিই বিচারকের কাজ করতেন। উনি মারা যাওয়ার পর থেকে আমার ঘাড়েই ওই দায়িত্ব চেপেছে।

লম্বুদা থামতে বাস্তব আবার সরব হয়ে উঠল। বললে, লম্বুদা, লাঠিয়াল হিসেবে পুলিনবাবুর যে অসাধারণ কীর্তি-কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত আছে, সেগুলো কি সব সত্যি?

লম্বুদা কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, যে—ম—ন—

বাস্তব বলল, ধরুন যেমন শোনা যায়, উনি লাঠি ঘুরিয়ে হাজার লোকের জনতা আটকেছিলেন, বন্দুকের গুলি আটকেছিলেন ইত্যাদি।

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, চোখে দেখি নি বটে তবে সত্য। এবং ইংরেজ-সরকার তার জন্য তার কবজির শিরাও কেটে দিয়েছিলেন।

চমক এতক্ষণ নিরবে বাস্তব এবং লম্বুদার কথোপকথন শুনছিল। লম্বুদা থামতেই চমক প্রশ্ন করল, আচ্ছা লম্বুদা, লাঠি ঘুরিয়ে গুলি আটকানো কি সম্ভব? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

লম্বুদা চমকের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে এক মিনিট তাকিয়ে থেকে, গোঁফটা মৃদু নাচিয়ে বললেন, লাঠি দিয়ে বন্দুকের গুলি আটকানোই যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি লাঠি ঘুরিয়ে বোম্বার্ট সাহেবকে মারলুম কি করে?

পুলিনবাবুর লাঠি ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকানোর খবর প্রায় সকলেরই জানা ছিল; তাই এই প্রসঙ্গে কথা উঠতে কারুর মধ্যে বিশেষ কোনো কৌতূহলের সঞ্চার হয় নি। কিন্তু লম্বুদার শেষোক্ত মন্তব্যের সাথে সাথেই সকলেই নড়েচড়ে বসল এবং ঘরের মধ্যে এক মৃদু গুঞ্জন সৃষ্টি হ'ল।

কানন বললে, লম্বুদা আপনি লাঠিখেলাও জানেন তাহলে! সত্যিই ভগবানের অপার করুণা আপনার ওপর। যদি বলতে কোনো বাধা না থাকে, পুণ্য স্বাধীনতা-দিবসে আপনার সেই ঐতিহাসিক কাহিনীটা বলুন না আমাদের।

লম্বুদা চোখ ঘুরিয়ে সকলের আগ্রহ প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর নিভে যাওয়া সিগারেটটিতে পুনরায় অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, যদিও অস্বাভাবিক রকমের টায়ার্ড, তাহলেও আজ তোমাদের আমি বিমুখ করব না। বলছি, শোন—

লম্বুদা প্রায় পাঁচ মিনিট চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন, তারপর মুচকি হেসে বললেন,

তখন দেশে স্বাধীনতার দাবীতে 'ইংরেজ হটাও' আন্দোলন পুরোদমেই চলেছে।

আমরা কলেজের ছাত্র। রক্ত গরম।

শহর ও গ্রামাঞ্চল বিদ্রোহী গুপ্ত সমিতিতে ভরে গিয়েছে। গুপ্ত সমিতির মধ্যে দিনরাত কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল্ মিটিং আর অস্ত্রশিক্ষার তালিম চলেছে। সভ্যদের প্রতি বিপ্লবীদের নির্দেশ—ডাক এলেই বুক পেতে দিতে হবে। কোনোরকম ওজর আপত্তি চলবে না।

আমি তখন শহরাঞ্চলের কোনো একটি গুপ্ত সমিতির সর্বময় কর্তা। আমার অধীনে পঞ্চাশজন তরুণ-তরুণী নিয়মিত লড়াইয়ের তালিম নিচ্ছে। কলেজের নাম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে আমি দিনরাত ওখানেই পড়ে থাকি।

আন্দোলন তখন চরমে। হঠাৎ একদিন কেন্দ্রীয় গুপ্ত সমিতি থেকে নির্দেশ এল, প্রেসিডেন্সী জেলের অফিসার-ইনচার্জ জন্ বোম্বার্টকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দাও। রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বোম্বার্ট অমানুষিক অত্যাচার করছে।

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই আমি সভ্যদের জরুরী মিটিং কল্ করলুম। সভ্যরা উপস্থিত হ'তে আমি তাদের সেই নির্দেশ দেখিয়ে প্রশ্ন করলুম—তোমরা কে কে বোম্বার্টকে মারার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত?

প্রেসিডেন্সী জেলের ইন্‌চার্জ শুনে সকলেই আমতা আমতা করতে লাগল।

আমি বললুম, তোমরা ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে?

ওরা সকলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, মোটেই নয়। জীবনের জন্য আমরা পরোয়া করি না। আশঙ্কা কেবল বোম্বার্ট সাহেব যেভাবে খাঁচার মধ্যে থাকেন, তাঁর নাগাল পাব কি করে?

সভ্যদের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হ'লেও আমি সমর্থন করতে পারলুম না। স্বাধীনতা-সংগ্রাম তো দই-চিড়ে-কলা নয় যে মাখলেই ফলার হয়ে যাবে। এর জন্য অনেক সাধ্যিসাধনা করতে হয়।

সকলকে পেছু হটতে দেখে বললুম, হুম্, তোমাদের দ্বারা এ কাজ হবে না বলেই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি নিজেই এর দায়িত্ব নিলুম।

মিটিং ভেঙে যেতে ভাবতে লাগলুম কি উপায়ে বোম্বার্টকে সরানো যায়। ভদ্রলোকের যদি রাস্তায় বেরুনো অভ্যেস থাকত, তাহলে তো কথাই ছিল না। একবার ঘোড়া টিপেই মাথার খুলিটা চন্দ্রে পাঠিয়ে দিতুম, কিন্তু তার তো উপায় নেই। কালেভদ্রে যাও বা বেরোন, সামনে পিছনে এত পুলিশ থাকে যে ছুঁচ গলবার পর্যন্ত উপায় থাকে না, বন্দুকের গুলি তো দূরের কথা।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, জেলে না ঢুকলে বোম্বার্টকে মারা সম্ভব হবে না। অতএব যে করেই হোক জেলে যেতেই হবে।

একদিন সকালবেলা জেলের সামনে রাস্তায় পায়চারি করছি, হঠাৎ দেখি বিপরীত দিক থেকে একটা লালমুখো সাহেব হনহন করে হেঁটে এগিয়ে আসছে। এই সুযোগে

সঙ্গে সঙ্গে আমি ডান পা-খানা শূন্যে দুবার আন্দোলিত করে পায়ের স্ট্রেনথ্‌টা বাড়িয়ে নিলুম। তারপর সাহেব আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ামাত্রই চট্‌ করে ঘুরে গিয়ে সাহেবের পশ্চাদ্দেশে সজোরে মারলুম একখানা বিরেশি পাউন্ডের লাথি। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবটা পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে 'গড্‌ সেভ্‌ মি' বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করল।

জেলের লালমুখো গার্ড দুটো দেশওয়ালির এ দুর্দশা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল সেখানে। একজন এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। আর একজন সেই সাহেবের হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব কিন্তু উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। যতবারই দাঁড়াতে গেলেন, ততবারই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন পথেতে।

গার্ড দুটো তখন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সী জেলের ভেতরে।

রাজনৈতিক অপরাধীদের দ্রুত বিচারের জন্য তখন জেলের মধ্যেই আদালত থাকত। আমাকে ওরা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হাজির করল বিচারকের সুমুখে। বিচারক সব ঘটনা শুনে, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, তোমার সাহস দেখে বলিহারি যাই। সামান্য প্রজা হয়ে তুমি রাজার পশ্চাতে লাথি মার! তোমাকে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলুম।

বিচারকের রায় শুনে আমি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, 'মে গড্‌ ব্লেস্‌ ইউ।'

পরের দিন কাক না ডাকতে ডাকতেই একজন দারোগা আমাকে টেনে নিয়ে গেল জেলের সংলগ্ন বাগানে। একটা একমণি দুরমুশ দিয়ে বললে, উঁচুনিচু জায়গাগুলো পিটে সমান কর। লম্বুদা হঠাৎ নিরব হয়ে ধূমপানে মন দিলেন।

চমক বললে, লম্বুদা বন্দীদের দিয়ে মাটি কোপাবার গল্প তো অনেক শুনেছি। কিন্তু মাটি পেটাবার গল্প তো কখনো শুনি নি।

লম্বুদা ধূমপান বন্ধ করে মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ তোমরা ঠিকই শুনেছ। ওরা একদলকে দিয়ে খোঁড়ায় আর একদলকে দিয়ে পেটায়।

লম্বুদা এমন গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বললেন, যেন উনিই এ প্রথার প্রচলন করেছিলেন।

লম্বুদা নিরব হতে হিল্লোল বললে, লম্বুদা তারপর—

লম্বুদা চোখ বুজে পর পর কটি জোরালো টান দিয়ে বললেন, মাঠ দুরমুশ করার ফাঁকে ফাঁকে বোম্বার্ট সাহেবের কোয়ার্টারের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলুম।

বোম্বার্ট সাহেব যে একজন দুঁদে লোক এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি যখন মাঠ দুরমুশ করতুম, বোম্বার্ট সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতেন যা দেখে রাগে আমার দেহের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠত এক এক সময় মনে হত দুরমুশের লোহাটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ওঁর মুখে মেরে থোতা মুখ ভোঁতা করে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হত, তাতে বড়জোর সাহেবের অঙ্গহানিই হবে তার বেশি কিছু হবে না। আর আমি তো সে সঙ্কল্প নিয়ে আসি নি। আমার সঙ্কল্প আরো বড়।

মনের মত সুযোগ খুঁজি কিন্তু সুযোগ আর আসে না। এদিকে গরম পেরিয়ে বর্ষা, বর্ষা পেরিয়ে শীত এসে গেল।

ডিসেম্বর মাস আসতেই বোম্বার্ট সাহেবের কোয়ার্টার সাজানো গোছানো শুরু হল। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষেই যে এই প্রস্তুতি, সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। আমি ভাবলুম এই চান্স। বড়দিন উপলক্ষ্যে কোন্ না সাহেব একটু অসতর্ক থাকে। এই সুযোগ যে করেই হোক কাজে লাগাতেই হবে।

বড়দিনের দিন সন্ধ্যেবেলা সাহেবের কোয়ার্টার সরগরম। নাচগান আর হৈ-হল্লা চলতে লাগল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। আমি কয়েদখানার মধ্যে বসে বসে সব শুনতে লাগলুম। দেখতে দেখতে রাত কেটে গেল। ভোরে কাক ডাকবার সাথে সাথেই একটা সিপাহী এসে আমাকে গারদ থেকে বের করে দুরমুশটা হাতে দিয়ে বললে, মাটি পিটগে যা।

দুরমুশ নিয়ে মাঠে এসে মাটি পিটলেও, আমার নজর ছিল বোম্বার্ট সাহেবের কোয়ার্টারের ওপর। অতিথিরা সকলেই চলে গিয়েছে। কোয়ার্টার নিঝুম নিস্তব্ধ। কেবল বোম্বার্ট সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে।

এত ভোরে বোম্বার্ট সাহেব কি করছেন দেখবার জন্য কৌতূহল হল। বোম্বার্ট সাহেবের ঘরের প্রায় সুমুখেই যে ল্যাংড়া আম গাছটা ছিল, তরতর করে উঠে গেলুম তার ওপরে।

গাছের মগডালে উঠে দেখলুম, বোম্বার্ট সাহেব টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে আর তার চারপাশে গণ্ডাকয়েক স্কচ্ হুইস্কির বোতল আর কাঁচের গ্লাস বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে!

লম্বুদা তিনবার খকখক করে কেশে উঠে বললেন, একবার ভাবলুম খানকয়েক আধলা ইঁট তুলে এনে ছুঁড়ে মারি। আর কিছু হোক না হোক গায়ের ঝালটা তো মিটবে। পরেই মনে হল—না, এভাবে এ সুযোগ নষ্ট করা চলবে না।

কি করা যায় ভাবছি, হঠাৎ মনে হল 'দি আইডিয়া।' ভেতরের কপাট যখন বন্ধ রয়েছে, অনায়াসেই বুদ্ধি খরচ করে ওঁকে মারা যেতে পারে। তরতর করে গাছ বেয়ে নেমে এলুম নিচেতে। দুরমুশ থেকে লাঠিটা খুলে নিয়ে আবার উঠে গেলুম সেই গাছেরই মগডালে। গাছের একটা ডালের ফাঁকে দুপা ঝুলিয়ে সেঁটে বসলুম, তারপর

জানলা বরাবর শূন্যস্থানে এমন প্রচণ্ড বেগে লাঠি ঘোরাতে লাগলুম যে কেল্লা ফতে। বোম্বার্ট সাহেবের মাথা আর টেবিল থেকে উঠল না। উনি ওখানেই চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

লম্বুদা সগর্বে তার কাহিনী বলা শেষ করতেই আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাউই করতে লাগলুম। আমি আর বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারলুম না। বললুম, লম্বুদা আপনি শূন্যে ঘোরালেন লাঠি আর বোম্বার্ট সাহেব ঘরে বসে মরে গেল, এটা কি চন্দ্র আবিষ্কারের মতই আর একটি কোনো আবিষ্কার নাকি?

লম্বুদা ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পিওরলি সায়েন্সের ব্যাপার। অ্যাট্ দি সেম্ টাইম্ কৃতিত্বও বটে। অবশ্য মাথার দানই বেশি।

লম্বুদার মন্তব্য শুনে আসল রহস্যটা কিছুই পরিষ্কার হল না। চমক বললে, লম্বুদা প্লীজ্ একটু খুলে বলুন। জানেনই তো আমাদের মাথা আপনার মত অত পরিষ্কার নয়।

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, আমি এমন জোরে লাঠি ঘোরাতে লাগলুম যে, বোম্বার্ট সাহেবের ঘরের সুমুখে খানিকটা স্থান নিমেষের মধ্যে বায়ুশূন্য হয়ে গেল। তোমরা তো জানই, কোন স্থান বায়ুশূন্য হলে অন্যস্থান থেকে বায়ু এসে সেই স্থান পূরণ করে। এক্ষেত্রে হল কি, বোম্বার্ট সাহেবের ঘরের সুমুখে এই বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হওয়ামাত্রই সাহেবের ঘরের সব বায়ু ছুটে এল সেই শূন্যতা পূরণ করতে।

ওদিকে সাহেবের ঘরের কপাট রুদ্ধ থাকার ফলে অন্যদিক থেকে কোনো বায়ু ঢুকতে পারছিল না তাঁর ঘরের ভেতর।

ঘর বায়ুশূন্য হয়ে যাওয়ার ফলে, অক্সিজেনের অভাব ঘটল। আর অক্সিজেনের অভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। বোম্বার্ট সাহেব কবার মাথা চেলেই লুটিয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর চিরনিদ্রায়।

আমি গাছ থেকে নেমে আবার ভাল মানুষের মত দুরমুশ করতে লাগলুম। লম্বুদা এক মিনিট থামলেন। সিগারেটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, বে-চা-রি পু-লি-শ! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দুঁদে গোয়েন্দা এনেও যখন মৃত্যুর কারণ ধরতে পারল না তখন আপসোসে চুল ছিঁড়তে লাগল। আমি মাঠ দুরমুশ করতে করতে তা দেখতে লাগলুম আর নিজের মনে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলুম।

লম্বুদা বেলফুলের মালাটা নাকে চেপে ধরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বললেন, বেলফুলের গন্ধ বেশ মিষ্টি, না?

আমরা একবাক্যে বললুম, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার গল্পের সৌরভের মত নয়।

'বটে' বলে লম্বুদা মুচকি হাসতে লাগলেন।

---

# চাপ্‌পা

লম্বুদা ঘরে ঢুকে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে পটপট করে ক'টা তুড়ি দিলেন। স্পোর্টস্ অ্যান্ড পাস্টটাইমখানা আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে টান টান হয়ে বসে বললেন, বড্ড টায়ার্ড ফিল্ করছি। দশ মিনিট রেস্ট নেওয়া যাক কী বল! আমি ঘাড় নাড়তেই লম্বুদা নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে নাকে করাতকল চালানো শুরু করলেন।

বই-এর ছবিগুলোয় চোখ বুলিয়ে একটা লেখা সবে পড়তে শুরু করেছি, হঠাৎ বাস্তব, হিল্লোল ও কানন হৈহৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল। আড়চোখে লম্বুদাকে দেখে আমাকে ইশারায় প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার?

লম্বুদা কোত্থেকে ঘুরে ঘুরে এলেন কিছুই বলেন নি আমাকে। ওদের কৌতূহল মেটাবার জন্য বললুম, মাথায় বোধ আপাততঃ কিছু নেই। তাই বিশ্রাম করে ভরে নিচ্ছেন।

আমার জবাব শুনে ওরা তিনজনেই হি-হি-হি করে হেসে উঠল।

ওদের হাসির শব্দে লম্বুদার মিঠে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে বললেন, 'মাই ডিয়ার্ ফ্রেন্ডস্, হোয়াট্ মেকস্ ইউ লাফ্?'

লম্বুদা যে আকস্মিক প্রশ্ন করবেন কেউই আশা করতে পারে নি। তাই তিনজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল। লম্বুদা সোজা হয়ে চেয়ারে বস্‌লেন এবং টাইয়ের নটটা নেড়েচড়ে দেখতে দেখতে বললেন, অকারণে হাসিটা একরকমের ডিজিজ। বাংলাতে যাকে ব্যাধি বলে। আমি যখন নিউজীল্যান্ডে ছিলুম, আমার বাড়িউলীর মেজো ছেলে বিস্কারও ঠিক এইরকম অকারণে হাসির রোগ ছিল। ছেলেটা যখন তখন যাকে তাকে দেখে এইভাবেই হেসে উঠত। এমন কি আত্মীয়স্বজন কেউ মারা গেলেও সে কাঁদতে পারত না। তার হাসি পেত। কি রকম অস্বস্তিকর অবস্থা একবার ভেবে দেখ তো।

বাড়িউলী একদিন আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বললে, মিঃ দ্যট্, আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী লোক যখন সবই বুঝতে পারছেন। আপনার দেশে নানারকমের গাছগাছড়ার ওষুধ পাওয়া যায়। বিস্কার জন্য একটা ওষুধ আনিয়ে দিন না। সব খরচ দেব। বুড়ীর কথা শুনে ভারি দুঃখ হল। গাছগাছড়ার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিছুটির কথা মনে পড়ল। বুড়ীকে বললুম চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি ইন্ডিয়ান্ বিছুটি আনিয়ে দিচ্ছি। তিন দিন ব্যবহার করলেই বাপ বাপ করে ও রোগ পালিয়ে যাবে।

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রশ্ন করল সত্যি-ই-ই!

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, হ্যাঁ, বেয়াড়া যে কোনো রোগের পক্ষে বিছুটির মত ওষুধ নেই। ঘষে দিতে পারলেই হ'ল। বুড়ী ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, তোমরা ভারতীয়েরা সতিই ভাগ্যবান। আমি যেন পরের জন্মে ভারতীয় হয়ে জন্মাই। লম্বুদা পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন এবং মুহুর্মুহুঃ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদা নিরব হতে বাস্তব নড়েচড়ে বসল। পকেট থেকে একটা ছেঁড়া টিকিট বের করে চমকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আজ ভারত বনাম রাশিয়ার ভলিবল খেলা দেখে এলুম। আহা, রাশিয়ান টিমের কি খেলা! খেলা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হিল্লোল বাস্তবের উদ্দেশ্যে বললে, রাশিয়ার এক নম্বর ভলিবল খেলোয়াড় মিজোভস্কির খেলা কি রকম দেখলি? মাত্র একুশ বছর সাত মাস বয়েস, কিন্তু ভুঁই চাপ্‌পা যা মারে আমার মনে হয় রেঞ্জের মধ্যে রাইফেলের গুলিও এত জোরালো নয়। ওর সামনে কখনো আমাদের ভারতীয় খেলোয়াড়রা দাঁড়াতে পারে?

লম্বুদা হঠাৎ 'পারে' বলে নাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শুনে আমরা সকলেই তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে।

লম্বুদা ধোঁয়া ছাড়া শেষ করে গোঁফের ডানায় দুমুটো হাসি ছিটিয়ে বললেন, মিজোভস্কির ওই চাপ্‌পা দেখেই যদি তোমাদের বুলেট ভ্রম হয়, তাকে আমি বলব বুলেট তো দূরের কথা, রাইফেলই তোমরা দেখেছ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! লম্বুদা প্রায় এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো বলে ফেলে আবার নিরব হয়ে গেলেন।

লম্বুদার আকস্মিক এই নিরবতা আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। আমি বললুম, লম্বুদা, মিজোভস্কির প্রতিভাকে আপনি অস্বীকার করছেন বটে, কিন্তু ওর চেয়ে জোরালো চাপ্‌পা মারতে আর কাউকে দেখেছেন কখনো?

দে-খ-ব আর কি করে, নিজেই তো মেরেছিলুম বলে লম্বুদা টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

লম্বুদা আবার নিরব হ'তে সবাই সবাইকে ইশারায় লম্বুদার মুখ খোলাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত বাস্তব রাজী হ'ল। লম্বুদাকে বলল, দেখুন যদি কিছু না বলতেন সে একরকম ছিল; কিন্তু এখন আর নিরব থাকা চলে না। দয়া করে আরম্ভ করুন।

লম্বুদা নিরব থাকলেও কানটা যে তাঁর এদিকে সজাগ ছিল বোঝাই গেল। বাস্তব বলামাত্রই একগাল হেসে বললেন, তোমাদের এই কৌতূহলটা আমার ভাল লাগে।

আগেও বলেছি এখনো বলছি, এই কৌতূহলটাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কর। জীবনে বড় হতে পারবে।

লম্বুদা নড়েচড়ে গুছিয়ে বসলেন। পর পর তিনটে জোরালো টান মেরে ধোঁয়াটা মুখের মধ্যে চেপে চেপে রেখে বললেন, লর্ড ডাফরিন্ তখন ভারতের গভর্নর। খেলাধুলায় ভারি উৎসাহ ভদ্রলোকের। একদিন হঠাৎ ট্রাঙ্ককলে আমায় ডেকে বললেন, লম্বমান তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে। তুমি দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে এখুনি একবার দেখা কর।

অন্য কেউ হলে হয়তো পাত্তাই দিতুম না। কিন্তু গভর্নরের অনুরোধ আর প্রত্যাখ্যান করি কি করে! সেদিনই প্লেনের একটা টিকিট কেটে যাত্রা করলুম দিল্লীর উদ্দেশ্যে।

দিল্লীতে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই, লর্ড আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, তোমার মত একজন বর্ন স্পোর্টস্ম্যানের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্যে আমি সত্যিই গর্বিত। মাঝে মাঝে প্লেন পাঠিয়ে দেব। তুমি এস। আড্ডা মারা যাবে।

আমি বললুম, নিশ্চয়ই। এ আর বলার কি আছে। তবে একান্তই যদি কোনো কাজকর্মে আটকে গিয়ে না অসতে পারি, কিছু মনে করবেন না যেন। ডাফরিন্ বললেন, 'সার্টেনলি নট।' তুমি যে যথেষ্ট কাজের লোক তা আমি ভাল করেই জানি।

যা হোক, সৌজন্যমূলক সব কথাবার্তা শেষ হতে, ভলিবলের কথা উঠল। লর্ড বললেন, ভলিবল খেলায় উজবেকিস্তানের কৃতিত্বের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের অবিদিত নেই। পর পর তিনবছর তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান্‌শিপ অর্জন করেছে। গত সপ্তাহে উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মিঃ লিটল্ লুংলুর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। মিঃ লুংলু ভারতীয় টিমের সাথে পাঁচটি টেস্টম্যাচ খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি ভাবলুম এবিষয়ে পাকাপাকি কথা দেওয়ার আগে তোমার সাথে একবার পরামর্শ করা উচিত। তা তুমি কী বল? লম্বুদা মুখের মধ্যে জমিয়ে রাখা ধোঁয়াটা টিপে টিপে ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আমি টেবিল চাপড়ে বললুম, নিশ্চয়ই। ওরা যখন গায়ে পড়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে, রিফিউজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্ততঃ স্পোর্টস্ম্যান্‌দের সেটাই ধর্ম।

লর্ড গোল গোল চোখ করে আমার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার উত্তর আমার জানাই ছিল। এর জন্য তুমি আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ডাফরিনের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে মিঃ লুংলু খুশি হয়ে তাদের ভারত সফরের সময়কাল জানিয়ে দিলেন। ডাফরিন্ আবার সে খবর আমায় জানিয়ে বললেন, তোমার ওপরেই আমি ভারতীয় টিম সিলেক্‌শনের ভার দিলুম। তুমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কর।

লম্বুদা হঠাৎ মুখের সিগারেটটা পরীক্ষা করে বললেন, ইস্, কী কান্ড সিগারেটটা

কখন নিভে গিয়েছে টেরই পাই নি। তাই বলি মাথাটা এরকম ঝিম মেরে যাচ্ছে কেন! পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে লম্বুদা আবার সিগারেটটা ধরালেন। ঝাঁক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে, ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আঙুলটার আর কোনো সাড় নেই। আর থাকবেই বা কি করে, কম করেও প্রায় চার লক্ষ চাপ্‌পা মেরেছি এই হাতে। গুনতিতে যে এখনো দশটা আঙুল আছে হাতে, এটাই আমার বিগত জন্মের সুফল। লম্বুদা আঙুল কটা মটমট করে মটকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম, ভারতের সেরা সেরা খেলোয়াড়দের নিয়েই টিম তৈরি হল। আমার কর্মনিপুণতায় লর্ড ডাফরিন্ খুশিই হলেন।

দিল্লীতেই প্রথম টেষ্টম্যাচ শুরু হ'ল।

উজবেকিস্তান ভলিবলদলের অধিনায়ক মিঃ কিলচুকির সাথে ভারতীয় দলের অধিনায়ক যশোবন্ত সিং-এর শুভেচ্ছা বিনিময় হল। খেলা শুরু হতে না হতেই মাঠ সরগরম। দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। যশোবন্তও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল দলকে জেতাবার জন্য। কিন্তু হলে কি হবে, কিলচুকি বারো হাত লাফিয়ে লাফিয়ে এমন চাপ্‌পা মারতে লাগলেন, যা দেখে ভারতীয় খেলোয়াড়দের চক্ষু চড়কগাছ। তারা আত্মরক্ষার্থে এদিক সেদিক সরে পড়তে লাগল। ফলে উজবেকিস্তানের পয়েন্টস্ বাড়তে লাগল হুহু করে।

লম্বুদা এক মিনিট চুপ করে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এমন পুওর রেজাল্ট হবে আমিও স্বপ্নে ভাবতে পারি নি।

চমক সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, লম্বুদা, ভারতীয় দল কি তাহলে সত্যি সত্যিই হেরে গেল?

লম্বুদা চোখ বুজে বললেন, হারা বলে হারা! একেবারে গো-হারান হারল ভারত। এখনো আমার মনে পড়লে লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে। লম্বুদা নিরবে ধূমপান করতে লাগলেন।

বাস্তব উসখুস করছিল। বললে, লম্বুদা প্রথম টেস্টে তো হারলেন, বাকিগুলোও কি......?

লম্বুদা খুকখুক করে কেশে বললেন, হ্যাঁ, সেকেন্ড টেস্টেও ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে, লর্ড আমায় ডেকে পাঠালেন দিল্লীতে। সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করলুম, লর্ড খুবই চিন্তিত। চায়ের টেবিলে বসে ঘন ঘন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, মিঃ দ্যট্ ভারতীয় দল যে এত দুর্বল আমার জানা ছিল না। পর পর দুটো টেস্টে যে রকম রেজাল্ট করল, বাকি তিনটেতেও যে হারবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন বাকি তিনটে খেলায় জিতবার জন্য আমাদের করণীয় কি?

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, লর্ড ডাফরিনের ভারতীয় টিমের প্রতি এই টান দেখে আশ্চর্য হলুম। খাস সাদা চামড়া হয়েও, কালা আদমির জন্য এই মাথাব্যথা কম কথা নয়। গভর্নর হোন আর যাই হোন চাকুরি ছাড়া তো আর কিছু নয়। একবার সাগরপার থেকে ডাক এলেই হল, তখুনি সব ফেলে স্বদেশে ছুটতে হবে।

আমি চায়ের কাপে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে বললুম, বলুন আমি কি করতে পারি?

লর্ড ডাফরিন্ বললেন, আমার একান্ত ইচ্ছা বাকি তিনটে খেলায় তুমি অংশ গ্রহণ কর।

লম্বুদা ভ্রূকুঁচকে বললেন, অন্য কেউ হলে হয়তো তার মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিতুম। কিন্তু খাস গভর্নরের অনুরোধ ফেলতে পারলুম না। সঙ্গে সঙ্গেই আমার সম্মতি জানিয়ে দিলুম।

তৃতীয় টেস্টম্যাচ যথাসময়েই শুরু হল। উজবেকিস্তানের খেলোয়াড়েরা ধরে নিয়েছিল বাকি তিনটে খেলা তাদের হাতের মুঠোয়। খেলা শুরু হবার সাথে সাথেই কিলচুকি আবার বারো হাত লাফিয়ে চাপ্‌পা মারতে শুরু করলেন। কিন্তু এবার আর তেমন সুবিধা হল না। তার বিদ্যুৎগতির চাপ্‌পাগুলোকে আমি আলতো করে তুলে তুলে নেটের ওপারে পাঠিয়ে দিতে লাগলুম। যা দেখে কিলচুকির চক্ষু ট্যারা। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা একত্র হয়ে কি যেন বলাবলি করল। আমি যশোবন্তকে ডেকে বললুম, তোমাদের আর কিছু করার দরকার নেই। তোমরা খালি বলটা নেটের মাথায় তুলে দাও, তারপর আমার যা করার করছি।

কিলচুকির ওই প্রচণ্ড চাপ্‌পা বলে বলে আমাকে তুলতে দেখে যশোবন্ত ইতিমধ্যেই বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। আমি বল তুলে দিয়ে সাহায্য করার কথা বলতে, যশোবন্ত ভীষণ রকম উৎসাহিত হয়ে উঠে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কায়দামাফিক একটা বল নেটের মাথায় তুলে দিতেই, আমি চব্বিশ হাত একটা লাফ মেরে এমন একখানা চাপ্‌পা মারলুম, ব্যস্, বল ভ্যানিস্ মাঠ থেকে।

ব্যাপারটা কেউ বুঝতে না পেরে চোখ রগড়ে নিল। চোখ খুলেও যখন বল দেখতে পেল না, ঘাবড়ে গিয়ে তখন সবাই রেফারির স্মরণাপন্ন হল।

রেফারি জন্ বিলিয়ার্ড টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে খেলা পরিচালনা করছিলেন। কিলচুকি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই, তিনি টুলের ওপর থেকে নেমে এসে খেলোয়াড়দের সাথে বল খুঁজতে আরম্ভ করলেন।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একজন লক্ষ্য করল মাঠের এক জায়গায় ঘাসগুলো কি রকম যেন খাবলানো রয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঝুঁকে পড়েই হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'পেয়েছি!'

তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সবাই সেখানে ছুটে এসে বললে, কী পেলে?

কী আবার, গর্ত বলে সে হাসতে লাগল।

লম্বুদা সিগারেটে একটা জোরদার টান দিলেন। ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, অবশেষে মালি এসে শাবল দিয়ে সেই গর্ত খুঁড়ে বারো ফুট তলা থেকে সেই বল টেনে বের করে আনল।

জন্ বিলিয়ার্ড এতক্ষণ অবাক হয়ে গর্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা দীর্ঘশবাস ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ দ্যট্, আপনি এ ধরনের চাপ্‌পা মারলে মাঠ তো গর্তে গর্তে ডোবা হয়ে যাবে, তাছাড়াও প্রতিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের সুস্থ দেহে ফিরে যাওয়াটাও তো একটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। আপনার তো এত জোরে চাপ্‌পা মারা চলবে না।

আমি হেসে বললুম, স্যরি, মিঃ বিলিয়ার্ড। এটাই আমার সবচেয়ে কমজোরি চাপ্‌পা। এর চেয়ে আস্তে মারা অন্ততঃ আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি।

মিঃ কিলচুকি এতক্ষণ জ্বলজ্বল করে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ গুটি গুটি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, মিঃ দ্যট্, আমরা তিন বছর পর পর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান্ হয়েছি, কিন্তু চাপ্‌পা মেরে মাটিতে বারো হাত গর্ত করতে কোত্থাও কোনো খেলোয়াড়কে দেখি নি। আমরা আর আপনাদের সঙ্গে খেলতে রাজী নই। স্বেচ্ছায় অবশিষ্ট খেলা দুটিতেও পরাজয় স্বীকার করে নিলুম।

উজবেকিস্তানের এই আত্মসমর্পণের সংবাদ রেডিও মারফত ছড়িয়ে পড়তে আমাকে মাথায় তুলে দর্শকদের সে কি নাচ! পুরো একটা দিন দর্শকেরা আমায় মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ালো সারা কলকাতা শহর।

লম্বুদা হাই তুলে তিনবার পটপট করে তুড়ি দিলেন। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সারা মুখে বুলিয়ে নিতে নিতে বললেন, পরে খবর পেয়েছিলুম কিলচুকি নাকি খেলা ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে গিয়েছেন।

লম্বুদা নির্বিকারভাবে কথাগুলো বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চমক বলে উঠল, গু-রু-দে-ব।

# বোলিং

হঠাৎ বাইরে গুনগুন করে গানের সুর ভেসে উঠতে বুঝতে অসুবিধা হ'ল না আগন্তুকটি কে। আমরা নড়েচড়ে বসবার সাথে সাথেই লম্বুদা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কোমরে হাত রেখে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, আজ হাউস ফুল মনে হচ্ছে! ভেবেছিলুম আজ একবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যাব। দুদিন ফোন করেছেন দেখা করার জন্য। ভাগ্যিস আজ যাই নি। এমন মধুর আড্ডাটাই মাটি হয়ে যেত। লম্বুদা আড়চোখে সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, ইডেন গার্ডেনে আজ এত ভিড় কিসের? বাসে আসতে আসতে চোখে পড়ল।

চমক বললে, ইডেনে আজ থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হচ্ছে। কেন, আপনি নিমন্ত্রণ পান নি?

চমকের প্রশ্ন শুনে লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। চমকের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, হুম্, এতক্ষণে মনে পড়েছে। লম্বুদা কথা বলা থামিয়ে আবার ধূমপানে মন দিলেন। পর পর কয়েকটি জোরালো টান দিয়ে বললেন, মিঃ ভড় নির্ঘাত অফেনডেড্ হবেন।

লম্বুদার মুখ থেকে প্রসঙ্গহীন মন্তব্যটা শুনে সকলেরই অস্বস্তি হতে লাগল। লম্বুদার মন্তব্যের পেছনে যে কাহিনী থাকে এ কথা আমাদের কারুরই অজানা নয়। হিল্লোল আর কৌতূহল সামলাতে পারল না। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বলল, দোহাই লম্বুদা, আগুনে আর ঘি ছিটোবেন না। বলার মত যদি কিছু থাকে বলেই ফেলুন।

লম্বুদা চায়ের ভাঁড়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, আর বল কেন?

সেদিন সকালবেলা ড্রয়িংরুমে বসে সবে ব্রেকফাস্ট শুরু করেছি, হঠাৎ ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলতেই অপারেটর বললে, মেক্সিকো থেকে ট্রাঙ্ককল আছে। অত্যন্ত জরুরী।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেক্সিকো অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান্ মিঃ রিচি গ্যাভার্ডের গলা পেলুম। মিঃ গ্যাভার্ড বললেন, আপনার সঙ্গে খেলাধুলোর আইন সম্পর্কে কিছু পরামর্শ করতে চাই। আশা করি আন্তর্জাতিক স্বার্থে আপনি আপনার অমূল্য সময় কিছু নষ্ট করতে আপত্তি করবেন না।

আমি হেসে বললুম, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন আমি একজন বর্ন স্পোর্টস্ম্যান্। যাহোক, যথারীতি কুশল সংবাদ বিনিময়ের পর আলোচনা শুরু হল। আলোচনা যখন বেশ জমে উঠেছে, হঠাৎ আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট কমিটির সম্পাদক মিঃ কে. কে.

ভড় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং কথা বলার জন্য উসখুস করতে লাগলেন।

আমি ইঙ্গিতে বললুম, ব্যস্ত। আপনি পরে আসবেন কথা বলব।

মিঃ ভড় নাছোড়বান্দা। হাতের আঙুল দেখিয়ে বললেন, এক মিনিট প্লীজ্।

ট্রাঙ্ককল ছেড়ে আমি মিঃ ভড়ের সঙ্গে কি করে কথা কই! আমি রাজী না হতে মিঃ ভড় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, ফোর্থ জানুয়ারী ইডেনে আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। চীফ গেস্ট হিসেবে আপনাকে আমরা মাঠে পেতে চাই।

আমি কথা বলতে বলতে ঘাড় নেড়েছিলাম মাত্র। তারপর আর খেয়াল ছিল না। আজ তোমাদের কথা শুনে মনে পড়ে গেল।

লম্বুদা পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন এবং পা নাচাতে নাচাতে বললেন, ওসব চুনোপুঁটির খেলায় অ্যাটেন্ড করার মত মেজাজ আর এখন নেই। লম্বুদা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে টিপে টিপে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লম্বুদার বিশ্বখ্যাতির কথা আমরা পূর্বেই শুনেছি। কাজেই আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় লম্বুদার আমন্ত্রণের সংবাদে আমরা কেউই বিস্মিত হলুম না। আমি বাস্তবের দিকে তাকিয়ে বললুম, বাংলা যে রকম শুরু করেছে, মনে হয় বোম্বেকে হারাতে পারবে। কি বলিস?

বাস্তব আমার প্রশ্নোত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লম্বুদার গোঁফের ফাঁকে হাসির ঝিলিক উঠতে হঠাৎ প্রশ্ন করা থেকে সে নিবৃত্ত হল। ফলে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল লম্বুদার মুখের ওপর।

লম্বুদার হাসির কারণ জানবার জন্য যখন সকলেই আমরা উদ্‌গ্রীব, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বুদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আশাবাদী হওয়া ভাল। তবে মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্য তাই বলে ভেব না আমি তাদের ডিস্‌কারেজ করছি। আসলে কি জান, খালি খেললেই হয় না, কিছুটা কৌশলও জানা চাই। আর এই কৌশল রপ্ত করতে পেরেছিলুম বলেই বাঘা বাঘা ইউরোপীয়ান টিমগুলোকে নাকানিচোবানি খাইয়েছিলুম। লম্বুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

হীরু আড্ডায় কদাচিৎ আসে। তাই লম্বুদার বুলির সঙ্গে তার পরিচিতি খুবই কম। এতক্ষণ সে তন্ময় হয়ে লম্বুদার বুলি হজম করছিল। লম্বুদা থামতেই হীরু বলে উঠল, লম্বুদা খেলায় অপরিহার্য, আপনার এই কৌশলটি কি জানতে পারি?

হীরুর মুখে প্রশ্ন শুনে লম্বুদা কয়েক মিনিট হীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গোঁফের আড়ালে একমুঠো হাসি ছিটিয়ে বললেন, তুমিও তাহলে বন্ধুদের মতই কৌতূহলী, ভাল।

এই ধর না আমিই—আমি কি বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতুম, যদি আমার এত কৌতূহল না থাকত। লম্বুদা সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে পর পর কটা টান দিলেন,

তারপর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হীরু তুমি যেন কী জানতে চেয়েছিলে?

হীরু প্রস্তুতই ছিল। লম্বুদা প্রশ্ন করামাত্রই বলল, ক্রিকেট খেলায় আপনার বিশেষ কৌশলটা জানতে চেয়েছিলুম।

লম্বুদা ঘাড় নেড়ে বললেন, বলছি। আমার কোনো আপত্তি নেই। লম্বুদা গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, তা অনেকদিন আগেকার কথা। তখন তোমরা কেউই জন্মাও নি।

ক্রিকেট খেলায় তখনও লালমুখো সাহেবদের একচেটিয়া গৌরব।

ভারতীয় খেলোয়াড়েরা তখনো কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় নি। লালমুখোরা দয়া করে তাদের টিমে চান্স দেয়। লংফিল্ডে দাঁড় করিয়ে রাখে বাউন্ডারী থেকে বল কুড়িয়ে আনার জন্য।

এর জন্য ভারতীয়দের মনে মনে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় ছিল না। যতই হোক প্রভুর জাত তো। রেগে গেলে পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে দিতে পারে এই দুরাশঙ্কায়। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দেরও মনোভাব পরিবর্তন হল। তারা ঠিক করল, আমরা আর ওদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব না। সাহেব-বর্জিত স্বতন্ত্র ভারতীয় দল তৈরী করব।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গেলেন এবং চমকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এক কাপ গরম চা খাওয়াবে নাকি? লম্বুদার প্রস্তাব শুনে চমক অন্যান্য সকলের মুখের দিকেতাকাল। সকলের চা খাবার ইচ্ছে না থাকলেও লম্বুদার অনুরোধে সবাই রাজী হল।

চমক পায়ে চটি গলিয়ে দৌড়াল চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে।

চায়ের কাপটা মুখে ধরে লম্বুদা স-র্-র্-র্ করে সশব্দে একটা চুমুক দিলেন।

পর পর কটা চুমুক দেওয়ার পর বললেন, ভারতীয় দল তৈরী হতে ঠিক হল সাহেবদের সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যমূলক ম্যাচ খেলতে হবে। সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব পাস হতেই সাহেবদের আমন্ত্রণ জানান হল খেলার জন্য।

ভারতীয়দের কাছ থেকে খেলার চিঠি পেয়ে তো ওরা হেসে খুন। বললে, বামনের চাঁদ ধরার সখ। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তারা রাজী হল।

আমাকে সবাই ধরল টিমের নেতৃত্বের জন্য। আমি রাজী হলুম না। বললুম, দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে নাম রাখ। প্রয়োজনে নামব।

টসে সাহেবরাই জিতল। টসে জিতেই তারা এমন ভাবসাব দেখাতে লাগল যেন খেলার ডিসিসান হয়ে গিয়েছে। আর নামবারই প্রয়োজন নেই। ওদের দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণে ভারতীয় টিমের আরো জিদ গেল বেড়ে। সবাই একসাথে প্রতিজ্ঞা করল, এ খেলায় আমাদের জিততেই হবে।

নির্দিষ্ট দিনেই খেলা শুরু হল।

প্রথম বলেই ওদের ওপনিং ব্যাটস্ম্যান্ ছক্কা মেরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতে লাগল। ওদিকে গ্যালারি, ওদের সমর্থকদের আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রায় ভেঙে পড়ার যোগাড়।

ভারতীয় টিমের বোলাররা ঘাবড়ে গিয়ে এলোমেলো বল করতে লাগল। ফলে ওদের রান উঠতে লাগল চড়চড় করে।

সারাদিন ব্যাট করে বিনা উঠকেটে ছ'শ ছয় রান করে ওরা টেন্টে ফিরে গেল।

ওদের অধিনায়ক আমাদের অধিনায়ককে ঠাট্টা করে বললে, এখনো খেলার সখ আছে না মিটে গিয়েছে?

আমি ধমক দিয়ে বললুম, ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। আমি তো আছি। দরকার হলে আমি নামব।

আমার কাছ থেকে ভরসা পেয়ে অধিনায়কের আনন্দ আর ধরে না। আমার হাত ধরে বললে, লম্বুদা আপনি নামুন। প্রথম খেলাতেই যদি গোহারান হারি ভবিষ্যতে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

আমি ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না। বললুম ঠিক আছে, কাল আমি খেলব।

পরের দিন আমি মাঠে নামবার সাথে সাথেই চারদিক থেকে ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগল। দর্শকেরা কেউ কেউ লঙ্ লীঙ লম্বুদা বলে চিৎকার করে উঠল। আমি টুপি খুলে তাদের প্রত্যুত্তর জানালুম।

খেলা শুরু হতেই আমি পর পর চারটে সাধারণ বল দিলুম। ওদের ব্যাটস্ম্যান্ চারটে বলই বাউন্ডারী সীমানা পার করে দিল।

একটা চ্যাংড়া সাহেব আনন্দ চাপতে না পেরে রেলিং টপকে মাঠে নেমে টুইস্ট নাচতে শুরু করল। আমি মনে মনে হাসলুম। টুইস্ট নাচাচ্ছি। খালি ঘুঘুই দেখেছ, ফাঁদ তো দেখ নি এখনো।

প্রথম ওভারের ছটা বলই ছেড়ে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

অধিনায়কের ছটা বল দেওয়া শেষ হতেই আবার আমার ওভার এল।

বল সমেত হাতটা পিঠের আড়ালে নিয়ে গিয়ে আঙুলের ফাঁকে বলটা কায়দা করে ধরলুম, তারপর তিন-পা এগিয়ে গিয়ে বলটা এমনভাবে ডেলিভারী দিলুম, বলটা বেশ কিছুটা শূন্যে উঠে গিয়ে, ঠিক উইকেটের মাথা বরাবর হঠাৎ নিচে নেমে এসে মিড্ল উইকেটখানা ছিটকে ফেলে দিল মাটিতে।

বেচারা ব্যাটস্ম্যান্ থ মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘটনাটা কি ঘটল বোঝবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই যখন ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না, আমার দিকে কটকট করে তাকাতে তাকাতে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল।

দ্বিতীয় ব্যাটস্‌ম্যানেরও ওই একই অবস্থা হল। বলটা যখন আবার ওপর থেকে মিড্‌ল উইকেট বরাবর নিচে নামতে লাগল, বেচারা অসহায়ের মত বাঁই বাঁই করে ব্যাট ঘোরাতে লাগল। কিন্তু কিছুই লাভ হল না। কোন্ ফাঁকে বলটা সোজা নেমে এসে মিড্‌ল উইকেটখানা আবার ছিটকে ফেলে দিল।

পর পর ছটা বলে ছটা ব্যাটস্‌ম্যান্‌কে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিতে প্রচুর হাততালি পেলুম।

প্যাভিলিয়নে যে সমস্ত হোমরাচোমরা সাহেব বসেছিল, তারা বিড়বিড় করে আমাকে কী সব বলতে লাগল। আমাদের অধিনায়ক আনন্দে আমাকে জাপটে ধরে কানে কানে বললে, লম্বুদা আপনি মানুষ নন, গড্। স্বর্গই আপনার বসবাসের উপযুক্ত স্থান।

আমি পিঠ চাপড়ে বললুম, খেলা এখনো শেষ হয় নি। 'ট্রাই টু বি রিজার্ভড্।'

লম্বুদা সিগারেটের আগুনটা ঝালিয়ে আবার দুটো টান দিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আবার আমার বল করার পালা এল। মাঠ তখন চিৎকারে ফেটে পড়েছে।

আমি আবার কায়দামত বলটা ধরলুম আঙুলের ফাঁকে। ব্যাটস্‌ম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মিচকি হেসে, আলতো করে বলটা ছেড়ে দিলুম ব্যাটস্‌ম্যানের উদ্দেশ্যে। ব্যাটস্‌ম্যান্ বেচারা শূন্যে তাকিয়ে পেছু হটতে হটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উইকেটের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আমপায়ার আঙুল তুলে 'হিট্ উইকেট্' ঘোষণা করলেন।

নবম উইকেটও শূন্য রানে পড়ে যেতে, দশম আর ভয়ে খেলতেই এল না।

আমরা ব্যাট করতে নেমে শচারেক তুলে আবার ওদের ব্যাট করার সুযোগ দিলুম, কিন্তু ওরা দ্বিতীয় ইনিংস্ খেলতে আর রাজী হল না।

মাথাধরা, বুকজ্বালা, পেটব্যথা ইত্যাদি নানা অজুহাতে তারা খেলা অসমাপ্ত রাখল।

প্রেস ফটোগ্রাফাররা আমাকে ঘিরে ধরে ছবি তুলল। রিপোর্টাররা বলল, আমরা জীবনে অনেক রকম বল করা দেখেছি মশাই, কিন্তু আপনার এই অভূতপূর্ব বল করার পদ্ধতি কোত্থাও দেখি নি। এর কি কোনো নাম আছে?

'উইকেট্ ব্রেক' বলে আমি হাসতেই রিপোর্টাররা খসখস করে নোটবুকে তা লিখে নিল।

পরের দিন স্বদেশীয় সব সংবাদপত্রে কার কত বড় ছবি উঠেছিল, আশা করি তা আর তোমাদের বলতে হবে না বলে লম্বুদা হীরুর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

আমরা 'বহুত আচ্ছা' বলে চিৎকার করে উঠলুম।

---

# রেফারি

ঐশ্বরিক বাক্‌শক্তিতে অল্পদিনের ভেতরেই শ্রীলম্বমান দত্ত ওরফে লম্বুদা আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। সেদিন আধপোড়া যে সিগারেটটি এতক্ষণ আঙুলের ফাঁকে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হচ্ছিল, সেটি লম্বুদার ঠোঁটে উঠতেই, নাক-মুখ-চোখ দিয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, হুঁঃ, তোমাদের মত বয়সে কি না করেছি।

স্পোর্টস্ আর গেমস্ ওয়ার্ল্ডে এমন কোনো আইটেম্ ছিল না যা আমার অজানা ছিল বা যাতে আমি কৃতিত্ব দেখাই নি। এখনো কোথাও কিছু দেখলে শরীরের লোহিতকণাগুলো চনমন করে ওঠে। কিন্তু হলে কি হবে, হতচ্ছাড়া দমটা ইদানীং বড্ড বিট্রে করে। ফলে কাজের মধ্যে কাজ এখন খালি বিচারক হওয়া। সারা দুনিয়ায় এমন কোনো দেশ নেই যেখান থেকে না আমন্ত্রণ আসছে।

এই তো গতকাল দুপুরবেলা এশিয়ান্ অলিম্পিকে বিচারক হিসাবে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি এল। যাতায়াতের প্লেনভাড়া ছাড়াও থাকা খাওয়ার রাজকীয় ব্যবস্থা।

ধুৎ! পোষায় নাকি। গত মাসে সবে পনরো দিন কুজবেকিস্থানে কাটিয়ে এসেছি। শরীরটা তো ওদের নয় আমারই। সঙ্গে সঙ্গে একটা রিগ্রেট্ লেটার্ ড্রপ করে দিলুম। লিখে দিলুম আমি উপস্থিত না হতে পারাতে তোমাদের অসুবিধে হবে জানি কিন্তু কি করব বল। আমি তো মেশিন নই যে সুইচ টিপলেই চলব। টু টায়ার্ড। এবারকার মত রেহাই দাও, পরের বার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। লম্বুদা প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে ধূমপানে মন দিলেন এবং রাশি রাশি ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে ফেললেন

বাস্তব এতক্ষণ হাঁ করে লম্বুদার দিকে তাকিয়ে তাঁর হাবভাব ও কথাবার্তা প্রত্যক্ষ করছিল। লম্বুদা নিরব হতেই সে প্রশ্ন করল, বিচারক হয়ে আপনি কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছেন?

লম্বুদা বাস্তবের প্রশ্ন শুনে রসগোল্লার মত গোল গোল চোখ করে বললেন, কোথায় না! নামের ফিরিস্তি শুনতে গেলে তো কমপক্ষে দুটো দিন তোমাদের এখানে কাটাতে হবে। সেটা কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে, ভেবে দেখ। আমার কোনো আপত্তি নেই।

লম্বুদার প্রস্তাবে আমরা যখন আমতা আমতা করছি, হঠাৎ বাস্তব কি আর একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল।

লম্বুদার সেটা চোখ এড়ালো না। বাস্তবের দিকে তাকিয়ে বললেন, থামলে কেন? প্রশ্ন থাকলে করতে পার। ইতস্ততঃ করার কোনো কারণ নেই। আমি ফ্র্যাঙ্কনেস্ ভীষণ

পছন্দ করি। অবশ্য আগে আমি নিজেও এত ফ্র্যাঙ্ক ছিলুম না। উনিশশো পঁচিশ সালে আমি যখন প্রথম ফ্রান্সে গেলুম, আমার চোখ খুলল। দেখলুম স্রেফ ফ্র্যাঙ্কনেসের জোরে ফরাসী জাতটা চড়চড় করে বড় হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিজ্ঞা করে ফেললুম, ফরাসীদের এ গুণটা আমাকে যে করেই হোক রপ্ত করতে হবে। মাত্র কদিনের চেষ্টাতেই সুফল ফলল। সেই থেকেই আমি ভীষণ ফ্র্যাঙ্ক।

এখন কাউকে কোনো ব্যাপারে ইতস্ততঃ করতে দেখলে আমার শরীর রাগে রী রী করে ওঠে। মনে হয় নড়া ধরে ফ্রান্সে পার্শেল করে দিই। চাক্ষুষ দেখে তারা নিজেদের চরিত্র সংশোধন করে আসুক।

লম্বুদার মন্তব্যে বাস্তব বেশ একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, না না আমি সঙ্কোচ করি নি। আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম হঠাৎ ভুলে গেলুম বলেই—

'ইজ্ ইট্ সো' বলে লম্বুদা তাঁর মাছি মার্কা গোঁফের আড়ালে আবার একঝলক হাসির ঢেউ খেলালেন এবং সেই হাসির রেশ টেনে বললেন, এই বয়সে এত মেমোরী উইক্ থাকা তো ভাল কথা নয় ব্রাদার্। আমার তো এত বয়েস কিন্তু অন্নপ্রাশনে কি কি তরকারি দিয়ে ভাত খেয়েছিলুম আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভেবে দেখ তাহলে আমার স্মৃতিশক্তি কি রকম প্রখর!

আমি মৃদু হেসে লম্বুদাকে সমর্থন করতে লম্বুদা খুশিই হলেন। সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, মানুষ গুণী হয়ে জন্মায় না। জন্মে গুণী হয়। তোমরা যদি এখন থেকে চেষ্টা কর, আমার দৃঢ় ধারণা বাংলা দেশ আবার তার হৃতগৌরব ফিরে পাবে।

লম্বুদার জ্ঞানমূলক কথাবার্তা ভাল লাগলেও সম্ভবতঃ অনেকেই এ প্রসঙ্গ এড়াতে চাইছিল। কয়েক মিনিট নিরবে কাটার পর হঠাৎ চমক মুখ খুলল। লম্বুদার উদ্দেশ্যে বললে, আচ্ছা লম্বুদা, বিচারক হয়ে তো আপনি বহুদেশেই ঘুরেছেন। আপনার অভিজ্ঞতার ঝাঁপি থেকে আজ আমাদের কিছু শোনান না—

চমকের চমকপ্রদ অনুরোধে লম্বুদা তেমন কিছু বিস্মিত হলেন না। সিগারেটটা ঠোঁটের কোণায় চেপে ধরে ফসফস করে নাকের দুটো গর্ত দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ঝাঁপি না বলে বস্তা বল। যা অভিজ্ঞতা আছে ছেপে প্রকাশ করলে কমপক্ষে বিশ-বাইশ ভলিউম্ বই তো হবেই। অবশ্য ছেপে বেরা করার ইচ্ছে যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু আমাদের এই গরীব দেশে বিশ-বাইশ ভলিউম্ বই ছাপার মত প্রকাশক কোথায়। এক ভলিউম্ ছাপতেই তাদের নাভিশ্বাস ওঠে। তাই ঠিক করে রেখেছি, এখানে ছাপবার চেষ্টা না করে সরাসরি লন্ডন, রাশিয়া কিংবা আমেরিকায় চেষ্টা করব। যা মেটিরিয়াল্ একবার শুধু 'তু' করলেই হল!

অবশ্য পারিশ্রমিক যে দেশ বেশি দেবে তাকেই আমি এ গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার দেব বলে লম্বুদা আড়চোখে আমাদের সকলের মৌখিক অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

আসল প্রসঙ্গ চাপা পড়াতে চমক যে একটু উসখুস করে উঠল, সেটা লম্বুদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ালো না। চমকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার গুলিয়ে ফেলা অভ্যাস থাকলেও আমার কিন্তু নেই। মনে আছে। শোন তাহলে বলি—

খেলাধুলোর জগৎ থেকে রিটায়ার করার পর সবেমাত্র দেশবিদেশ থেকে বিচারক হবার আমন্ত্রণ পেতে শুরু করেছি। লম্বুদা এক মিনিট থেমে কি যেন ভাবতে লাগলেন, তারপর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, দামাস্কাস শহরের নাম নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই শুনেছ। এই দামাস্কাসে ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছিল। আমাদের এখানে যেমন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, ওদের ওখানেও তেমন ইয়ং বুলেটস্ আর অ্যাটম্‌স্ ইলেভেনের প্রতিপত্তি। কেউই ছোড়্‌নেওয়ালা পার্টি নয়। একপক্ষ গড়ে এক মিনিটের বেশি গোল দেওয়ার আনন্দ ভোগ করতে পারে না। প্রতিপক্ষ ওর মধ্যেই গোল শোধ করে দেয়। অতএব বুঝতেই পারছ কি স্ট্যান্ডার্ডের খেলা।

যা হোক, এই দুটো টিমই সেবার ফাইন্যালে উঠেছিল এবং খেলেছিল দামাস্কাস ডায়মন্ড স্টেডিয়ামে। দু'পক্ষই পনরোটা করে গোল করেছে। স্টেডিয়াম তো উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে পড়ে। খেলা শেষ হতে আর মাত্র দেড় মিনিট বাকি। এখন যে পক্ষ গোলটি দেবে, বিজয়-মুকুট তারই মাথায়। দুপক্ষেরই সমর্থকরা ঢোল, কাঁসি আর শাঁখ নিয়ে প্রস্তুত। গোল একটা হলেই হয়, দেখিয়ে দেবে আনন্দ কাকে বলে।

এক একটা সেকেন্ড কাটে না এক একটা যুগ কাটে। দুপক্ষেরই খেলোয়াড়রাই গোলপোস্ট ঘিরে এমন ব্যূহ রচনা করেছে, বল তো দূরের কথা একটা মাছি পর্যন্ত গলবার উপায় নেই। খেলা শেষ হতে আর মাত্র দেড় সেকেন্ডবাকি। রেফারি অনবরত ঘড়ি দেখছে।

সমর্থকরা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ দিয়ে নানারকম অস্ফুটক শব্দ করছে। আর আক্ষেপে মাথা থাবড়াচ্ছে। হঠাৎ ইয়ং বুলেটস্ দুম্ করে একটা গোল দিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থকরা ঢোল-কাঁসি পেটাতে শুরু করল। কিন্তু অপর প্রান্তে চিৎকার উঠল 'অফ্‌সাইড্' 'অফ্‌সাইড্' বলে। ব্যস্ মুহূর্তের মধ্যে মাঠের চালচিত্তির পালটে গেল। দুদলের সমর্থকরা নেমে এল মাঠেতে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইঁট, পাথর, ডাবের খোলা, জুতো, পচা টমেটো ইত্যাদি অবিরাম ছুঁড়তে লাগল পরস্পরের গ্যালারি লক্ষ্য করে।

লম্বুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে সিগারেটের আগুন পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরিণতি পর পর দু'খানা টান দিয়ে, সিগারেটের মুখে গনগনে আঁচ তুলে বললেন,

তারপর কি আর, খালি গু-উ-উ-লি!

গুলি শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। বললুম, গুলি মানে?

লম্বুদা মুচকি হেসে বললেন, ইঁট, পাথর, ডাবের খোলা, জুতো, পচা টমেটো ইত্যাদি ছোঁড়াছুড়ি শেষ হবার পরেও যখন তাদের রাগ পড়ল না, ট্রাউজারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে সকলে পাঁচঘরা সাতঘরা রিভলবার বের করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল।

সে খবর অবশ্য বেশিক্ষণ চাপা রইল না। যথাসময়েই পৌছাল স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধিকর্তার কানে।

পুলিশেরা বন্দুক ঘাড়ে করে বেরুল বটে কিন্তু তাদের সামনে এগোয় কার সাধ্য। চারপাশে খালি শাঁ শাঁ শব্দ। পুলিশ চোখে ধুতরো ফুল দেখে ফিরে এল ডেরাতে। বললে, এ দাঙ্গা থামান বন্দুক টন্দুকের কাজ নয়—কামান চাই! কামান দিলেই তবে আমরা বেরুতে পারি নচেৎ পাদমেব ন গচ্ছামি।

এদিকে সে খবর মাঠ থেকে শহরে পৌঁছতে বিশষ সময় লাগল না। তার ফলে দাঙ্গা ক্রমশঃ মাঠ থেকে শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শহরে দাঙ্গা ছড়াবামাত্রই সৈন্যবাহিনীর হাতে দাঙ্গা দমনের ভার দেওয়া হল। সৈন্যবাহিনী পথে নেমে স্টেনগান বের করে ফটাফট গুলি চালাতে লাগল চারদিকে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হল না। দাঙ্গা ততক্ষণে পথ ছেড়ে বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, ঘরে, কলতলায় সমর্থকে সমর্থকে ধস্তাধস্তি চলেছে।

সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক রাষ্ট্রপ্রধান কিউল গাম্বিয়াকে জানালেন, অবস্থা যে পর্যায়ে পৌছেছে গুলিগোলা চালিয়ে এখন আর বিশেষ সুবিধে হবে না। বাড়ি বাড়ি ঢুকে দাঙ্গা থামানোর মত অত সৈন্য আমাদের স্টকে নেই। একমাত্র বিমান থেকে বোমা বর্ষণের দ্বারাই এ দাঙ্গা থামানো যেতে পারে। এখন ভেবে বলুন আমরা সে পথে এগুবো কিনা।

বিমান আক্রমণের কথা শুনে মিঃ গাম্বিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, সর্বনাশ, আপনার মাথার স্ক্রু কি আলগা হয়ে গিয়েছে! বোমা ফেলে আপনি দাঙ্গা না হয় থামিয়ে দিলেন, তারপর কি আমি মরুভূমিতে রাজত্ব করব! নাঃ, আপনাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমায় অন্য পথ ভাবতে হবে। মিঃ গাম্বিয়া সৈনাধ্যক্ষকে বিদেয় করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের এক জরুরী সভা আহ্বান করলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই সভা বসল। পুলিশ বা সৈন্য দিয়ে যে দাঙ্গা থামানো সম্ভব হয় নি, অন্য কিভাবে তা হতে পারে কারুরই মাথাতে আসছিল না। সবাই যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ গাম্বিয়ার পি. এ. হ্যারি টাঁটন সরব হল। বললে, যদি অনুমতি দেন তো আমি একটা সাজেস্‌সন্ দিতে পারি।

উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই কটকট করে তাকালো তার মুখের দিকে। তাদের এত বড় বড় মাথায় যা আসছে না, ট্যাঁটনের ওই বেলে মাথায় তা কি করে আসা সম্ভব! যা হোক অন্য সময় হলে হয়তো ট্যাঁটনের প্রস্তাব বাতিলই হয়ে যেত, কিন্তু এই বিপদ-মুহূর্তে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ গাম্বিয়া ট্যাঁটনকে তার প্রস্তাব পেশ করতে অনুমতি দিলেন।

ট্যাঁটন বললে, আপনারা সবাই ইন্ডিয়ার মিঃ লম্ববান দ্যটের নামের সঙ্গে পরিচিত। ক্রীড়াগুরু হিসাবে সারা পৃথিবীর লোকের শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। আমার মনে হয় তাঁকে যদি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া থেকে তাঁকে আনা যায়, এবং তিনি এই অফ্‌সাইডের তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন, দামাস্কাসবাসীরা নতমস্তকে তা মেনে নেবেন।

'রাইট্' বলে মিঃ গাম্বিয়া এমনভাবে চেয়ারের ওপর লাফিয়ে উঠলেন, আর একটু হলে চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ছিলেন আর কি! ভাগ্যিস একজন সদস্য ধরে ফেললেন তাই অশুভ তেমন কিছু ঘটলো না।

মিঃ গাম্বিয়া বললেন—ট্যাঁটন তুমি আজ যথার্থ একজন পি. এ.-র কাজ করলে। যা হোক আর এক সেকেন্ডও বিলম্ব না করে এখুনি একটা প্লেন পাঠিয়ে দাও ভারতে। ইতিমধ্যে আমি একটা চিঠি লিখে রাখছি মিঃ দ্যট্‌কে। যাবার সময় চিঠিখানা যেন নিয়ে যায়।

ট্যাঁটন বললে, কিন্তু স্যার, আমাদের যে কটা প্যাসেঞ্জার-প্লেন আছে, তাতে স্টার্ট নিতে নিতে তো দামাস্কাস শহর মরুভূমি হয়ে যাবে। মিঃ দ্যট্‌কে তখন আনলেই বা কি লাভ।

মিঃ গাম্বিয়া গাল দুটো ফুলিয়ে বললেন, তাহলে এক কাজ কর। একখানা সুপারসনিক্ জেটবিমান পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি ফোন করে দিচ্ছি বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষকে।

লম্বুদা পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজে আবার ধূমপানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবে এবার আর অনুরোধ করার প্রয়োজন হল না। নিজে থেকেই আবার শুরু করলেন—

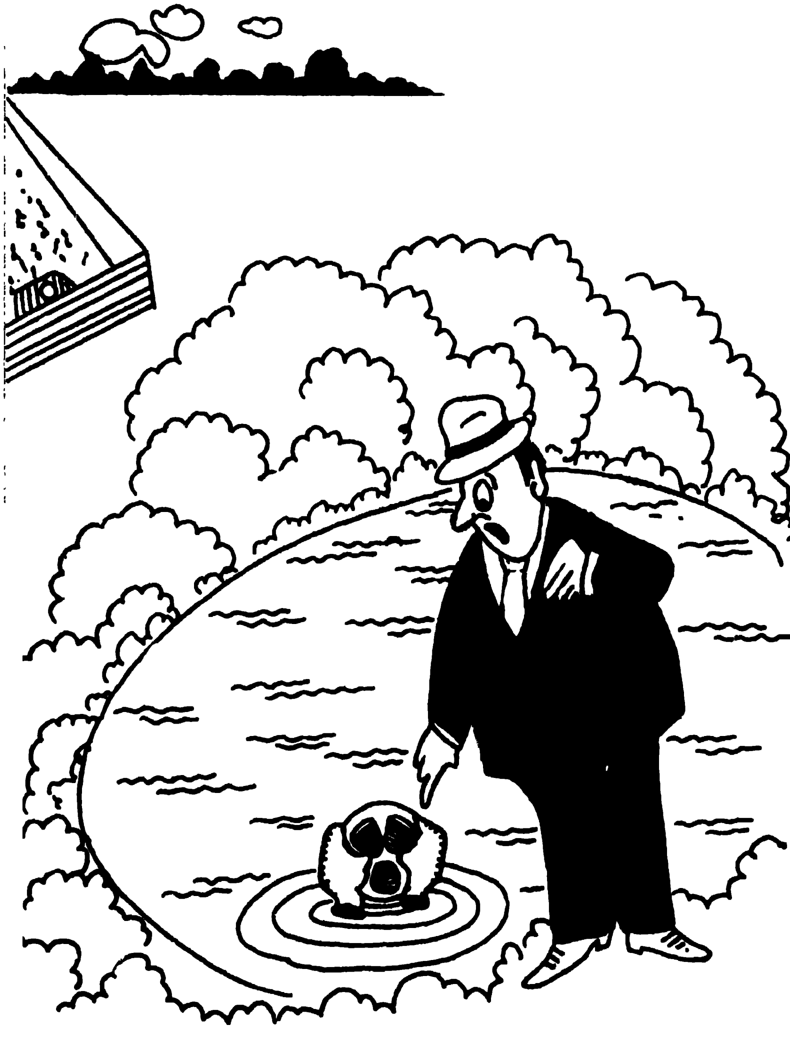
আমি তখন বাড়িতে বসে নিশ্চিন্ত মনে দাড়ি কামাচ্ছি হঠাৎ বাড়ির সামনে ভটভট করে একটা মোটর সাইকেল এসে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি হর্ন বাজাতে লাগল।

ছোট ভাগ্নে নিচেই খেলা করছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে এসে বললে, মামা, এক লালমুখো সাহেব তোমার নাম বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছিল। অনেক বলে কয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে এসেছি। তোমার সাথে বিশেষ দরকার। আমার তখন আধখানা মাত্র গাল কামানো হয়েছে। ভাবলুম কে আবার সাতসকালে বিরক্ত করতে এল।

দাড়িটা পুরো কামিয়ে যাব কিনা ভাবছি, হঠাৎ সিঁড়িতে ঠকটক করে জুতোর শব্দ

হল। বুঝলুম এ দিশি সোলের আওয়াজ নয়। দাড়ি আর কামানো হল না। নেমে এলুম নিচেতে। লালমুখো গোরাটা আমাকে দেখামাত্রই জোড়া পায়ে দাঁড়িয়ে স্যাট্ করে একটা স্যালুট ঠুকল। পকেট থেকে মিঃ গাম্বিয়ার লেখা চিঠিখানা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'ইওর্ অনার্ স্যার্'—

চিঠি পড়ে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। মিঃ গাম্বিয়া সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, পত্রপাঠ পদধূলি দেবেন। নচেৎ জাতটা ধ্বংস হয়ে যাবে।



পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়া কি মুখের কথা! বাকি দাড়িটা কামাতেই তো কম করেও পনরো মিনিট লাগবে। পত্রবাহককে সে কথা বলতেই সে উত্তেজিত হয়ে বললে, চুলোয় যাক আপনার দাড়ি। একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে, আর আপনি কিনা এখন দাড়ি কামানোর কথা ভাবছেন। বলিহারি আপনাকে। বরং ব্লেডটা পকেটে করে নিয়ে চলুন। পথে কামিয়ে নেবেন।

পত্রবাহকের কথা শুনে আমার আগাপাছতলা রাগে রী রী করে উঠলেও তার অকাট্য যুক্তির কাছে মাথা নত করতে হল। সাবানটা তোয়ালেতে মুছে ফেলে আধগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়েই বেরিয়ে পড়লুম জামা-প্যান্ট-টাই পরে।

মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেওয়াই ছিল। আমাকে পেছনে বসিয়ে গোরাটা নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব বললে। তারপর সীটে বসে হ্যান্ডেল মোচড় দিতেই মোটর সাইকেলটা লাফিয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল বেলগাছিয়া ধরে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে।

যত বলি সাহেব আস্তে চালাও এটা দামাস্কাস নয় কলকাতা, কে কার কথা শোনে। বিড়বিড় করে কি সব বকে আর হ্যান্ডেল মোচড় দিয়ে তত স্পীড্ বাড়ায়।

এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। মোটর সাইকেল সহ আমাকে নিয়ে সে সরাসরিই পৌঁছালো প্লেনের কাছে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে প্লেনের ভেতরে ঢুকতে, সে মোটর সাইকেলটা টেনে তুলে নিল প্লেনের ভেতরে। পাইলটের সীটে বসে 'কট্' করে একটা আওয়াজ করতেই প্লেনটা সাঁক্ করে উড়ে গেল আকাশে। প্লেন ছেড়ে দিলেও কোন্‌খানে বসলে সুবিধে হবে ভাবছি, হঠাৎ সে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে হেসে উঠল। হাসিটা যে নিরর্থক নয় সেটা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্ন করলুম, কী ব্যাপার, হাসছ যে বড়!

সে বলল, ভেবে আর কি হবে! আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি। জানলা দিয়ে একবার গলা বাড়ালেই সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি বুঝতে পারবেন।

দামাস্কাসের দূরত্ব যাই হোক না কেন, পাশের পাড়া যে নয় এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিলুম। এত তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছানো কিভাবে সম্ভব হতে পারে কিছুতেই মাথায় না আসাতে অগত্যা জানলা দিয়ে মুণ্ডুটা বাড়িয়ে দিলুম। নাঃ, তার কথা মিথ্যে নয়। কাতারে কাতারে লোক আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এয়ারপোর্টে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে সে এসে দরজার ছিটকিনি খুলে দিতেই, কয়েকজন সরকারী কর্মচারীসমেত বেশ কিছু ছেলেমেয়ে প্লেনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সরকারী কর্মচারীরা ফ্যানেদের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তার মধ্যেই আবার কয়েকজন তাদের অটোগ্রাফ খাতা বাড়িয়ে দিল

আমার মুখের সামনে।

দেখলুম ঝামেলা বাড়িয়ে অযথা লাভ নেই। পকেট থেকে কলমটা বের করে তিন মিনিটে প্রায় শতিনেক খাতায় খসখস করে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিলুম। তারপর ভিড়টা একটু পাতলা হলে সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় নেমে এলুম মাটিতে।

মিঃ গাম্বিয়া মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি নামতেই আমার গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়ে একগাল হেসে আমার সাথে করমর্দন করলেন।

করমর্দন করতে গিয়ে আমি চমকে উঠলুম। মিঃ গাম্বিয়ার হাতের তালুটা মৃত লোকের মতই কনকনে ঠাণ্ডা। মিঃ গাম্বিয়া যে ভীষণ নার্ভাস্ হয়ে পড়েছেন বুঝতে মোটেই অসুবিধে হল না। আমি তাঁকে সাহস দিয়ে বললুম, 'বলুন, হোয়াট ক্যান্ আই ডু ফর্ ইউ?'

মিঃ গাম্বিয়া তোতলাতে তোতলাতে বললেন, প্লীজ্ দামাস্কাসকে বাঁচান। দামাস্কাসের মৃত্যু মানে আমাদেরও মৃত্যু।

আমি দেখলুম আদিখ্যেতা করে আর সময় নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় নয়। মিঃ গাম্বিয়ার পি. এ.-এর কাঁধে একটা টোকা মেরে বললুম, ইয়ং বুলেটস্ আর অ্যাটম্স্ ইলেভেনের অধিনায়কদের কাইন্ডলি একবার এখানে ডেকে পাঠান। আমি নিজের কানে তাদের বক্তব্য শুনতে চাই। আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ট্যাটন মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল এয়ারপোর্ট থেকে।

আমি লাউঞ্জে গিয়ে মিঃ গাম্বিয়ার সাহায্যে মাঠের একখানা মানচিত্র আঁকবার চেষ্টা করতে লাগলুম। আমার মানচিত্রও আঁকা শেষ হল আর ওরাও প্রায় সাথে সাথে এসে হাজির হল সেখানে।

অধিনায়ক দুজন আমার সাথে করমর্দন করে বললে, 'মিঃ দ্যট্ হাউ ফরচুনেট্ উই আর্।' আমি টাইয়ের নটটা ঠিক করতে করতে বললুম, ফরম্যালিটিজ পরে হবে। অ্যাক্চুয়েলি কি ঘটেছিল বল দেখি।

ওদের পরস্পরকে মুখ চাওয়াচাউই করতে দেখে বুঝলুম ট্রাবলস্ কোথায়। আমার হাতে ভাঁজ করা মানচিত্রটা ওদের মুখের সামনে খুলে ধরে বললুম, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মানচিত্র আমি এঁকেই রেখেছি। গোল হবার সময় তোমাদের দলের খেলোয়াড়েরা কে কোন্ পজিসনে দাঁড়িয়েছিল সেটা ম্যাপে চিহ্নিত করে দাও।

দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাপের ওপর এবং পেন্সিলের সাহায্যে তাদের দলীয় খেলোয়াড়েরা কে কোথায় ছিল তাই চিহ্নিত করতে লাগল। ওদের কাজ শেষ হলে আমি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে সেটা বিচার করে, পেন্সিলের টিক দিয়ে বললুম অফ্সাইড্

হয় নি। সাচ্চা গোলই হয়েছে এবং গোলের অনুকূলে আমার যুক্তিটা কি তাও তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলুম। অ্যাটম্‌স্‌ ইলেভেনের অধিনায়ক আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'আই এগরি উইথ্‌ ইউ'। এখন আর পরাজয় মেনে নেওয়াতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

মিঃ গাম্বিয়া পাশেই বসে বসে সব শুনছিলেন। অ্যাটম্‌স্‌ ইলেভেনের অধিনায়ক মুখ দিয়ে সে কথা উচ্চারণ করামাত্রই তিনি হুর্‌র্‌রে বলে লাফিয়ে উঠলেন এবং তাঁর পার্সোন্যাল গাড়িতে আমাদের তিনজনকে উঠিয়ে ছুটলেন রেডিও স্টেশনের দিকে।

স্টেশন ডাইরেক্টরের কানে ফিসফিস করে মিঃ গাম্বিয়া কি যেন বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মতামত রেডিও মারফত প্রচারের ব্যবস্থা করে দিলেন। রেডিও মারফত বক্তৃতা দিয়ে বাইরে বেরুনোর সাথে সাথে আবার জনতার উল্লাস কানে এল। মিঃ গাম্বিয়াকে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার?

মিঃ গাম্বিয়া হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে বললেন, আপনি যে আজ আমার কি উপকার করলেন ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। জনতার উল্লাস দেখে মনে হচ্ছে ওষুধ ধরেছে।

রেডিও স্টেশন থেকে সোজা মিঃ গাম্বিয়ার প্যালেসেই ফিরে এলুম। কিন্তু প্যালেসের গেট পার হই কার সাধ্যি। রাজ্যের রিপোর্টার এসে ভিড় করেছে সেখানে।

মিঃ গাম্বিয়াকে বললুম, দেখুন আমি এমন কোনো ঐতিহাসিক কাজ করি নি যে রিপোর্টারদের সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে নিজের প্রচারটাও আমি অপছন্দ করি। আমাকে বরং এখনি বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন, আমার এখনো আধখানা দাড়ি কামানো বাকি। বড্ড কুটকুট করছে।

মিঃ গাম্বিয়া আমার অনুরোধ রাখলেন। যে বিমানে গিয়েছিলুম সেই বিমানে করেই বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। লম্বুদা কোনোরকমে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে, পর পর কটা রামটান দিলেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আজ তাহলে চলি কেমন। গভর্ণর হাউসে আবার তাসখেলার নেমন্তন্ন আছে। বেশি দেরি করলে আবার গভর্ণর চটে যাবেন। লম্বুদা সকলের মুখের ওপর একবার আলতো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমরা ফ্যালফ্যাল করে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

---